আমি পদ্মজা - ৮১

_____

পদ্মজা পূর্ণার মনের অবস্থা টের পাচ্ছে। তার মতো সহ্যশক্তি নেই পূর্ণার। পদ্মজা পূর্ণার হাতের পিঠে চুমু খেয়ে বললো,'মন এতো দূর্বল হলে কি চলে?'
পূর্ণা পদ্মজার দিকে তাকালো। পদ্মজা চোখের ইশারায় বাকিটুকু পড়তে বলে। পূর্ণা এক হাতের তালু দিয়ে চোখের জল মুছে পড়া শুরু করলো-
---
আমাদের দাদুর সঙ্গ পেয়ে আমির ছোট থেকেই নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়েছে। কাকার কথায় দাদু আমিরকে আলাদা করে সময় দিতেন। আমির কাকার বড় শিকার ছিল। আমিরের চাল-চলন ছিল অন্যরকম। তাকে ছোট থেকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে,মেয়েরা ভোগের বস্তু। শিখিয়েছে টাকার ক্ষমতা আর পৈশাচিক আনন্দ কেমন! দাদু শুরু থেকে সব জানেন। তিনি কাকা আর আব্বাকে উৎসাহিত করতেন। আমাদের দাদাকেও সাহায্য করেছেন। দাদুর সোনার অলংকারের প্রতি দূর্বলতা ছিল খুব। এই দূর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে আমার দাদা,আব্বা,কাকা দাদুকে ব্যবহার করেছেন। দাদুর সাথে দাদুর এক বোনও ছিল। দাদুর বোন বলতে আপন নয়,পরিচিত। দুজন নারী মিলে সহযোগিতা করে এসেছে বছরের পর বছর। আমির নারীর শরীর ভোগ করার চেয়ে , আঘাত করতে পছন্দ করতো। প্রথম তিন বছর সে কোনো মেয়ের সাথে জোরপূর্বক মিলিত হওয়ার চেষ্টা করেনি। সবসময় প্রতিটি মেয়ের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছে।

প্রথম প্রথম আমার খারাপ লাগতো। কিন্তু একসময় অভ্যস্ত হওয়ার সাথে উপভোগ করতে থাকি। আমিরের যখন আঠারো বয়স তখন থেকে সে যৌনতার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। পাশের গ্রামের এক মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে। মেয়েটা দেখতে মিষ্টি ছিল। আমিরকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করে নিজের ইজ্জত সঁপে দিয়েছিল, বিনিময়ে এরপরদিন লাশ হয়ে নদীর ঢেউয়ে ভেসে যেতে হয়েছে! আমিরের নারী আসক্তি তীব্র হয়ে উঠে। কিন্তু জোরপূর্বক কিছু করতে সে নারাজ। বেছে নেয় ছলনার পথ,প্রতারণার পথ। কতগুলো মেয়েকে সে ঠকিয়ে ভোগ করেছে তার হিসেব নেই আমার কাছে। ঢাকায় পড়তে গিয়ে কারো মাধ্যমে নারী পাচারের সাথে যুক্ত হয়। তারপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি। টাকার পাহাড় গড়ে উঠে। পদ্মজা,তোমার খারাপ লাগবে। তাও বলতে হচ্ছে, তুমি যেমন আমিরের জীবনের প্রথম মেয়ে নও তেমন বউও নও! শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী এক মেয়েকে আমির বিয়ে করেছিল। সেই মেয়েটি নিঃসন্দেহে রূপসী ছিল। সে বিয়ের পূর্বে শারিরীক সম্পর্কে আগ্রহী ছিল না বলে আমির তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি তার পরিবারে না জানিয়ে আমিরকে বিয়ে করে। এক সপ্তাহ পর মেয়েটি যখন আমিরের কাছে তিক্ত হয়ে উঠে, তখন মৃত্যু মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়ায়! মেয়েটির পরিবারের কেউ জানতেও পারেনি,তাদের বাড়ির মেয়ের বিয়ে হয়েছিল! আর সে স্বামীর হাতেই মারা গিয়েছে! আমির তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। সে তখনই ঠান্ডা মাথায় পুরো ঘটনার চিহ্ন মুছে দেয়। এটাই কিন্তু ওর একটা বিয়ে নয়। আমির আরেকটা বিয়েও করেছিল। ভিন্ন ধর্মের এক সুন্দরী মেয়েকে। তার বেলায়ও হবুহু ঘটনা ঘটে। সে মেয়ের মৃত্যু আমি নিজচোখে দেখেছি। কিন্তু কিছু বলিনি। বলতে ইচ্ছে হয়নি! মন বলতে কিছু ছিল না তখন। মেয়েটা মৃত্যুর পূর্বে অবাক হয়ে দেখছিল আমিরকে। সে বোধহয় বিশ্বাস করতে পারছিল না,যাকে ভালোবেসে ঘর ছেড়েছে সে তাকে খুন করছে! আমির কিন্তু খুন করার ঘন্টাখানেক পরই অন্য মেয়ের সাথে সময় কাটিয়েছে! আমিরের বাড়ি-গাড়ি সব হয়। যেকোনো নারী আমিরকে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিত নির্দ্বিধায়। আমির দেখতে একটু শ্যামলা হলেও ওর কথাবার্তা, চাল-চলন, চাহনি ছিল আকর্ষণ করার মতো। যতগুলো মেয়ে আমিরকে ভালোবেসেছে বেশিরভাগই আমিরের থুতুনির কাটা দাগটা দেখে প্রেমে

পড়েছে। আমির সম্পর্কিত আর কিছু বলার নেই। এইটুকুতেই তুমি আমিরের স্থান বুঝে যাবে। তোমার স্বামী একা খারাপ এই কথা বলার মুখ নেই আমার। আমি কিছু কম করিনি!

তবে আমির কাকির ব্যাপারে ছিল দূর্বল। তার সব সাবধানতা ছিল কাকিকে নিয়ে! কাকি যেন কিছু জানতে না পারেন। আমির ঢাকা থাকার কারণে,কাকি কখনো সন্দেহও করেননি। তার আগে সন্দেহ করেছিলেন কিন্তু প্রমাণ পাননি। যেদিন কাকি তোমাকে আর আমিরকে তোমাদের বাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিলেন। সেদিন তোমরা আসার পর রাতে কাকি জানতে পারেন আমির অনেক আগে থেকে কাকার সাথে কাজ করছে। এমনকি ঢাকা এই কাজই করে। আমির কাকার সাথে ডিল নিয়ে আলোচনা করছিল। খুব চাপ ছিল মাথার উপর। চিন্তায় আমির অসতর্ক হয়ে যায়। কাকির ঘরেই কাকার সাথে নারী পাচারের বিষয়ক কথা বলছিল। আর কাকিও সব শুনে ফেলেন। তিনি খুব কাঁদেন। রাগে আমিরকে অনেকগুলো থাপ্পড় দেন। আমির কিছু বলেনি। চুপচাপ থাপ্পড় খেয়েছে। কাকি আমিরকে নিষেধ করেন, আমির আর যেন আম্মা না ডাকে। আর যেন দেখা না করে। আমির কাকিকে সামলানোর অনেক চেষ্টা করেছে। পারেনি। কাকির খুব কষ্ট হচ্ছিলো। ঘৃণায় আমিরের শার্ট টেনে হিঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলেছেন। কাকির নখের দাগ আমিরের পেটে-বুকে হয়তো এখনো আছে। কাকির বেঁচে থাকার সুতোটাই ছিঁড়ে যায়। সারা রাত্রি হাউমাউ করে কেঁদেছেন। অনেকবার কাকিকে স্বান্তনা দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সাহস হয়নি। আমি নিজেই তো একটা নিকৃষ্ট মানব! আবার সেদিন রাতে তুমি রুম্পার সাথে ছিলে। রুম্পা যদি সব বলে দেয় তোমাকে সে ভয়ে আমির রিদওয়ানকে পাহারায় রেখেছিল। লতিফাকে দিয়ে খাবারে ঔষধ মিশিয়ে দিয়েছিল। যাতে রুম্পা ঘুমিয়ে পড়ে। আমির অনেক ছলচাতুরী করেছে,তুমি যাতে কিছু না জানতে পারো।

আমার আর রুম্পাকে তুমি নতুন জীবন পেতে সহযোগিতা করেছো তাই তোমাকে আমাদের গল্পটাও বলতে চাই। জানি না আর কতদিন বাঁচব। পালিয়ে এসেছি! আমিরের হাত অনেক লম্বা। ওর আমাকে খুঁজে পেতে সময় লাগবে না। বরং অবাক হচ্ছি,এতদিনেও আমির আমাকে খুঁজে পায়নি কেন?
রুম্পাকে আমার জন্য কাকা পছন্দ করেছিলেন। বিয়ের প্রথম দিনই বুঝতে পারি,রুম্পা সরল সোজা একটা মেয়ে। রুম্পার সঙ্গ ছিল অনেক শান্তির। কখন যে ভালোবেসে ফেলি বুঝিনি। বিয়ের মাস কয়েক পর বৈশাখ মাসে আমি পাতালঘরে ছিলাম। আমার সামনে নগ্ন মেয়ে ছিল। তখন পাতালঘরের চারপাশেএতো নিরাপত্তা ছিল না। হুট করে দেখি রুম্পা চলে এসেছে। তারপরের দিনগুলো বিষাক্ত হয়ে উঠে। রুম্পাকে রিদওয়ান মারে,আব্বা মারে,কাকা মারে। আমি চুপচাপ মেনে নেই। কিন্তু খুব কষ্ট হতো। নিজের সাথে যুদ্ধ করেছি। নিজের প্রতি ঘৃণা হতো। স্বামী হিসেবে নিজেকে ব্যর্থ লাগতো। রিদওয়ান আমার অজান্তে আমার ভালোবাসার বউকে ধর্ষণ করে। এই খবর ধর্ষণের এক সপ্তাহ পর শুনেছি। কিন্তু আমি এমনই কাপুরুষ যে রিদওয়ানকে মারতে গিয়ে উল্টো মার খেয়ে চুপ হয়ে গিয়েছি! রুম্পা তেজি মেয়ে ছিল। ও রাগে বার বার বলেছে,পুলিশের কাছে যাবে। সব বলে দিবে। তাই রুম্পাকে মারার পরিকল্পনা করা হয়। আমি রুম্পার সাথে লুকিয়ে দেখা করি। ওর পায়ে ধরে ক্ষমা চাই। আর বলি,পাগলের ভান ধরে থাকতে। আমি মাঝে মাঝে দেখা করব। রুম্পা তেজি হলেও মৃত্যুকে ভয় পেতো খুব। পাগলের ভান ধরে থাকলে বাঁচতে পারবে এই কথা শুনে খুব কাঁদে। আর তাই করে। সে যে এই সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচতে চায়! রুম্পার চিৎকার,চেঁচামেচি শুনে আব্বা,কাকা ধরে নেয় রুম্পার মাথা ঠিক নেই। তবে আমিরের দৃষ্টি ঈগলের মতো। প্রথম দেখাতেই বুঝতে পারে,রুম্পা পাগল নয়। মানসিক

ভারসাম্যও হারায়নি। তাও কেন যেন কাউকে কিছু বলেনি! রুম্পা কিন্তু তখনো জানতো না আমির এই কাজে যুক্ত আছে। আমির আর রুম্পার সম্পর্ক ভাইবোনের মতো ছিল। আমির পরিবারের সাথে সবসময় সহজ-সরল থেকেছে। একদম সাধারণ একটা মানুষের মতো। শুরু হয় রুম্পার বন্দী জীবন আর আমার নিঃসঙ্গ রাত। একটা দিনও শান্তিতে ঘুমাতে পারিনি। কাপুরুষ শব্দটা সর্বক্ষণ খুঁড়ে-খুঁড়ে খেয়েছে। মাঝে মাঝে লুকিয়ে দেখা করেছি। বুঝতে পেরেছি,রুম্পাকে আমি খুব ভালোবাসি। আব্বা,চাচা আর ছোট ভাই আমির এই তিন জনের ভয়ে এক পাও বাড়ানোর সাহস হয়নি। একজন লোক আমাদের দল ছেড়ে পালিয়েছিল। বিনিময়ে তার নির্মম মৃত্যু হয়েছে। সে ভারত চলে গিয়েছিল। তাও আমির ধরে ফেলেছে! বলো তো পদ্মজা,এমন ঘটনা জানার পর আমার মতো কাপুরুষ আর কী ই বা করতো? ধিক্কার আমার নিজের জীবনকে! আমাকে তো কুকুরের খাবার হওয়া উচিত! রুম্পাকে তুমি ঢাকা নিয়ে যেতে চেয়েছিলে তাই আমির বাবলুকে আদেশ করে,রুম্পাকে খুন করতে। আমি এই খবর পেয়ে পালানোর কথা ভাবি। পথে বাবলু আটক করে তখন তুমি ফেরেশতার মতো হাজির হও। এই ঋণ শোধের উপায় আমার জানা নেই।

আর কী বলবো আমি? এখন সিদ্ধান্ত তোমার। তুমি কী করবে! আমিতো সব জানিয়ে দিয়েছি। কিছু কথা না জানালেই নয়। আমির আমার কাছে সবসময় স্বচ্ছ ছিল। কিন্তু তুমি আসার পর আমি তাকে চিনতে পারি না। যখন তোমাদের বিয়ে হয় ভেবেই নিয়েছিলাম কয়দিন পর তোমার লাশও দেখতে হবে। কিন্তু সেটা হয়নি। উল্টা আমির পাল্টে যায়। চারিদিকে কঠোর নিরাপত্তা দেয়া হয়। গ্রাম থেকে ঢাকা ফিরেই সুন্দরী দুই মেয়েকে সঙ্গ দেয়ার কথা ছিল। এই দুই মেয়েকে হাতের মুঠোর আনতে আমিরের সবচেয়ে বেশি সময় লেগেছে। সুযোগ পেয়েও আমির তাদের কাছে টানতে পারেনি। বছরখানেকে বুঝে যাই, আমির সত্যি তোমাকে ভালোবেসেছে! কোনো মেয়ের শরীর আর টানেনি আমিরকে। এ নিয়ে আব্বা,কাকার মাঝে অনেক কথা হয়েছে। আমির যদি সব ছেড়ে দেয়? আমার মনের কোণে আশা জাগে,আমির এবার আমার মতো অনুভব করবে। এই কালো জগতকে তার কালোই লাগবে। আমি নিজ চোখে দেখেছি,আমিরকে তোমার জন্য ছটফট করতে। তোমার অসুখ হলে সবকিছু ভুলে যেতো। তোমার চিন্তায় এক জায়গায় স্থির থাকতে পারতো না। এমনকি ঢাকার বাড়ি সহ আমাদের বাড়িটাও আমির তোমার নামে করে দিয়েছে। আমিরের যত সম্পদ আছে সব তোমার নামে করা। আমিরের কিন্তু নিজস্ব বলতে কিছু নেই। সে নিঃস্ব। এই খবর রিদওয়ান বা আব্বা,কাকা কেউ জানে না। কোনো কাক-পক্ষীও জানে না। চট্টগ্রাম সমুদ্রের কাছে তোমার জন্য একটা বাংলো বাড়ি বানাচ্ছে। বাড়ি বানানোর টাকা একত্রিশটা মেয়ে পাচার করার বিনিময়ে অগ্রিম নিয়েছিল। এখন সেই চাপ মাথায় নিয়ে ঘুরছে। হাতে সময় কম। কিন্তু মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না! আমার জানামতে, তুমি ধার্মিক ও পবিত্র একটা মেয়ে। তুমি এতকিছু জানার পর আমিরকে মেনে নিতে পারবে না। তোমার বিবেক তোমাকে সঠিক পথ দেখাবে। আমি যা জানি সব বলেছি। আমির তোমাকে ভালোবাসে এই কথাটা কঠিন সত্য। তুমি যদি আমিরের কাছে তার দুই চোখ চাও সে তোমার সামনে ছুরি ধরে হাঁটুগেড়ে বসে বলবে নিয়ে নাও! ছয় বছরে আমিরের যে রূপ,তোমার প্রতি যে টান আমি দেখেছি তা থেকে আমার এটাই মনে হয়। আমির তোমাকে অন্ধের মতো ভালোবাসে। এমন মানুষের মনে এতো ভালোবাসা দেয়ার কোনো উদ্দেশ্য হয়তো সৃষ্টিকর্তার আছে। শুনেছি,সৃষ্টিকর্তার সব সৃষ্টি কোনো উদ্দেশ্যে করা। এখন সবটা তোমার সিদ্ধান্ত। আমি এইটুকুও মিথ্যে বলিনি। তুমি বুদ্ধিমতী একটু চোখ কান খোলা রাখলেই বুঝতে পারবে। যে পদক্ষেপই নাও না কেন সাবধান থেকো। আমিরের চোখ ফাঁকি দিয়ে একটা পক্ষীও উড়ে যেতে পারে না।

Kobitor.com

রুম্পা তোমাকে ভালোবাসা জানিয়েছে। কখনো সুযোগ মিললে আমাদের আবার দেখা হবে। আমার মৃত্যু যেকোনো সময় হয়ে যেতে পারে। রুম্পাকে যদি আবার ওই বাড়িতে নেয়া হয় তুমি দেখে রেখো। আল্লাহ তোমার সাথে আছেন। আমার জন্য দোয়া করো। আল্লাহ আমার শাস্তি যেন রুম্পাকে না দেন। আমাকেই যেন দেন। আর আমাকে ক্ষমা করে দেন। আমি অনুতপ্ত। এতো বড় চিঠি লিখে অভ্যেস নেই। ভুল হলে ক্ষমা করো। ভালো থেকো বোন।

ইতি,
আলমগীর।

পূর্ণা দুই হাতে মাথা চেপে ধরে। কাঁদতে কাঁদতে তার বুক ভিজে গিয়েছে। সে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে বললো,'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আপা। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'
পদ্মজা পূর্ণাকে জড়িয়ে ধরলো। পূর্ণা পদ্মজার বুকে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে থাকলো। পদ্মজা তার সাথে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা খুলে বলে। পূর্ণা দুই হাতে শক্ত করে ধরে পদ্মজাকে। তার প্রিয় বোনের এতো কষ্ট! সে সহ্য করতে পারছে না। পূর্ণা কাঁদতে কাঁদতে বললো,'ভাইয়া তোমার আগে আরো দুটো বিয়ে করেছে। এই ব্যথা কীভাবে সহ্য করেছো আপা?'
পদ্মজা কান্না আটকিয়ে রেখেছিল। এই কথা শুনে ভেতর থেকে কান্না আপনা আপনি চলে আসে। পূর্ণাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। একটা মানুষ খুঁজছিল সে,যাকে জড়িয়ে ধরে মনখুলে কাঁদা যাবে। আমির অত্যাচারী, হিংস্র,নারী ব্যবসায়ী এইটুকুর ব্যথাই সে হজম করতে পারেনি। চিঠি পড়ে যখন জানতে পারলো,আমির নারী আসক্ত ছিল। এমনকি বিয়েও করেছে। তখন ইচ্ছে হচ্ছিল,গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরে যেতে। ঠান্ডা মেঝেতে বসে হাত-পা ছড়িয়ে কেঁদেছে। বার বার চোখে ভেসে উঠেছে আমিরের সাথে অনেক মেয়ের অন্তরঙ্গ মুহূর্ত। একজন স্ত্রীর জন্য এটা কতোটা বেদনাদায়ক হতে পারে,তার কোনো পরিমাপ নেই। পদ্মজা চোখের জল মুছলো। পূর্ণাকে সামনাসামনি বসিয়ে বললো,' এখন কাঁদার সময় নয়। তোকে আমি সব জানিয়েছি,যাতে প্রেমাকে দেখে রাখতে পারিস। আর নিজেও সাবধানে থাকিস। আমি একটা ছুরি দেব। নিজের সাথে রাখবি। রিদওয়ানের নজর ভালো না। প্রেমার দায়িত্ব তোর। তোর বিয়ে দিয়ে দেব তিন-চারদিনের মধ্যেই।'

'আপা?' পূর্ণার কণ্ঠটা অদ্ভুত শোনায়। পদ্মজা তাকালো। পূর্ণা ঢোক গিলে নতজানু হয়ে কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বললো,'ভাইয়ার কোনো ক্ষতি করো না আপা।'
কথা শেষ করেই জোরে কেঁদে উঠলো পূর্ণা। সে বুঝতে পারছে সে অন্যায় আবদার করেছে। পাপীর প্রতি মায়া দেখাচ্ছে। কিন্তু আমিরকে সে আপন ভাইয়ের মতো ভালোবাসে। আমির কখনো বড় ভাইয়ের অভাব বুঝতে দেয়নি। মাথার উপরের ছাদ হয়ে থেকেছে। সবচেয়ে বড় কথা তার প্রিয় বোনের ভালোবাসার মানুষ আমির। কেউ না জানুক সে জানে,আমির ছাড়া পদ্মজা বেঁচে থেকেও মৃত। পদ্মজা তার মা হেমলতার মতো হয়েছে। সত্যকে,ন্যায়কে বেছে নিবে। ভালোবাসার সিন্দুকটা তালা মেরে রাখবে। তারপর কষ্টে ধুঁকে-ধুঁকে মরবে। পূর্ণার কথা শুনে পদ্মজা অবাক হয়ে উচ্চারণ করলো,'পূর্ণা!'
পূর্ণা পদ্মজার কোলের উপর মাথা নত করে বললো,'আপা,আমি খুব খারাপ। কিন্তু তোমার সুখ আমার কাছে সবচেয়ে বড়। ভাইয়া তোমাকে ভালো রাখবে। ভাইয়া তোমাকে ভালোবাসে। আগের সব ভুলে যাও। মাফ করে দাও। আমি জানি তুমি ভাইয়াকেও ছাড়বে না। ভাইয়ার কিছু করে ফেলবে। আপা,দোহাই লাগে। তোমার সুখ নষ্ট করো না।'

পদ্মজা আশ্চর্যের চরম পর্যায়ে অবস্থান করছে। পূর্ণা মাথা তুলে তাকায়। পদ্মজা প্রশ্ন করে,' আর যে মেয়েগুলো অত্যাচারিত হয়েছে? যে মেয়েগুলো ঠকেছে? যে মেয়েগুলো যন্ত্রনায় ছটফট করে জীবন দিয়েছে? তাদের প্রতি অন্যায়ের শাস্তি কে দিবে?'
পূর্ণার সহজ উত্তর,'তোমাকে তো কিছু করেনি। তোমাকে তো ভালো রাখবে।'
পদ্মজা নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি। সে ভেবেছিল পূর্ণা ঘৃণায় আমিরকে খুন করতে চাইবে। খুন করতে চাইবে রিদওয়ান, খলিল আর মজিদকে। কিন্তু এ তো উল্টা সুর তুলছে! পদ্মজা গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে পূর্ণাকে থাপ্পড় দিল। পূর্ণা আকস্মিক ঘটনায় নিজেকে শক্ত রাখার সুযোগ পায়নি। বিছানা থেকে হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে। পদ্মজার নাক লাল হয়ে গেছে। সে রাগে পূর্ণাকে বললো,' ছিঃ! তুই আম্মার মেয়ে!'

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৮২

_____
পূর্ণা উত্তরে কিছু বললো না। সে ঝরঝর করে কাঁদতে থাকলো। নাকের পানি,চোখের পানি মিলেমিশে একাকার। দৃষ্টি মেঝেতে নিবদ্ধ। পদ্মজার রাগে দুঃখে কান্না পায়। বেসামাল ঘূর্ণিপাকে সে আটকে পড়েছে। প্রতিটি নিঃশ্বাস হয়ে উঠেছে বিষাক্ত। কেউ নেই পাশে দাঁড়ানোর মতো। কেউ মাথা ছুঁয়ে দিয়ে বলে না, পাশে আছি! মন যা চায় করো। পদ্মজার ভেতরের ঝড়ের তাণ্ডব কেউ টের পাচ্ছে না। সবাই তার বিরুদ্ধে। সবাই!
পদ্মজা চিঠি ও খাম নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পূর্ণা মৃদু আর্তনাদ করলো। সে কিছুতেই চিঠির লেখাগুলো আর পদ্মজার মুখে উচ্চারিত শব্দগুলো বিশ্বাস করতে পারছে না। তার কাছে ভাইয়া নামক শব্দটির মানে আমির। তাৎক্ষণিক চোখের সামনে ভেসে উঠে একটা হাসিখুশি মুখ। আমিরের যে স্নেহ,ভালোবাসা এতদিন তাদের উপর চুইয়ে-চুইয়ে পড়েছে। সেই ভালোবাসায় খাদ থাকতে পারে না! পূর্ণা দেয়ালে হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। শরীরটা কেমন করছে! হাজারটা সূচ যেন বুকের ভেতরটা খোঁচাচ্ছে। সে তার আপার চোখেমুখে দেখেছে সীমাহীন কষ্ট! পূর্ণা দুই হাতে কপালের দুই পাশ চেপে ধরে পায়চারি করতে করতে বিড়বিড় করে,'তুমি গতকাল রাতে এজন্যে কাঁদছিলে আপা! ভাইয়ার ভালোবাসার অভাব তোমাকে ছাই করে দিচ্ছে। তুমি পুড়ে যাচ্ছো। পুড়ে যাচ্ছো তুমি।'

পূর্ণা বিছানায় বসলো। সে অস্থির হয়ে আছে। জানালায় চোখ পড়তেই সে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। চোখের সামনে দৃশ্যমান হয় বড় বড় গাছ। তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। না জানি কত মেয়ের কুরবানির সাক্ষী এই গাছেরা! পূর্ণা জানালার গ্রিলে কপাল ঠেকিয়ে চোখ বুজে। গাল বেয়ে টুপ করে জল গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে। তার কেন এতো কষ্ট হচ্ছে সে জানে না। বড় ভাইয়ের সমতূল্য আমিরের এমন ভয়ংকর রূপের কথা জেনে নাকি তার বোন আর বোনের ভালোবাসার বিচ্ছেদের আশঙ্কায়! পূর্ণা দুই হাতে চোখের জল মুছে ওড়না দিয়ে মাথা ঢাকলো। তারপর দ্রুতপায়ে ২য় তলায় পদ্মজার ঘরে যায়। পদ্মজা ঘরে নেই। নিচ তলায় হয়তো! পূর্ণা সোজা নিচ তলায় চলে আসে। সদর ঘরে জুলেখা রিনুর সাথে কথা বলছিল। তিনি ব্যাগও গুছাচ্ছেন। পূর্ণা

মৃদুলের কাছে শুনেছে,মৃদুল তার মা-বাবাকে নিয়ে এসেছে। জুলেখা বানুর মুখের সাথে মৃদুলের মুখের মিল রয়েছে। পূর্ণা আন্দাজ করে নিল,তিনি মৃদুলের মা। পূর্ণা নতজানু হয়ে এগিয়ে আসে। জুলেখার পায়ে ছুঁয়ে সালাম করার জন্য ঝুঁকতেই জুলেখা পা সরিয়ে নিলেন। কর্কশ কণ্ঠে বললেন,' দূরে যাও।'
পূর্ণা মনে মনে আহত হয়। দূরে সরে দাঁড়ায়। চোখের কার্নিশে জল জমে। সে ঢোক গিলে কান্না আটকিয়ে কাঁপাকণ্ঠে বললো,'আসসালামু আলাইকুম।'
জুলেখা বানু জবাব দিলেন না। তিনি কাউকে উদ্দেশ্য করে বললেন,' কী গো! হয় নাই তোমার? সময় যাইতাছে নাকি আইতাছে?'
গফুর মিয়া বেরিয়ে আসেন। পূর্ণা গফুর মিয়াকে দেখে বুঝতে পারলো, উনি মৃদুলের বাবা। লাল রঙের লম্বা দাঁড়ি,মাথায় সাদা টুপি,পরনে সাদা পাঞ্জাবি। চোখেমুখের নূর যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছে। গফুর মিয়া পূর্ণাকে দেখে হাসলেন। বললেন,'ভালো আছো মা? শরীরটা ভালো লাগছে?'
গফুর মিয়ার প্রশ্ন দুটো পূর্ণা শরীরকে চাঙ্গা করে তুললো। সে মৃদু হেসে বললো,' ভালো আছি। আপনি...আপনি ভালো আছেন?'
'আছি। বুড়ো মানুষ... '
গফুর মিয়া কথা শেষ করতে পারলেন না। জুলেখা বানু বাজখাঁই কণ্ঠে বললেন,'এহন তোমার গপ(গল্প) করার সময় না। ট্রেইন ছাইড়া দিলে বুঝবা।'
পদ্মজা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। শাড়ির আঁচল দিয়ে মাথার চুল ঢেকে জুলেখা বানুকে বললো,'গতকালই আসলেন। আজই চলে যাবেন?'
জুলেখা বানু পদ্মজার দিকে ফিরেও তাকালেন না। তিনি রিনুকে ধমকের স্বরে বললেন,'মৃদুইল্লা কই গেছে?'
রিনু বললো,'বাইরে গেছে। কলপাড়ে।'
'গিয়া খবর দেও,হের আম্মায় ডাকতাছে।'
রিনু পদ্মজাকে একবার দেখলো। তারপর বাইরে গেল। লতিফা সদর ঘর ঝাড়ু দিচ্ছে। সে আড়চোখে জুলেখার ব্যবহার দেখছে। তার ইচ্ছে হচ্ছে, মহিলাকে ভেজা কাপড়ের মতো মুচড়াতে! জুলেখার এমন ব্যবহারের কারণ পদ্মজা বুঝতে পারছে। তাও প্রশ্ন করলো,'মনে হচ্ছে আপনি খুব বিরক্ত হয়ে আছেন! আমরা কোনো ভুল করেছি?'
জুলেখা কটাক্ষ করে বললেন,'দেখো মা,তোমার সাথে আমি কথা কইতে চাইতাছি না। তুমিও কইয়ো না।'
পদ্মজা পূর্ণার দিকে তাকালো। পূর্ণা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। তার চোখে, জলের পুকুর সৃষ্টি হয়েছে। যেকোনো সময় গড়িয়ে পড়ে যেন ঘর ভাসিয়ে নিবে। লতিফা ঝাড়ু দেওয়ার ভান করে সব বালু জুলেখার ভেজা পায়ের উপর ছিটিয়ে দিল। জুলেখা বানু দুই লাফে দূরে সরে যান। চোখ বড় বড় করে লতিফাকে বললেন,'এই ছেড়ি,চোক্ষে দেহো না? কেমনে কামডা বাড়াইছে! এহন আবার পাও ধুইতে হইবো।'
লতিফা অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে বললো,'মাফ করেন খালাম্মা।'
মৃদুল সদর ঘরে প্রবেশ করে আগে পূর্ণার মুখ দেখলো। পূর্ণাকে দেখেই ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠে। সে পূর্ণাকে উদ্দেশ্য করে বললো,'পূর্ণা,এহন কেমন লাগতাছে?'
পূর্ণা গুমট কণ্ঠে জবাব দিল,'ভালো।'
মৃদুল বললো,'লিখন ভাইয়ের খবর নিয়া আইছি।'
পদ্মজা সঙ্গে-সঙ্গে প্রশ্ন করলো,'কেমন আছেন উনি?'

জুলেখা তীক্ষ্ণ চোখে পদ্মজার দিকে তাকান। জুলেখার চাহনি দেখে পদ্মজা অস্বস্তিতে পড়ে যায়। মৃদুল বললো,'জানি না ভাবি। খালি জানি, লিখন ভাইরে ঢাকা হাসপাতাল নিয়া গেছে।'
পদ্মজা বিড়বিড় করে বললো,'আল্লাহ উনাকে সুস্থ করে দিবেন,ইনশাআল্লাহ। '
পূর্ণার চোখেমুখের গুমট ভাবটা স্পষ্ট। মৃদুল দেখতে পাচ্ছে কিন্তু তার কারণ বুঝতে পারছে না। জুলেখা বানু আদেশের স্বরে মৃদুলকে বললেন,'তোর যে কাপড়ডি বাইর করছিলি ব্যাগে ঢুকাইছি। এহন এই জুতাডি খুইলা তোর জুতাডি পায়ে লাগা।'
মৃদুলের কপালে ভাঁজ সৃষ্টি হয়। বললো,'আমরা কই যাইতাছি? '
'বাড়িত যাইতাছি।'
মৃদুলের মাথায় যেন বাজ পড়ে। সে পূর্ণার দিকে তাকালো। পূর্ণা অন্যদিকে ফিরে আছে। মৃদুল অবাক হয়ে জুলেখাকে বললো,'আমরা যেই কামে আইছি,সেই কাম তো হয় নাই আম্মা।'
জুলেখা পূর্ণার উপর চোখ রেখে বললেন,'আমি এমন কালা ছেড়িরে আমার ছেড়ার বউ কইরা ঘরে নিতে রাজি না।'
মৃদুল উঁচু স্বরে উচ্চারণ করলো,'আম্মা!'
জুলেখা বানু চেঁচিয়ে বললেন,'তুই কী দেইক্ষা এমন ছেড়িরে পছন্দ করছস? তোর লগে এই ছেড়ির যায়? তোর আর এই ছেড়ির গায়ের রঙ আসমান আর জমিন।'
জুলেখা বানুর চিৎকার শুনে খলিল ও আমিনা উপস্থিত হোন। অপমানে,লজ্জায় পূর্ণার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। পূর্ণার চোখের জল পদ্মজা হজম করতে পারছে না। পদ্মজা বললো,' আপনি গায়ের রঙকে মূল্য দিচ্ছেন কেন? ছেলে-মেয়ে দুজন দুজনকে ভালোবাসে। ভালোবাসাটাকে মূল্য দিন।'
জুলেখা বানুর মেজাজ শুধু খারাপের দিকেই যাচ্ছে। তিনি বললেন,'আমার ছেড়ার মতো সোনার টুকরা এমন কয়লারে কুনুদিনও পছন্দ করব না। এই ছেড়ি তাবিজ করছে। কালা জাদু করছে আমার ছেড়ার উপর। আমার ছেড়ারে আমি বরহাট্টার হুজুরের কাছে লইয়া যাইয়াম। জাদু দিয়া বেশিদিন ধইরা রাখন যায় না। এইডা তুমি আর তোমার বইনে মনে রাইক্ষো।'
মৃদুল চিৎকার করে উঠলো,'আম্মা! কীসব আবোলতাবোল কইতাছেন। আপনি পূর্ণারে কষ্ট দিতাছেন।'
জুলেখা কেঁদে দিলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন,'আমার কষ্ট নাই? আমি কত আশা কইরা আছিলাম আমার ছেড়ার বউ আমি পছন্দ কইরা ঘরে আনাম। পরীর মতো বউ আনাম। কিন্তু তুই এমন কালা ছেড়িরে পছন্দ কইরা রাখছস। দশ মাস দশ দিন তোরে পেটে রাখছি। আর এহন তুই এই ছেড়ির লাইগগা গলা উঁচায়া কথাও কইতাছস!'
পদ্মজা জুলেখাকে বুঝাতে চাইলো,'আপনি অকারণে কাঁদছেন। দেখুন...'
'তুমি চুপ থাকো। তোমার বইনের তো গত্রের রঙ কালা। আর তোমার তো চরিত্রই কালা। নষ্টা মাইয়া মানুষের মতো জামাই রাইক্ষা অন্য ছেড়ার লগে সম্পর্ক রাখছো। এমন চরিত্রহীন ছেড়ি মানুষের বইনরে আমার বংশে নিয়া কি ইজ্জতে কালি লাগামু?'
পূর্ণার ত্যাড়া রগটা সক্রিয় হয়ে উঠে। সে জুলেখার সামনে এসে আঙুল শাসিয়ে বললো,'আমি সব সহ্য করব কিন্তু আমার আপাকে কিছু বললে আমি সহ্য করব না।'
পূর্ণার আঙুল শাসিয়ে কথা বলাটা জুলেখা হজম করতে পারলেন না। কত বড় সাহস! মিয়া বংশের বড় বউকে শাসিয়ে কথা বলছে! জুলেখা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন,'কইলজাডা বেশি বড়! এই ছেড়ি কারে আঙুল দেহাইতাছো তুমি? তোমার বইনে যে নষ্টা পুরা গেরামে জানে। সত্য কইতে আমি ডরাই না।'

মৃদুল ক্ষেপে যায়। সে জুলেখার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো আর বললো,'আম্মা,আপনি কিন্তু বাড়াবাড়ি করতাছেন।'
জুলেখা পিছনে ঘুরেই মৃদুলকে কষে চড় মারলেন। বেশ জোরেই শব্দ হয়। গফুর মিয়া জুলেখাকে ধমকালেন,'তুমি কী করতাছো? কী কইতাছো?'
জুলেখা বানু গফুর মিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন,'কিয়ামত নাইমা আইলেও এমন নষ্টার কালি বইনরে আমার ঘরের ঝিও করতাম না।'
পূর্ণার শিরায়-শিরায় ক্রোধ ছড়িয়ে পড়ে। সে টেবিলে এক হাত রেখে কিড়মিড় করে বললো,'আরেকবার নষ্টা কথা উচ্চারণ করলে আমি আপনার জিভ পুড়িয়ে দেব।'
উপস্থিত সবাই পূর্ণার দিকে চমকে তাকায়। মৃদলও অবাক হয়। পদ্মজা পূর্ণার এক হাত টেনে ধরে,কিন্তু পূর্ণাকে নাড়ানো যায় না। সে বড় বড় চোখ করে জুলেখার দিকে তাকিয়ে আছে।
জুলেখা রাগে,বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। তিনি ক্রোধের ভার নিতে পারছেন না। টেবিলে জোরে জোরে তিনটা থাপ্পড় দিয়ে তিনবার বললেন,' নষ্টার বইন,নষ্টার বইন,নষ্টার বইন!'
কেউ কিছু বুঝে উঠার পূর্বে পূর্ণা টেবিলের উপর থাকা জগ হাতে তুলে নিল। তারপর জগের সবটুকু পানি জুলেখার মুখের উপর ছুঁড়ে মারলো। আকস্মিক ঘটনায় সবার চোখ মারবেলের মতো হয়ে যায়।

সাথে-সাথে পদ্মজা পূর্ণাকে বিরতিহীনভাবে থাপড়ানো শুরু করলো। পূর্ণা দুই হাতে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। রাগে,দুঃখে সে কাঁদছে। পদ্মজার চোখভর্তি জল। সে পূর্ণাকে বললো,'এটা কী করলি তুই? তোকে এই শিক্ষা দিয়েছি? আর কত জ্বালাবি আমাকে?'
লতিফা পূর্ণাকে বাঁচাতে দৌড়ে আসে। জুলেখা বিস্ফোরিত নয়নে তাকিয়ে আছেন। অপমানে তার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হচ্ছে। তিনি মৃদুলের দিকে তাকালেন। মৃদুলের চোখেমুখে অসহায়ত্ব প্রকাশ পাচ্ছে! তার অনুভূতিগুলো থমকে গেছে। জুলেখার চোখে জল চিকচিক করছে। তিনি চোখের জল মুছে বললেন,'থাক এইহানে,বাড়ি ফেইরা আমার কবর দেখবি তুই।'

মৃদুল তার মাকে খুব ভালোবাসে। জুলেখার চোখের জল তার হৃৎপিণ্ডকে জ্বালিয়ে দেয়! জুলেখা ব্যাগ হাতে নিয়ে বেরিয়ে যান। পিছন পিছন গফুর মিয়াও গেলেন। মৃদুল পূর্ণাকে উদ্দেশ্য করে বললো,'ভালো করলে না।'
পূর্ণাকে লতিফা জড়িয়ে ধরে রেখেছে। সেই অবস্থায়ই পূর্ণা হুংকার ছাড়ে,' বেশ করেছি। আমার বোন আমার মা! আমার মাকে আপনার মা গালি দিয়েছে। আমি উনাকে ছেড়ে দিলে জাহান্নামেও আমার জায়গা হতো না।'
'কাজটা ঠিক করো নাই পূর্ণা!' মৃদুলের কণ্ঠে তেজের আঁচ পাওয়া গেল।
মায়ের প্রতি মৃদুলের সমর্থন দেখে পূর্ণা রাগে বলে উঠলো,' এমন মায়ের ছেলেকে আমি বিয়ে করব না।'
মৃদুল তিরস্কার করে হেসে বললো,'আমিও করব না। তুমি না আমার গায়ের রঙের সাথে মানাও, না ব্যবহারের দিক দিয়া মানাও। জুতা মারি বিয়ারে।'
মৃদুল টেবিলে জোরে লাথি মেরে বেরিয়ে গেল। পদ্মজা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চেয়ারে বসলো। ছোট থেকে শত সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে সে ক্লান্ত। বড্ড ক্লান্ত!

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ
আমি পদ্মজা - ৮৩

_____

এখন যে দুপুর তা বুঝার সাধ্যি নেই! ঘন কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে পৃথিবী ঘুমিয়ে আছে। সকাল থেকে সূর্যের দেখা নেই। কুয়াশা তার গভীর মায়াজালে সূর্যকে লুকিয়ে রেখেছে। পূর্ণা আলগ ঘরের বারান্দায় বসে কাঁদছে। তার পাশে বসে আছে প্রান্ত। প্রান্ত পূর্ণাকে নিয়ে যেতে এসেছে। কিন্তু পূর্ণার কোনো হুঁশ নেই। সে কেঁদেই চলেছে। মগা আলগ ঘরে ঘুমাচ্ছে। নাক দিয়ে বের হচ্ছে বিদঘুটে শব্দ। সেই শব্দে প্রান্ত বিরক্ত! সে দুই আঙুল কানে ঢুকিয়ে চুপচাপ বসে রইলো। পূর্ণা হাঁটুর উপর থুতুনি রেখে সুপারি গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ বেয়ে টুপটুপ বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে। বুকের জ্বালাপোড়া সহ্য করতে পারছে না। মৃদুলের শেষ কথাগুলো তার শরীরের প্রতিটি পশমকে পুড়িয়ে দিয়েছে। এ ব্যথা সে কোথায় লুকোবে? মনের মণিকোঠায় যত্নে রাখা ভালোবাসার মুখের তিক্ত কথা কি সহ্য করা যায়! পূর্ণা নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে। বুকের ভেতর তুফান বয়ে যাচ্ছে। লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে ফুসফুস, কিডনি,মস্তিষ্ক,সর্বাঙ্গ! পূর্ণার হেঁচকি ওঠে। প্রান্ত চেয়ার ছেড়ে পূর্ণার সামনে এসে দাঁড়ালো। উৎকণ্ঠিত হয়ে বললো,'আপা!'
পূর্ণা তার ডাগরডাগর চোখদুটো মেলে প্রান্তর দিকে তাকায়। চোখের দৃষ্টিতে দুঃখের মহাসাগর। পূর্ণা প্রান্তকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো,'ভাই,আল্লাহ আমাদের থেকেই কেন সবকিছু ছিনিয়ে নেন?'
প্রান্ত পূর্ণার কথার মানে বুঝলো না। কিন্তু পূর্ণার কান্না তার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। সে পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো,' আল্লাহ সব ঠিক করে দিবেন আপা। বড় আপা বলে,যা হয় সব ভালোর জন্য হয়।'
পূর্ণার কান্নার দমকে কিশোর প্রান্ত কেঁপে-কেঁপে উঠে। আলগ ঘরের ডান পাশে রিদওয়ান দাঁড়িয়ে আছে। মৃদুল অন্দরমহলে আছে ভেবে সে পাতালঘর থেকে সোজা আলগ ঘরে এসেছে। কিন্তু এসে দেখে,এখানে পূর্ণা হাউমাউ করে কাঁদছে! ব্যাপারটা কী? রিদওয়ান আলগ ঘরে আর গেল না। কলপাড়ে রিনুকে দেখা যায়। রিদওয়ান চারপাশ দেখতে দেখতে কলপাড়ে আসে। রিনু রিদওয়ানকে দেখে ভয়ে জমে যায়। রিদওয়ান নানা অজুহাতে রিনুর গায়ে হাত দেয়। রিনুর ভালো লাগে না। ভয়ে কিছু বলতেও পারে না। সে এতিম! ছোট থেকে এই বাড়িতে বড় হয়েছে। যাওয়ার জায়গা নেই। রিদওয়ান রিনুকে প্রশ্ন করলো,' পূর্ণা কাঁদতেছে দেখলাম। কিছু জানিস?'
রিনু কাচুমাচু হয়ে সকালের ঘটনা খুলে বললো। সব শুনে রিদওয়ান খুব খুশি হয়। গুনগুনিয়ে গান গেয়ে অন্দরমহলের দিকে যায়। আমিনা আলোকে নিয়ে অন্দরমহলের সামনে খেলছেন। রিদওয়ান আলোর দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকলো,'মামা,এদিকে আসো।'
রিদওয়ান আলোকে কোলে নেয়। আমিনা ভারী করুণ ভাবে বললো,' আমার রানিরে কি পাওন যাইতো না?'
রিদওয়ান চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো,'খোঁজা হচ্ছে। পেয়ে যাবো।'
আলোকে আমিনার কোলে দিয়ে রিদওয়ান সদর ঘরে প্রবেশ করে। রান্নাঘর থেকে পদ্মজার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। রিদওয়ান সেদিকে যায়। পদ্মজা রিদওয়ানকে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল। কাজে মন দিল। রিদওয়ান পদ্মজার উপর চোখ রেখে কপাল কুঁচকায়! এই মেয়ে এতো চুপচাপ আর স্বাভাবিক কেন? সব মেনে নিল নাকি? রিদওয়ান মনের প্রশ্ন মনে রেখেই জায়গা ত্যাগ করে। যাওয়ার পূর্বে লতিফাকে বলে গেল,'লুতু,খাবার নিয়ে আয়।'
রিদওয়ান চোখের আড়াল হতেই লতিফা ভেংচি কাটে। মাংস রান্না হচ্ছে। মাংস রান্না হতে দেখলেই পদ্মজার ফরিনার কথা মনে পড়ে। ফরিনার হাতের মাংসের ঝোলের স্বাদ ছিল অন্যরকম। অন্দরমহলের বাম পাশে ফরিনার কবর! আজ তিনদিন তিনি পৃথিবীর মায়া ছেড়েছেন। পদ্মজার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। মাথার উপর ভারী বোঝা! বোঝা টানতে

কষ্ট হচ্ছে। নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে সে আল্লাহর নাম স্বরণ করছে। প্রার্থনা করছে, এই বোঝার ঘানি যেন সে টানতে পারে। সেই ক্ষমতা আর ধৈর্য্য যেন হয়! লতিফা পদ্মজাকে চাপাস্বরে ডাকলো,'পদ্ম?'
পদ্মজা তাকালো। লতিফা বললো,'তুমি আমারে না কইছিলা বড় কাকা আর ছোট কাকার সব খবর দিতে।'
পদ্মজা দরজার বাইরে একবার তাকালো। তারপর লতিফার দিকে ঝুঁকে বললো,'কী খবর এনেছো?'
'শনিবার রাইতে ভোজ আসর বসাইবো।'
'কীসের?'
লতিফা কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। তার দৃষ্টি অস্থির। সে ফিসফিসিয়ে বললো,'মাইয়া পাচার করার কয়কদিনের মাঝে সবাই এক লগে বইয়া খাওয়া-দাওয়া করে। পরের কাম নিয়া কথাবার্তা কয়।'
'এটাও কী নিয়ম?
'হ।'
'কত্ত খারাপ এরা! এতো মেয়ের জীবন নষ্ট করতে পেরেছে সেই খুশিতে আনন্দ-ফূর্তি করে! কয়জন থাকবে জানো?'
লতিফা বললো,'পাঁচ জনে।'
পদ্মজা আর কথা বাড়ালো না। অন্যমনস্ক হয়ে উচ্চারণ করলো,'শনিবার রাতে!'
লতিফা কপাল ইষৎ কুঁচকিয়ে বললো,'কিতা করবা ভাবছো?'
পদ্মজা তেজপাতা হাতে নিয়ে বললো,'জানি না বুবু।'
পদ্মজা কথা বাড়াতে চাইছে না বুঝতে পেরে লতিফা আর কথা বললো না। সে রিদওয়ানের জন্য খাবার প্রস্তুত করে।।পদ্মজা বললো,' জানো,তোমার ভাই আমার আগে দুটো বিয়ে করেছে!'
লতিফার হাত থেকে থালা পড়ে যায়। ঝনঝন শব্দ হয়। ভাত,ঝোল মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে।

মৃদুল পুকুরপাড়ে বসে আছে। তার চোখ দুটি লাল। আজ ট্রেন নেই। আগামীকাল ভোরে ট্রেন আসবে। জুলেখার ফুফাতো বোনের শ্বশুর বাড়ি অলন্দপুরে। আটপাড়ার পাশের গ্রাম নয়াপাড়ায়! জুলেখা সোজা তার বোনের বাড়িতে চলে এসেছে। এখানে আসার পর থেকে বাড়ির পাশে পুকুরপাড়ে বসে আছে মৃদুল। তার জিভ ভারী হয়ে আছে। অকপট বলে দেওয়া কথাটা তাকে খুঁড়ে, খুঁড়ে খাচ্ছে। পূর্ণার কান্নামাখা চোখ দুটি বার বার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। বুকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। দুশ্চিন্তায় দপদপ করছে মাথার রগ। কান্নারা গলায় এসে আটকে আছে। রাগের বশে সে জীবনে অনেক ভুল করেছে। কিন্তু এইবারের ভুলটা আত্মার উপর আঘাত হানছে। নিজের কথা দ্বারা নিজেই কষ্ট পাচ্ছে। জুলেখা বানু মৃদুলকে খুঁজে পুকুরপাড়ে আসেন। তিনি মৃদুলের উপর বেজায় খুশি! মৃদুলকে বললেন,'আব্বা,খাইতে আসো।'
মৃদুল দূর্বল গলায় বললো,'পরে খামু। যান আপনি।'
জুলেখা মৃদুলের পাশে বসলেন। মৃদুলের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন,'তোমার লাইগগা আসমানের পরী আনাম। মন খারাপ কইরো না।'
'লাগব না আমার আসমানের পরী।'
মৃদুলের কণ্ঠস্বর কঠিন হওয়াতে জুলেখা বানুর হাসি মিলিয়ে যায়। তিনি বললেন,'দেহো আব্বা,তুমি চাইছো আর পাও নাই এমন কিছু আছে? ওই ছেড়ি কালা। ছেড়ির বইনেরও চরিত্র ভালা না...'

'চুপ করেন আম্মা। আল্লাহর দোহাই লাগে,চুপ করেন। আপনি কারে কি কইতাছেন? পদ্মজা ভাবির নখের যোগ্যেরও কোনো নারী নাই। আর আপনি তারে চরিত্রের অপবাদ দিতাছেন।'
মৃদুল চিৎকার করে কথাগুলো বললো। মৃদুলের চিৎকার শুনে জুলেখার বোনের শ্বাশুড়ি পুকুরপাড়ে উঁকি দেন। সেদিকে তাকিয়ে জুলেখার লজ্জা হয়। মাথা হেট হয়ে যায়। তিনি রাগে চাপাস্বরে বললেন,'আমি কইতাছি না গেরামের মানুষ কইছে? ওই ছেড়ির শ্বশুরেও কইছে। এরা মিছা কইছে?'
'হ কইছে। আমি লিখন ভাইরেও চিনি,পদ্মজা ভাবিরেও চিনি। এই দেশের নামীদামী একজন অভিনেতা কেন অন্য বাড়ির বউয়ের সাথে লুকিয়ে সম্পর্ক রাখব আম্মা? তার কী সুন্দর মাইয়ার অভাব? পদ্মজা ভাবিরে লিখন ভাই পছন্দ করে ঠিক। কিন্তু পদ্মজা ভাবির সাথে আমির ভাইয়ের বিয়া হইবার আগে থাইকা। পদ্মজা ভাবি এমনই পবিত্র একজন মানুষ যে,লিখন ভাই এত্ত ভালোবাসে জাইননাও কোনোদিন লিখন ভাইয়ের দিকে ফেইরা তাকাইছে না। জামাইরে ভালোবাসছে। পদ্মজা ভাবি,দিনরাত এবাদত করে। ভাই-বোনের দায়িত্ব নিছে। এমন মানুষ খুঁইজা পাইবেন? পূর্ণার কাছে ওর বইনে ওর মা। তুমি ওর মারে খারাপ কথা কইছো। এজন্যে ও তোমার সাথে খারাপ করছে। আর পূর্ণা তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে তাই আমিও...'
মৃদুল আর কথা বলতে পারলো না। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। জুলেখা পিছনে ফিরে তাকান। বোনের শ্বাশুড়ি তাকিয়ে রয়েছে! জুলেখার মুখটা অপমানে থমথমে হয়ে যায়। গটগট শব্দ তুলে জায়গা ছাড়লেন। মৃদুল জুলেখার যাওয়ার পানে তাকালো। সে তার মায়ের স্বভাব জানে। এখন খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিবে। উনিশবিশ হলেই নিজের ক্ষতি করে বসেন। এজন্য গফুর মিয়াও কিছু বলেন না,আর না মৃদুল কিছু বলতে পারে! মৃদুল মাথা নত করে কান্নায় ডুবে যায়। শেষ কবে সে কেঁদেছে জানে না!

পূর্ণা পদ্মজাকে না বলে বাড়িতে চলে গেছে। পদ্মজা এক হাতে কপাল ঠেকিয়ে চোখ বুজে বসে আছে। মস্তিষ্কে ঘুরাঘুরি করছে আমিরের কু-কীর্তি! তার দুটো বিয়ে,নারী আসক্তি,সমাজের চোখে কলঙ্কিত হওয়া আর ফরিনার মৃত্যু! কানে বাজছে 'নষ্টা' শব্দটি। কতো ঘৃণা নিয়ে জুলেখা বানু এই শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন! তারপর মৃদুলের বলা কথাগুলো শুনে পূর্ণার অবাক চাহনি! পূর্ণার রক্তাক্ত হৃদয়ের যন্ত্রণা পদ্মজা টের পাচ্ছে! বুকটা ভারি হয়ে আছে। কান্না মন হালকা করে। কিন্তু কান্না আসছে না। আর কত কাঁদা যায়? পদ্মজা নিজেকে বুঝায়, আরো ধৈর্য্যশীল হতে হবে! এক হাতের দুই আঙুলে কপালের দুই পাশ চেপে ধরে।
আমির সদর ঘরে প্রবেশ করে থমকে যায়। তার হাতে কাপড়ের একখানা খালি ব্যাগ। পদ্মজা পা দেখেই চিনে ফেলে,মানুষটা কে! সে মুখ তুলে তাকালো না। সেকেন্ড কয়েক আমির থম মেরে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর পদ্মজার পাশ কেটে দ্বিতীয় তলায় উঠে গেল। পদ্মজা অনুভব করে,তার অনুভূতিরা পাল্টে যাচ্ছে। চঞ্চল হয়ে উঠছে! আমির ঘরে প্রবেশ করেই দ্রুত আলমারি খুললো। একবার দরজার দিকে তাকালো। তারপর কাগজে মুড়ানো একটা বস্তু দ্রুত ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। যখন আলমারি লাগাতে যাবে একটা খাম মেঝেতে পড়ে। খামের উপরের লেখাটা আমিরের চেনা-চেনা মনে হয়। তাই সে পদ্মজার অনুমতি ছাড়াই খামের ভেতর থেকেচিঠি বের করলো। চিঠির লেখাগুলো দেখে শতভাগ নিশ্চিত হয়ে যায়, এটা আলমগীরের চিঠি!
আমিরের ভ্রু দুটি বেঁকে গেল। সে উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতিটি লাইন পড়লো। প্রতিটি শব্দ তার মগজে আঘাত হানে! আতঙ্কে গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায়। নিজের অজান্তে এক কদম পিছিয়ে আসে। আলমগীরের খামের ভেতরের পৃষ্ঠায় কিছু লেখার অভ্যেস রয়েছে। আমির খাম ছিঁড়লো। তার ধারণা ঠিক! সাদা খামের ভেতরের পৃষ্ঠায় আলমগীরের বর্তমান ঠিকানা ও পাতালঘরের সঠিক

অবস্থানের কথা লেখা আছে! আমির আলমগীরের ঠিকানাটা মুখস্থ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু মুখস্থ হচ্ছে না। ভেতরটা কাঁপছে। পদ্মজা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমির পদ্মজার উপস্থিতি টের পেয়ে হাতের খাম ও চিঠিগুলো বিছানার উপর রেখে কাপড়ের ব্যাগটা হাতে তুলে নিল। তারপর পদ্মজার দিকে তাকালো। তার চাহনি যেন মৃত! পদ্মজা কয়েক পা এগিয়ে এলো। আমির অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। পদ্মজা রয়ে সয়ে প্রশ্ন করলো,' আর কিছু জানার আছে?'
আমির নির্বিকার! তার মুখে রা নেই। পদ্মজা বিছানা থেকে একটা চিরকুট হাতে নিল।
বললো,'আপনার দুই বউয়ের নাম কী ছিল?'
আমির বললো,'শারমিন,মেহুল।'
পদ্মজার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠে। আমির পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। চোখের পলকও পড়ছে না। পদ্মজা ঢোক গিলে বললো,'আমরা যে ঘরে একসঙ্গে থেকেছি,তারাও কি সেই ঘরে আপনার সঙ্গে থেকেছে?'
'না,অন্য বাড়িতে।'
'তাহলে সব সত্য?'
'মিথ্যা বলে যদি তোমাকে আরো একবার পাওয়া যেত আমি মিথ্যা বলতাম।' আমিরের সরল গলা। পদ্মজার নাকের পাটা ফুলে যায়। আমিরের সাথে কথা বললে তার এতো কান্না পায় কেন! আমির বললো,'আসি।'
পদ্মজা শ্বাসরুদ্ধকর কণ্ঠে বললো,'কেন?'
আমির থামলো। পদ্মজা কান্না করে দিল। সে কিছুতেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।
আমির বললো,'আমাকে কান্না দেখাতে দাঁড় করালে?'
পদ্মজা জল ভরা আগুন চোখে আমিরের দিকে তাকায়। কিড়মিড় করে বললো,' নরপশু আপনি! এতগুলি মেয়ের ভালোবাসা নিয়ে খেলেছেন।'
আমির নির্বাক। তার চুপ করে থাকাটা পদ্মজাকে আরো জ্বালা দেয়। তার অবচেতন মন চায় একবার আমির বলুক, সব মিথ্যে। কিন্তু আমির বলে না। কারণ,সব সত্য! সব সত্য! পদ্মজা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে বললো,' কথা বলার মুখ নেই? এতো লজ্জা হা? আসলেই লজ্জা আছে?'
পদ্মজা তাচ্ছিল্যের হাসি দিল। আমির চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। বুকের ভেতর আগুন ছুটে বেড়াচ্ছে। যেদিকে যাচ্ছে সেদিকটা পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। পদ্মজা এলোমেলো হয়ে গেছে। আমির বের হওয়ার জন্য উদ্যত হতেই পদ্মজা বললো,'আমাকে তালাক দিন। আমি আপনার বউয়ের পরিচয়ে আর থাকতে চাই না।'
পদ্মজার কথা শোনামাত্র আমিরের বুকটা কেঁপে উঠলো। কোথেকে যেনো একটা উত্তাল ঢেউ এসে মনের সমস্ত কিনার ওলট-পালট করে দিল। আমির কথা বলতে গিয়ে দেখলো কথা আসছে না। পদ্মজা আরো একবার চেঁচিয়ে বললো,'আমার তালাক চাই। আপনার বউ হওয়া কলঙ্কের।'
আমির অনেক কষ্টে কয়টা শব্দ উচ্চারণ করলো,'থাক না এক-দুটো কলঙ্ক।'
পদ্মজা সেকেন্ড তিনেক ছলছল চোখে তাকিয়ে রইলো। তারপর মুহূর্তে ভুলে যায় পৃথিবী। ভুলে যায় পাপ-পুণ্য। ঝড়ের গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমিরের বুকে। শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। ছেড়ে দিলে যদি হারিয়ে যায়! আমিরের বুকের সোয়েটার কামড়ে ধরে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে বললো,' চলুন না, দূরে পালিয়ে যাই। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'
পদ্মজা জড়িয়ে ধরতেই আমিরের শরীরের রক্ত চলাচল থেমে যায়। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। সেই জল ফুটন্ত পানির মতো গরম। এ যেন দগ্ধ হওয়া হৃদয়ের আঁচ!

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৮৪

_____
হৃদয়ের প্রলয়ঙ্করী ঝড় ক্ষণমুহূর্তের জন্য থামিয়ে আমির বললো,' ছাড়ো পদ্মজা।'
পদ্মজার কান্না থেমে যায়! হাত দুটি আমিরের পিঠ থেকে সরে যায়। পদ্মজা তার জলভরা নয়ন দুটি মেলে আমিরের দিকে তাকালো। তার রক্ত জবা ঠোঁট দুটি কাঁপছে। হোঁচট খাওয়া গলায় পদ্মজা বললো,' আমার হৃদয়ের আকুলতা আপনাকে ছুঁতে পারছে না?'
আমির ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে। পদ্মজা দূরে সরে দাঁড়ালো। আমিরের কৃষ্ণ মুখে, বিপর্যস্ত পদ্মজার নিষ্কম্প স্থির চোখের দৃষ্টি থমকে আছে। পদ্মজা থেমে থেমে বললো,' তাহলে আমি...আমিও বঞ্চিত ভালোবাসা থেকে!'
পদ্মজার দুই চোখ বেয়ে জল পড়ছে। আমির আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না। চোখের পলকে প্রস্থান করলো। পদ্মজা ধাতস্থ হয়ে আচমকা ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো চিৎকার করে উঠলো,' ধিক্কার নিজের উপর! জানোয়ারকে মানুষ হওয়ার সুযোগ দিয়েছি! ধিক্কার নিজের ভালোবাসার উপর! প্রতিটি কাজের জন্য আপনি শাস্তি পাবেন। আমি আপনার আজরাইল হবো।'
পদ্মজার গলার হাড় ভেসে উঠে। তার চিৎকার অন্দরমহলকে কাঁপিয়ে তুলে। কাঁদতে-কাঁদতে সে মেঝেতে বসে পড়লো। আমিরের প্রত্যাখ্যান তার ভালোবাসাকে ক্রোধে পরিণত করছে। পদ্মজা রাগে বিছানার চাদর টেনে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেললো। বুকের ভেতরটা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে! ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ! পানি প্রয়োজন!

ফরিনার কবরের চারপাশে বাঁশের বেড়া দেয়া হয়েছে। আমির ফরিনার কবরের পাশে এসে বসলো। হাতের ব্যাগটা পাশে রেখে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ফরিনার কবরে হাত বুলিয়ে দিল। গাঢ় স্বরে ডাকলো,'আম্মা! আমার আম্মা।'
চারিদিকে নিস্তব্ধতা। অন্দরমহল থেকে কোনো শব্দ আসছে না। নিস্তব্ধতা ভেঙে- ভেঙে মাঝেমধ্যে পাতার ফাঁকেফাঁকে পাখ-পাখালির ডানা নাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমিরের ঠোঁট দুটো কিছু বলতে চাইছে কিন্তু পারছে না। অথবা সে কিছু বলছে কিন্তু শব্দ হচ্ছে না। আড়ষ্টতা ঘিরে রেখেছে তাকে। সে তার মৃত মা'কে কিছু বলার সাহস পাচ্ছে না। আমির অনেকক্ষণ নতজানু হয়ে চুপচাপ বসে রইলো। তারপর উঠে দাঁড়ালো। ব্যাগ হাতে নিয়ে পাতালঘরের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করে। লতিফা অন্দরমহল থেকে অস্থির হয়ে বের হয়। তার হাঁটায় তাড়াহুড়ো। আমির ডাকলো,' লুতু।'
লতিফা দাঁড়াল। আমির বললো,' পদ্মজার খেয়াল রাখবি। খাওয়া-দাওয়া ঠিকঠাক রাখবি। আর, যখন যা বলে করবি।'
লতিফা মাথা নাড়াল। আমির প্রশ্ন করলো,'কোথায় যাচ্ছিস?'
আমিরের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লতিফা বললো,' ভাইজান,তোমারে কিছু কইতাম।'
'বল।'

'মৃদুল ভাইজানে আর তার আম্মা-আব্বা আইছিলো। মৃদুল ভাইজানের আম্মা মৃদুল ভাইজানরে পূর্ণার লগে বিয়া করাইতে রাজি হয় নাই। '
আমির কপাল কুঁচকাল। বললো,'কী সমস্যা? কেন রাজি হয়নি?'
রিদওয়ান অন্দরমহল থেকে বের হয়ে ফোড়ন কাটলো,'আমির,তোর সাথে কথা আছে।'
আমির পিছনে ফিরে তাকালো না। বললো,'পরে শুনব।'
রিদওয়ান বললো,'আমি জানি কেন রাজি হয়নি। আয়,ওদিকে যেতে যেতে বলি।'
লতিফা রিদওয়ানের দিকে তাকায়। রিদওয়ান তার চোখের দৃষ্টি দিয়ে লতিফাকে সতর্ক করে।
আমির রিদওয়ানের দিকে ফিরে বিরক্তি নিয়ে বললো,' আরে ভাই,যা তো। লুতু কী কী হয়েছে বলতো?'
রিদওয়ানের সামনে রিদওয়ান সম্পর্কে কিছু বলার সাহস লতিফার হলো না। সে বললো,' মৃদুল ভাইজানের আম্মা পূর্ণার গায়ের রঙ পছন্দ করে নাই। কইছে,কালা ছেড়ি ঘরে নিব না।'
আমির রাগ নিয়ে বললো,'ফালতু মহিলা! পূর্ণা জানে? কোথায় পূর্ণা?'
'হ জানে। এই বাড়িত আছিলো। এহন হেই বাড়িত গেছে।'
'মৃদুল...মৃদুল কী বললো?'
লতিফা পুরো ঘটনা খুলে বললো। এড়িয়ে গেল পদ্মজার ব্যাপারটা। সে মনে মনে পরিকল্পনা করলো,রাতে যদি রিদওয়ান অন্দরমহলে থাকে সে পাতালঘরে গিয়ে আমিরকে সব বলবে।
আমির সব শুনে বললো,' মৃদুল ছাড়া এই পরিস্থিতি ঠিক হবে না। দেখা যাক,ও কী সিদ্ধান্ত নেয়। আর ওই মুখছুটা মহিলাকে আমি একবার পাই শুধু!'
আমির রাগে গজগজ করতে করতে সামনে এগিয়ে যায়। রিদওয়ান লতিফাকে চাপা স্বরে হুমকি দিল,' গতকালের ঘটনা যদি আমিরের কানে যায় তোর খবর আছে। ল্যাং* করে গাছে ঝুলিয়ে রাখবো।'
লতিফা চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলে। বললো,' বাড়ির বাইরে গেলেই আমির ভাইজানে সব জাইননা যাইব। তহন ?'
লতিফার প্রশ্ন শুনে রিদওয়ান চিন্তায় পড়ে যায়। সে আমিরের পিছনে যেতে যেতে ভাবতে থাকে,এই পরিস্থিতি কী করে সামাল দিবে! আজ না হয় কাল আমির তো সব জানবে! আমির জঙ্গলে প্রবেশ করে রিদওয়ানকে বললো,' কী কথা না বলবি!'
রিদওয়ান বললো,' শনিবার রাতে ভোজ আসর হবে। চাচা সিদ্ধান্ত নিল।'
'আচ্ছা।'
'ছাগলের মাংস পুড়ানো হবে।'
'কয়টা?'
'দুটো।'
'বিরাট আয়োজন!'
দুজন কথা বলতে বলতে পাতালঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। রিদওয়ান ঘাস সরিয়ে দরজা খুললো। এক পা সিঁড়িতে দিতেই আমির রিদওয়ানের কাঁধ চেপে ধরলো। ফিসফিসিয়ে বললো,'এখানে কেউ আছে!'
আমিরের কথা শুনে রিদওয়ানের বুক ছ্যাঁত করে উঠলো। এমতাবস্থায় কে দেখে ফেললো! রিদওয়ান চারপাশে চোখ বুলায়। কোথাও কেউ নেই! আমিরের প্রখরতা নিয়ে তাদের কোনো সন্দেহ নেই। আমির যেহেতু বলেছে এখানে কেউ আছে। মানে আছে। রিদওয়ান চাপাস্বরে বললো,'এখন কী করব?'

আমির দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাক্তি। সে চারপাশে আরো একবার চোখ বুলিয়ে বললো,' কেউ এখানে থাকলে সে ডান দিকে আছে।'
রিদওয়ান ডান দিকে এগিয়ে যায়। তখনই একজন লোক ঝোপঝাড়ের মাঝখান থেকে উঠে দৌড়াতে শুরু করে। রিদওয়ান উল্কার গতিতে তাকে ধরে ফেললো। লোকটার মাথায় চুল নেই। পরনে লুঙ্গি আর ফতুয়া। পাটকাঠির মতো চিকন লোকটা ইয়াকুব আলীর সহকারী পলাশ মিয়া। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি অথবা ত্রিশই। রিদওয়ান পলাশকে ঘাড়ে ধরে আমিরের সামনে নিয়ে আসে। দেখে মনে হচ্ছে,রিদওয়ান জীবিত ইঁদুর ধরেছে। আমির পলাশকে প্রশ্ন করলো,' নির্বাচনের তো অনেক দেরি আছে। এখনই আমাদের পিছনে পড়ার রহস্যটা বুঝলাম না।'
পলাশ পাতালঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে বললো,' এইডা কিতা? এইহানে কিতা করেন আপনেরা?'
আমির হাসলো। পলাশের মাথায় টোকা মেরে বললো,' এই দৃশ্য দেখা তোর একদম ঠিক হয়নি। আয়ুটা কমে গেল।'

আমির পাতালে নেমে গেল। পলাশ ছটফট করতে থাকে। সে কিছুতেই ভেতরে যাবে না। সে ভয় পাচ্ছে। রিদওয়ান পলাশকে টেনে ভেতরে নিয়ে যায়। আমির বিওয়ানের চেয়ারে এসে বসলো। রিদওয়ান পলাশকে বেঁধে মেঝেতে ফেললো। চিৎকার,চেঁচামেচি করার জন্য পলাশ রিদওয়ানের হাতে দুই-তিনটা থাপ্পড় খেল। পলাশ কাঁদো-কাঁদো হয়ে আমিরকে বললো,' আপনেরা এমন করতাছেন কেন আমার লগে? আমারে ছাইড়া দেন।'
রিদওয়ান আমিরকে বললো,'তুই সামলা। আমি যাই,চাচার সাথে কথা আছে।'
আমির ইশারা করলো, যেতে। রিদওয়ান চলে গেল। পলাশ চারপাশ দেখে ঢোক গিললো। পাতালঘর মৃদু লাল-হলুদ আলোতে ডুবে আছে। কেমন ভূতুড়ে পরিবেশ! তার মনে হচ্ছে,সে কবরে আছে। আর সামনে ঘাড় বাঁকিয়ে বসে আছে স্বয়ং যমদূত! আমির এক পা চেয়ারে তুলে বললো,' তারপর,পলাশ মিয়ার এখানে কোন দরকারে আসা হয়েছে?'
পলাশ হাতজোড় করে বললো,'আমারে ছাইড়া দেন। আমি এমন কবর আর দেহি নাই। আমার কইলজাডা কাঁপতাছে।'
আমির ধমকে বললো,'এখানে আসছিলি কেন?'
পলাশ দ্রুত বললো,' ইয়াকুব চাচা পাডাইছে।'
'কোন দরকারে?'
'আমারে খালি কইছে,মজিদ মাতব্বরের বাড়িত যা। আমার মনে হইতাছে ওই বাড়িত কিছু একটা গোলমাল আছে। কিছু যদি বাইর করতে পারছ তোরে আরেকটা বিয়া দিয়া দিয়াম।'
আমির চমকাল। বললো,'উনার হুট করে কেন মনে হলো এখানে গোলমাল আছে?'
পলাশ কেঁদে বললো,'আমি এইডা জানি না ভাই। আমারে ছাইড়া দেন।'
আমিরের মাথায় কয়েকটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেয়ে যায়। কী এমন হলো যে, ইয়াকুব আলী হাওলাদার বাড়ি নিয়ে সন্দেহ করছে! আমির আয়েশি ভঙ্গিতে বসলো। বললো,' শুনেছি,গত বছর তোর বউকে নাকি হিন্দু এক জমিদারের কিনে নিয়েছে । তারপর তোর বউ আত্মহত্যা করলো! সত্যি?'
পলাশ মেঝেতে কপাল ঠেকিয়ে বললো,'ভাই,আমারে মাফ কইরা দেন। আমি ভুল করছিলাম। আমারে ছাইড়া দেন। আমি কেউরে কিছু কইতাম না।'
আমির বললো,'তুইতো ভাই আমার চাইতেও খারাপ। আচ্ছা,সবসময় তো পাপ কাজ করেছি। আজ একটা ভালো কাজ করার সুযোগ যখন পেয়েছি,করে ফেলি।'

পলাশের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। সে জানে না,এই কবরস্থানের মতো বড় ঘরটায় কী হয়! কিন্তু এখানে যে ভালো কিছু হয় না বুঝা যাচ্ছে। বাঁচতে পারলে পরে এর রহস্য বের করা যাবে। আমির চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পলাশের মুখে জোরে লাথি দিল। পলাশ আর্তনাদ করে শুয়ে পড়ে। আমির চারিদিকে চোখ বুলিয়েও কোনো অস্ত্র পেল না। সে টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা কাঁচি বের করলো। ধারালো কাঁচি। সে কাঁচি দিয়ে পলাশের মুখে আঁচড় কাটে। হাতে-পায়ে,শরীরে আঁচড় কাটে। পলাশের বিদঘুটে চিৎকার পাতালঘরেই চাপা পড়ে যায়। তার চামড়া ছিঁড়ে রক্ত ঝরতে থাকে। আমিরকে আব্বা ডেকে অনুরোধ করে,তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু সে জানে না, আমির কখনো তার শিকারের প্রতি মায়া দেখায় না। আমির পলাশের পাশে বসলো। দুই-তিনবার মাথা ঘুরাল। খুব নিঃস্ব লাগছে নিজেকে,মাথাটা ফাঁকা লাগছে। সে কাঁচি দিয়ে নিজের হাতে হেঁচকা টান মারে। সাথে-সাথে হাত থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসে। পলাশ আমিরের কাণ্ড দেখে চমকে যায়। আমির কাঁচি রেখে মেঝেতে শুয়ে পড়ে। শূন্যে চোখ রেখে হাসে। হাসতে হাসতে গড়াগড়ি করে দেয়ালের পাশে যায়। ভয়ে পলাশের আত্মা কেঁপে উঠে! আমির দেয়ালের পাশ ঘেঁষে বসে। পলাশের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে উঠে। হঠাৎ করে তার কী হয়ে গেল? আমিরের উন্মাদ আচরণ দেখে পলাশের গায়ের পশম দাঁড়িয়ে পড়ে। আমির চট করেই উঠে দাঁড়াল। পলাশকে টেনে বসালো। তারপর নিজে গিয়ে চেয়ারে বসলো।
ব্যাগ থেকে কাগজে মুড়ানো বস্তুটি বের করলো। কাগজের ভাঁজ খুলতেই একটা লাল বেনারসি বেরিয়ে আসে। আমির লাল বেনারসি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে পলাশকে বললো,'আমার আম্মা ছোটবেলা একটা গল্প বলতেন,এক রাজা প্রতি রাতে বিয়ে করে প্রতি রাতেই বউকে খুন করতেন। তারপর শেষদিকে যে রানিকে বিয়ে করেন সেই রানি রাতজেগে রাজাকে গল্প শোনাতেন। গল্প শেষ হতো না বলে রাজাও রানিকে খুন করতে পারতেন না। রানি এভাবে গল্প বলে-বলে অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। এখন আমি তোকে একটা গল্প শোনাব। আমাদের নিয়ম হচ্ছে,যতক্ষণ আমার গল্প চলবে ততক্ষণ তুই বেঁচে থাকবি। গল্প শেষ তোর আয়ুও শেষ।'
পলাশ হাতজোড় করে আকুতি-মিনতি করলো,' ভাই,আমার জীবন ভিক্ষা দেন। আপনেরা তো ভালা মানুষ ভাই। আপনেরার অনেক নাম। আমারে কেন মারতে চাইতাছেন? আমারে ছাইড়া দেন ভাই।'
পলাশের কথায় আমিরের ভাবান্তর হলো না। সে বেনারসি থেকে ঘ্রাণ নেয়ার চেষ্টা করলো। তারপর শূন্যে চোখ রেখে ঘোর লাগা গলায় বললো,' এক ছিল দুষ্টু রাজা! নারী আর টাকার প্রতি ছিল তার চরম আসক্তি। যে নারী একবার তার বিছানায় যেত তার পরের দিন সে লাশ হয়ে নদীতে ভেসে যেত। রাজা এক নারীকে দ্বিতীয়বার ছুঁতে পছন্দ করতো না। কিন্তু সমাজে ছিল রাজার বেশ নামডাক! সবার চোখের মণি। খুন করা ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী। তার কালো হাতের ছোঁয়ায় বিসর্জন হয়েছে হাজারো নারী। প্রতিটি বিসর্জন রাজার জন্য ছিল তৃপ্তিকর। তাকে শাস্তি দেয়ার মতো কোনো অস্ত্র ছিল না পৃথিবীতে। ভাইয়ের সাথে বাজি ধরে হেরে যায় রাজা। শর্তমতে,ভাইয়ের জন্য এক রাজকন্যাকে অপহরণ করতে যায়। সেদিন ছিল বৃষ্টি। সন্ধ্যার আগ মুহূর্ত। রাজকন্যার প্রাসাদে সেদিন কেউ ছিল না। রাজা এক কামরায় ওৎ পেতে থাকে। রাজকন্যা আসলেই তাকে তার কালো হাতে অপবিত্র করে দিবে। কামড়ায় ছিল ইষৎ আলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর সেই কাঙ্খিত মুহূর্ত আসে। রাজকন্যার পা পড়ে কামড়ায়। রাজকন্যা রাজাকে দেখে চমকে যায়। ভয় পেয়ে যায়। কাঁপা স্বরে প্রশ্ন করে "'কে আপনি? খালি বাড়িতে কেন ঢুকেছেন?" সেই কণ্ঠ যেন কোনো কণ্ঠ ছিল না। ধনুকের ছোঁড়া তীর ছিল। রাজার বুক ছিঁড়ে সেই তীর ঢুকে পড়ে। রিনঝিনে গলার রাজকন্যাকে দেখতে রাজা আগুন জ্বালাল। আগুনের হলুদ আলোয় রাজকন্যার অপরূপ মায়াবী সুন্দর মুখশ্রী দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে যায়। তার পা দুটো থমকে যায়। রাজকন্যা যেন এক

গোলাপের বাগান। যার সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে রাজার কালো অন্তরে। রাজা কী আর তখন বুঝেছিল,সৃষ্টিকর্তা তাকে তার পাপের শাস্তি দেয়ার জন্য সেদিন অস্ত্র পাঠিয়েছিল!'
আমির পলাশের দিকে তাকিয়ে হাসলো। কী মায়া সেই হাসিতে! মায়াভরা সেই হাসি প্রমাণ করে দিল,সেদিনটার জন্য সে কতোটা খুশি!

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৮৫

_____
মঙ্গলবার দুপুর বারোটা। হাওলাদার বাড়িতে কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। আলগ ঘরের বারান্দায় মজিদ বসে আছেন। তার সামনে খলিল এবং রিদওয়ান। রিদওয়ান চারপাশ দেখে মজিদের দিকে ঝুঁকে বললো,' কাকা,পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে। তার আগে আমাদের কিছু করতে হবে।'
মজিদ পান চিবোতে চিবোতে বললেন,' কোন পরিস্থিতি?'
'আমিরের হাব-ভাব ভালো না। ও কখন আমাদের উপর চড়া হয়ে যায় জানি না। আপনি আমি আব্বা সবাই জানি আমির কী কী করতে পারে! আমির আম্মাকে আর আব্বাকে কখনোই পছন্দ করেনি। আপনাকেও সেদিন মারলো। তাছাড়া আমাদের উপর আমিরের পুরনো একটা ক্ষোভ আছে।'
মজিদ পান চিবানো বন্ধ করে বললেন,' বাবু আমাদের খুন করবে?'
রিদওয়ান সোজা হয়ে বসলো। লম্বা করে নিঃশ্বাস নিয়ে বললো,' কাকা, আমির পদ্মজার জন্য পাগল। পদ্মজার জন্য অনেক কিছু করতে পারে। আমাদের খুন করে পদ্মজাকে নিয়ে ভালো থাকতে চাইতেই পারে।'
মজিদ হাসলেন। যেন রিদওয়ান কোনো কৌতুক বলেছে। রিদওয়ান অধৈর্য্য হয়ে পড়ে। বললো,'কাকা,বিশ্বাস করুন আমি আমিরর চোখেমুখে কিছু একটা দেখেছি। ও কিছু একটা করতে যাচ্ছে। আর পদ্মজা তো আছেই। পদ্মজা এতো শান্ত-স্বাভাবিক,মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি। এসব লক্ষণ কিন্তু ভালো না কাকা। আমির যেমন ভয়ংকর পদ্মজাও তেমন ভয়ংকর। যেকোনো মুহূর্তে আমাদের ক্ষতি করতে পারে।'
মজিদ হাওলাদার মেরুদণ্ড সোজা করে বসলেন। গুরুতর ভঙ্গিতে বললেন,' পদ্মজাকে নিয়ে আমারও চিন্তা আছে। এই মেয়ের চোখের দিকে তাকানো যায় না।"
মজিদ হাওলাদারের কল্পনায় পদ্মজার চোখ দুটি ভেসে উঠে। সবসময় তিনি পদ্মজার চোখের ভেতর আগ্নেয়গিরি দেখতে পান। তিনি দ্রুত মাথা ঝাঁকালেন। বললেন,'খলিল, পদ্মজার কিছু একটা করতে হবে। এই মেয়ে ক্ষতিকর। ধরে-বেঁধে রাখার মেয়ে না। '
খলিল বললেন,'এই ছেড়ি এতোকিছু দেইক্ষাও ডরায় নাই। আর কেমনে ডরাইবো?'
মজিদ থুথু ফেলে বললেন,' পদ্মজাকে রাখাই যাবে না। এই দায়িত্ব রিদুর।'
রিদওয়ানের চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠলো। পরপরই সেই আলো নিভে গেল। সে প্রশ্ন করলো,' আর আমির? আমির পদ্মজার ক্ষতি মানবে না।'
মজিদ চিন্তায় পড়ে যান। কিছু বলতে পারলেন না। রিদওয়ান উত্তেজিত। সে চেয়ার ছেড়ে মজিদের পায়ের কাছে বসলো। বললো,' কাকা, গত পরশু যা হলো,আমির জানতে পারলে

আপনাকে, আমাকে আর আব্বাকে কাউকে ছাড়বে না। আমির গ্রামের সবাইকে ডেকে সবকিছু বলে দিতে পারে।'
মজিদ ধমকে উঠলেন,' বাবু এটা কখনো করবে না। নিজের ক্ষতি করবে না।'
'করবে কাকা,করবে। ওর মাথা ঠিক নাই। আমাদের ক্ষতি করতে ওর হাত কাঁপবে না। মাথাও কাজ করবে না। আর নিজের ক্ষতি তো এখনই করতেছে। পরেও করতে পারবে।'
মজিদ হাওলাদারের চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ে। রিদওয়ানের কথায় যুক্তি আছে। রিদওয়ান বললো,' কাকা,আমির এখন আমাদের জন্যও হুমকি।'
মজিদ হাওলাদার রিদওয়ানের দিকে ঝুঁকে বললেন,'আমির ছাড়া আমরা অচল রিদু। এখনের মানুষ সচেতন,বুদ্ধিমান,আইন শক্তিশালী এমন অবস্থায় আমির ছাড়া কী করে চলবে? আমিরের মাথা পরিষ্কার। একবার-দুইবার না বার বার পুলিশ সন্দেহ করেও সন্দেহ ধরে রাখতে পারেনি। আমির সামলিয়েছে।'
রিদওয়ান আশ্বাস দিল,'কাকা,আমরা সাবধান থাকব। আপনাদের পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা আছে আর আমার বিশ বছরের অভিজ্ঞতা। আমরা চাইলে সামলাতে পারবো।'
মজিদ হাওলাদার রিদওয়ানের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। বললেন,' বাবুর জায়গা নেয়ার জন্য এসব বলছিস?'
রিদওয়ানের চোখেমুখে হতাশার ছাপ পড়লো। সে চেয়ারে উঠে বসলো। বললো,' আমার একার কোনো স্বার্থসিদ্ধি নাই কাকা। আব্বা আর আপনাকেও বাঁচাতে চাইছি। আমির আগের আমির নাই। আপনার বড় ভুল পদ্মজার সাথে আমিরের বিয়ে দেয়া।'
মজিদ হাওলাদার উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর স্বরে বললেন,' আমার ছেলের সাথে আমি কথা বলবো। তারপর সিদ্ধান্ত নেব।'
মজিদ হাওলাদার চলে যান। তিনি চোখের আড়াল হতেই রিদওয়ান মজিদের চেয়ার লাথি দিয়ে ফেলে দিল। রাগে গজগজ করতে করতে বললো,' শু*** বাচ্চা।'
খলিল রিদওয়ানের উরুতে এক হাত রেখে বললেন,' মাথাডা ঠান্ডা করো আব্বা।'
রিদওয়ান চোখ বড়-বড় করে বললো,' আর কতদিন ওদের বাপ-ব্যাঠার কামলা খাটব? আদেশ মানব? মার খাব? বলতে পারেন? আমার বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে,আপনি অকর্মার ঢেকি আব্বা। কাকা সবকিছু আমিরের নামে করে দিল আপনি টু শব্দও করেননি। '
খলিল হাওলাদার দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইলেন। তিনি ছোট থেকেই মনে মনে মজিদের উপর ক্ষিপ্ত। গোপনে অনেক পরিকল্পনাই করেছেন কখনো তা বাস্তবে রূপ নেয়নি!

লতিফা পদ্মজার ঘরে প্রবেশ করে দেখলো,পদ্মজা নেই। সে হাতের বস্তা পালঙ্কের নিচে রাখলো। বস্তার ভেতর পদ্মজার চাওয়া কিছু জিনিসপত্র রয়েছে। লতিফা ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য উদ্যত হয়। তখন গোসলখানা থেকে পদ্মজা বের হলো। পদ্মজাকে দেখে লতিফার শরীর কেঁপে উঠে। পদ্মজার পরনে একদম সাদা শাড়ি! ভেজা চুল থেকে টুপটুপ করে জল পড়ছে। এই সন্ধ্যাবেলা সে গোসল করেছে! বাঁকানো কোমর,ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ,ঘন কালো লম্বা চুল,রক্তজবা ঠোঁট,মসৃণ ত্বক থাকা সত্ত্বেও তাকে ভয়ংকর দেখাচ্ছে। পদ্মজা তো বিবাহিত সে কেন সাদা শাড়ি পরলো? লতিফার অনুভব হয়,তার পায়ের তলার মেঝে কেঁপে উঠেছে। পদ্মজা চুল মুছতে মুছতে বললো,' যা আনতে বলছিলাম এনেছো?'
লতিফা নিরুত্তর। পদ্মজা লতিফার দিকে তাকালো। লতিফা হা করে তাকিয়ে আছে। পদ্মজা ডাকলো,'লুতু বুবু?'

লতিফা এগিয়ে আসে। তার বিস্ময়কর চাহনি। পদ্মজা লতিফার বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পেরেছে।
লতিফা বললো,' তুমি সাদা কাপড় পিনছো কেরে?'
পদ্মজা হেসে বললো,'বলা যাবে না।'
লতিফা বলার মতো কথা খুঁজে পেল না। পদ্মজা আলমারি থেকে ছাই রঙা ব্লাউজ বের করলো। বিছানার উপর বসে বললো,' লুতু বুবু, ব্লাউজের এ পাশটা সেলাই করে দাও। তোমার হাতের সেলাই খুব সুন্দর হয়।'
লতিফার ধীর পায়ে পদ্মজা সামনে এসে দাঁড়ালো। পদ্মজার হাত থেকে ব্লাউজ নিয়ে বিছানায় বসলো। পদ্মজা একটা ছোট বাক্স থেকে সুই-সুতা বের করে লতিফাকে দিল। লতিফা রয়ে সয়ে বললো,' শাড়িডা কি বুড়ির?'
পদ্মজা ছোট করে জবাব দিল 'হু।'
লতিফা বললো,' হ,কাপড়ডা দেইক্ষাই চিনছি।'
পদ্মজা বললো,"দাদুর অবস্থা খুব বাজে। শরীরে মাছি বসে,বাজে গন্ধ বের হয়। যন্ত্রণায় ছটফট করে।'
লতিফা হঠাৎ করেই হইহই করে উঠলো,' আল্লাহর শাস্তি আল্লাহই দেয় বইন। বুড়ির সাথে উচিত অইতাছে। বুড়ি কানলে আমার যে কি শান্তি লাগে পদ্ম। মরুক বুড়ি,মরুক! '
পদ্মজা নরম স্বরে বললো,' এভাবে বলো না বুবু। এভাবে বলতে নেই।'
লতিফা পদ্মজার চোখের দিকে তাকালো। হাতের ব্লাউজটা বিছানায় রেখে পদ্মজার এক হাত চেপে ধরে বললো,' তুমি সাদা কাপড় কেরে পিনছো পদ্ম? আমারে কও।'
লতিফার চোখেমুখে জানার প্রবল আগ্রহ। পদ্মজা ধীরেসুস্থে বললো,' আমি ধরে নিয়েছি আমার স্বামী মৃত।'
'কিন্তু এইডা তো মিছা।'
পদ্মজা গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলে বললো,'এটা সত্য হবে বুবু।'
'পদ্মজা...'
'কিছু বলো না বুবু। এই সাদা রঙ আমার আত্মবিশ্বাস আর সাহসকে দ্বিগুণ করে দিয়েছে। সারাজীবন ভয়ে চুপ থেকেছো,অন্যায়কে-পাপকে সমর্থন করেছো। এবার অন্তত থেকো না। মরতে হবে তো তাই না? কবরে কী জবাব দিবে?'
লতিফা মাথা নিচু করলো। ক্ষণমুহূর্ত পর বললো,' আমিতো কইছি তোমার সব কথা মাইননা চলাম। এখনো কইতাছি,সব মাইননা চলাম।'
'এবার বলো,যা আনতে বলেছিলাম এনেছো?'
'হ আনছি। পালঙ্কের নিচে রাখছি।'
পদ্মজা পালঙ্কের নিচে থেকে বস্তা বের করে মেঝেতে বসলো। লতিফা ব্লাউজ সেলাই করা শুরু করে। পদ্মজা বস্তার ভেতর থেকে দুটো রাম দা, একটা চাপাতি বের করলো। লতিফা বললো,' পদ্ম, আমার অনেক ডর লাগতাছে। '
পদ্মজা রাম দায়ের আগা দেখতে দেখতে বললো,' কী জন্য?'
'তুমি যদি না পারো তুমারে ওরা মাইরা ফেলব।' লতিফার কণ্ঠে ভয়।
পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে লতিফার দিকে তাকালো। তার চোখ-মুখের রঙ পাল্টে গেছে। পদ্মজা বললো,' আজ অনুশীলন করব। দেখা যাক,আমার হাত কতোটা সাহসী।'
কথা শেষ করে পদ্মজা হাসলো। লতিফার অশান্তি হচ্ছে। সামনে কী হবে সে জানে না! কিন্তু যা ই হোক, খুব খারাপ হবে! পদ্মজা চাপাতি হাতে নিয়ে লতিফাকে ডাকলো,' বুবু?'
'কও পদ্ম।'

'জসিম গতকাল থেকে তোমার পিছনে ঘুরঘুর করছে দেখলাম।'
লতিফার মনোযোগ সেলাইয়ে। সে সেলাই করতে করতে বললো,'জসিম আমারে খারাপ প্রস্তাব দিছে। ডর দেহাইছে,রাজি না হইলে জোর কইরা নাকি খারাপ কাম করব।'
'ধর্ষণের হুমকি দিল?'
'হ।'
'জসিম,হাবু কতদিন ধরে কাজ করে এখানে?'
'অনেক বছর। দশ-বারো বছর তো হইবই।'
পদ্মজা চাপাতি দিয়ে রামদায় মৃদু আঘাত করে বললো,'হাবু তো এখন নাই। তাহলে শুরুটা জসিমকে দিয়েই হউক!'
লতিফা চুপ রইলো। তার কাছে খুন স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেক খুন সে নিজের চোখে দেখেছে। তাই খুনখারাপিতে তার ভয় নেই। কিন্তু এইবার ভয় হচ্ছে। খুব ভয় হচ্ছে। পদ্মজা সরাসরি কিছু বলেনি। তবে বুঝা যাচ্ছে সে কী করতে চলেছে। যদি পদ্মজা ধরা পড়ে যায়? তখন কী হবে!
লতিফা ঢোক গিলল। সেলাইয়ে মন দেয়ার চেষ্টা করলো। পদ্মজা প্রশ্ন করলো,'মগা কি এসবের সাথে জড়িত?'
'মগা অনেক ভালা পদ্ম। বাড়ির টুকটাক কাম করে। বেক্কলের মতো। আর খালি ঘুমায়। ওর ভিতরে প্যাচঁগোচ নাই।'
'বাড়ির ভেতর কখনো মেয়ে নিয়ে আসা হয়নি?'
'বাঁইচা আছে এমন আনে নাই। মরা আনছে।'
পদ্মজা চমকে তাকাল। প্রশ্ন করলো,'মৃত মেয়ে দিয়ে কী করে?'
লতিফা দরজার দিকে তাকালো। পদ্মজা দ্রুত উঠে যায় দরজা বন্ধ করতে। তারপর লতিফার সামনে এসে বসলো। লতিফা বললো,' যে ছেড়ি বেশি সুন্দর থাকে, জানে মারার পরেও রিদওয়ান ভাইজানে তারে ছাড়ে না। মরা মানুষের শরীরের উপর টান খলিল কাকার আছিলো। রিদওয়ান ভাইজানেও এই স্বভাব পাইছে।'
পদ্মজার গা গুলিয়ে উঠে। বমি গলায় চলে আসে। সে এক হাতে মুখ চেপে ধরলো। ঘৃণায় তার চোখে জলে ছলছল করে উঠে। লতিফা বললো,'রিদু ভাইজানে কয়দিন আগেও বস্তাত ভইরা এক ছেড়িরে বাড়ির ছাদে আনছিলো। তিন তলা ঘরের দরজায় তালা আছিলো। তাই ছাদে গেছিল। পরে আমি চাবি লইয়া গেছি। বস্তা থাইকা রক্ত পড়ছিল। শীতের মাঝে কাঁইপা-কাঁইপা আমি রক্ত ধুইছি।'
পদ্মজা কোনোমতে বললো,' তখন আমি এখানে ছিলাম?'
'হ। পূর্ণা আর মৃদুল ভাইজানেও আছিলো।'
পদ্মজা এক হাত কপালে ঠেকিয়ে বললো,'আল্লাহ! তাও আমার চোখে পড়েনি!'
পদ্মজা সেকেন্ড দুয়েকের জন্য থামলো তারপর বললো,' এমনকি আমি তিন তলার এক ঘর থেকে বোটকা গন্ধ পেয়েছিলাম তবুও ভাবিনি এই বাড়িতে এতো ভয়ংকর ঘটনা ঘটে!'
লতিফার সেলাই শেষ। সে ব্লাউজটি পদ্মজার উরুর উপর রেখে বললো,' লও তোমার বেলাউজ(ব্লাউজ)।'
পদ্মজা রাগে কিড়মিড় করে লতিফাকে বললো,'দেখো,রিদওয়ানের শরীর টুকরো,টুকরো করে কুকুরের সামনে ছুঁড়ে দেব আমি।'
লতিফা এতক্ষণে হাসলো। বললো,' আল্লাহ তোমারে শক্তি দেউক।'

পদ্মজার ডান হাত কাঁপছে। সে তার ধৈর্য্য ধরে রাখতে পারছে না। এই মুহূর্তে সে যা শুনেছে, তারপর শান্ত থাকা সম্ভব নয়। লতিফা পদ্মজার মস্তিষ্ক অন্য প্রসঙ্গে নেয়ার জন্য বললো,' পারিজারে কেলা মারছে জানো পদ্ম?'
পদ্মজা লতিফার দিকে তাকালো। পারিজার কথা মনে পড়লেই তার বুকের ব্যথা বেড়ে যায়। সে ম্লান হেসে বললো,' না। কিন্তু আন্দাজ করতে পেরেছি।'
'আমির ভাইজানে জানে।'
'সেটাও এখন বুঝতে পারছি। শুনেছি,তার আড়ালে একটা পাখিও উড়ে যেতে পারে না। সেখানে আমার মেয়ের খুনিকে সে চিনবে না? অবশ্যই চিনবে। কিন্তু কিছু করেনি কারণ এতে তার লোক কমে যাবে। ব্যবসার ক্ষতি হবে।'
'কিছু যে করে নাই এইডাও ঠিক না। এক মাস পরে আমির ভাইজানে জানছে,রিদু ভাইজানে হাবলু মিয়ারে দিয়া পারিজারে খুন করাইছে। সব জাইননা হাবলু মিয়ারে আমির ভাইজানে কুড়াল দিয়া কুপাইছে। রিদু ভাইজানরে আমির ভাইজানে খুন করতে চাইছিলো কিন্তু বড় কাকার লাইগগা পারে নাই। তয় মাসখানেক হাসপাতালে আছিলো। বছরখানেক রিদু ভাইজানে আমির ভাইজানের সামনে যায় নাই।'
পদ্মজা দুই হাতে চাদর খামচে ধরলো। তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। সে কান্নামাখা স্বরে বললো,' কী নিষ্ঠুর ওরা! আমার ছোট বাচ্চা!'
লতিফার পদ্মজার জন্য খুব মায়া হয়। মেয়েটা বড় বড় আঘাত সহ্য করেছে,করে যাচ্ছে! পদ্মজা বললো,' আমির হাওলাদার তার কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিত বলে সে আমার মেয়েকে কেড়ে নিয়েছে তাই না?'
লতিফা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল। পদ্মজা কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললো,'প্রতিশোধ নিয়েছে সে! আমিও নেব। করুণ মৃত্যু হবে তার। এতো বড় সাহস কী করে পেলো সে? আমির হাওলাদারের মেয়েকে খুন করার সাহস রিদওয়ানের থাকার কথা না। তার পিছনে মজিদ হাওলাদার আর তার ভাই ছিল। তাদের সমর্থন ছিল। সে জানতো,তাকে বাঁচানোর জন্য ঢাল হবে তারা।'
লতিফা বিচলিত হয়ে বললো,' কাইন্দো না পদ্ম। আর কাইন্দো না।'
পদ্মজা দুই হাতে চোখের জল মুছে বললো,' কাঁদব না আমি। আমার ছোট মেয়ে জান্নাতে তার নানুর সাথে আছে। সে সুখে আছে। এই জগতে তার না থাকাটাই ভালো হয়েছে বুবু।'
পদ্মজাকে যত দেখে তত অবাক হয় লতিফা। এই নারী কীসের তৈরি? এতো যন্ত্রণা, এতো দুঃখ নিয়েও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামবাসীর ছিঃ চিৎকার তাকে দূর্বল করতে পারেনি। যতবার ভেঙে যায় ততবার চোখের জল মুছে নতুন উদ্যমে বেঁচে উঠে। লতিফা দ্বিধাভরা কণ্ঠে বললো,'আমি তোমারে একবার জড়ায়া ধরি পদ্ম?'

লতিফা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এশার নামায আদায় করে
পদ্মজা ঘর থেকে বের হলো। দরজার পাশে জসিম নেই। একটু আগেই সে জসিমের কাশি শুনেছে। কোথায় গেল? অন্দরমহল অন্ধকারে ছেয়ে আছে। সন্ধ্যার পরপর বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার ব্যাপারটা বিরক্তিকর। বাড়িতে সাড়াশব্দও নেই। কখনোই থাকে না। সন্ধ্যা হলেই আলো ঘুমিয়ে পড়ে। রিনু তার ঘরে শুয়ে থাকে। লতিফা রান্নাঘরে টুকটাক কাজ করে,সবার আদেশ শুনে। আর এখন সবার খেয়েদেয়ে নিজের ঘরে যাওয়ার সময়। আর এই মুহূর্তেই জসিম উধাও! পদ্মজার স্নায়ু সাবধান হয়ে উঠলো।
লতিফা রান্নাঘরে থালাবাসন ধুচ্ছে। থালাবাসন ধোয়া শেষে পানি গরম করার জন্য চুলায় আগুন ধরালো। রান্নাঘরে আর আলো নেই। জসিম লতিফার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। লতিফা জসিমের

উপস্থিতি টের পেয়ে কপাল কুঞ্চিত করলো। পিছনে ফিরে বললো,' আপনে আমার পিছনে ঘুরতাছেন কেরে?'
'তোরে আমার পছন্দ অইছে। আমার লগে আয়।'
'আমি যাইতাম না।'
'আরে আয়,আয়।'
জসিম হাসলো। তার বিদঘুটে হাসি। সে অনেক চিকন হলেও তালগাছের মতো লম্বা। লতিফার মাথা উঁচু করে তাকাতে হয়। লতিফা জসিমের আক্রমণের জন্য মনে মনে প্রস্তুত ছিল। সে সজোরে প্রবল কণ্ঠে বললো,' এন থাইকা বাইর হইয়া যা কুত্তার বাচ্চা! নাইলে তোরে আমি দা দিয়া কুপাইয়াম।'
জসিম লতিফার ব্লাউজ টেনে ধরে। লতিফা চিৎকার করে দা হাতে নিতে নেয় জসিম লাথি দিয়ে দা সরিয়ে দেয়। লতিফা জসিমকে তার কাছ থেকে সরানোর চেষ্টা করে। দুজনের মাঝে ধ্বস্তাধস্তি শুরু হয়। জসিম গায়ের জোরে লতিফার স্পর্শকাতর স্থানে ছুঁতেই লতিফা চিৎকার করে মজিদ আর আমিনাকে ডাকলো। জসিম টেনেহিঁচড়ে লতিফার শাড়ি খুলে ফেললো। লতিফার গায়ে হাত দেয়ার অনুমতি সে খলিলের কাছে পেয়েছে। যদিও খলিল বলেছিল,বাড়িতে কিছু না করতে। কিন্তু জসিম সে কথা শুনেনি। ফলে,তার পরিণতি ভয়ংকর হয়। সাদা শাড়ির আবরণে আচ্ছাদিত পদ্মজা রান্নাঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। তার হাতে রাম দা। লতিফা পদ্মজাকে দেখে জসিমকে দুই হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। পদ্মজা শক্ত করে রাম দা ধরলো। তারপর 'জারজের বাচ্চা, মর' বলে পিছন থেকে জসিমের গলায় কোপ বসাল। জসিমের গলা অর্ধেক কেটে যায়। রক্ত ছিটকে পড়ে পদ্মজার গায়ে। লতিফার নাকমুখ রক্তে ভেসে যায়। কিছু রক্ত ছিটকে আগুনে পড়ে। রক্তে রান্নাঘরের থালাবাসন,পাতিল রাঙা হয়ে উঠে। দেহটি সজোরে শব্দ তুলে মেঝেতে পড়ে গেল। লতিফার মুখ দিয়ে রক্ত প্রবেশ করায় সে বমি করতে থাকে। পদ্মজার বুক হাঁপড়ের মতো উঠানামা করছে। সে চোখ বুজে লম্বা করে নিঃশ্বাস নিয়ে স্থির হলো। তারপর লতিফার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো,' এটা কিন্তু আমার দ্বিতীয় শিকার ছিল।'

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৮৬
_____
পদ্মজা রাম দা হাতে নিয়ে অন্দরমহল থেকে বের হলো। রাম দা থেকে চুইয়ে-চুইয়ে রক্ত পড়ছে। তার গায়ের সাদা শাড়িতে ছোপ-ছোপ রক্তের দাগ। লতিফা আড়চোখে পদ্মজাকে দেখছে। পদ্মজার শান্ত থাকা দেখে লতিফা বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়! পদ্মজার হাঁটা দেখে মনে হচ্ছে মানুষ খুন করাটাই তার কাজ! লতিফা নিজের কপালের ঘাম মুছে মিনমিনিয়ে বললো,' জসিমের লাশটা কিতা করাম?'
পদ্মজা কলপাড়ে পা রেখে শান্ত স্বরে বললো,' এতো বড় দেহ দুজন মিলে কিছুই করতে পারবো না। রিদওয়ান কুকুরটা ঘরে আছে না?'
লতিফার খুব ঘাম হচ্ছে। সে বিড়বিড় করে বললো,' তোমারে দেইখা আমার ডর লাগতাছে পদ্ম।'
লতিফার কথা পদ্মজার কানে আসতেই পদ্মজা হাসলো। বললো,' তুমি কখনো খুন করোনি?'

Kobitor.com

পদ্মজা শীতল চোখে তাকায়। লতিফা মাথা নাড়িয়ে বললো,'না,করি নাই।'
'শুধু দেখেছো?'
'হ।'
'রিদওয়ানকে গিয়ে বলো,পদ্মজা জসিমরে খুন করছে।'

কলপাড়ের এক পাশে সাদা রঙের বালতি ভর্তি পানি রয়েছে। পদ্মজা বালতির পাশে বসলো। পদ্মজার কথা শুনে লতিফার বুক ছ্যাঁত করে উঠে। সে দুই কদম এগিয়ে এসে চাপাস্বরে বললো,' এইতা কিতা কও পদ্ম! রিদু ভাইজানে জানলে...'
লতিফাকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে পদ্মজা বললো,'কিছুই হবে না। বরং লাশটা সরিয়ে ফেলতে সাহায্য করবে।'
পদ্মজা রাম দা বালতির ভেতর রাখলো। সঙ্গে-সঙ্গে সাদা পানি লাল হয়ে উঠে। লতিফা কথা বলছে না,চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সে দ্বিধাগ্রস্ত। পদ্মজা লতিফার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো,' যা বলেছি করো বুবু।'

লতিফা জবাবে কিছু বললো না। সে উল্টোদিকে ঘুরে অন্দরমহলে চলে গেল। চারিদিকে অন্ধকার। তবে আকাশে চাঁদ আছে। জোনাকি পোকারা অনর্থক গল্প করে যাচ্ছে। তাদেরও কী পদ্মজার মতো শীত অনুভব হয় না? শিশির পড়ছে। মৃদু বাতাসও রয়েছে। তীব্র ঠান্ডায় মাটিও যেন কাঁপছে। শুধু কাঁপছে না পদ্মজা। শীতের দানব তার শরীর ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে পারছে না। পদ্মজার বুকের ভেতর একটা উষ্ণ অনুভূতি ছুটে বেড়াচ্ছে। সেই উষ্ণ অনুভূতি শীতের দানবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।
রাম দা-এ লেগে থাকা জানোয়ারের রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয় পদ্মজা। তারপর অন্দরমহলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো। অন্দরমহলের সদর দরজার দিকে ফিরে তাকাতেই রিদওয়ানের দেখা মিলল। রিদওয়ান তার দিকে ছুটে আসছে। চোখেমুখে ক্রোধ স্পষ্ট।
পদ্মজা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ালো। ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে রিদওয়ানকে স্বাগত জানালো।
রিদওয়ান নিঃশ্বাসের গতিতে এক হাতে পদ্মজার গলা চেপে ধরে বললো,'বেশ্যা মা* মরার ইচ্ছে জাগছে তোর?'

পদ্মজা রিদওয়ানকে বাঁধা দিল না। সে ঠোঁটে হাসি ধরে রাখলো। রিদওয়ান পদ্মজার হাসি দেখে ভড়কে যায়। পরক্ষণেই রেগে গিয়ে আরো জোরে চেপে ধরে পদ্মজার গলা। কিড়মিড় করে বললো,' জন্মের মতো হাসি বন্ধ করে দেব!'
পদ্মজার চোখ উল্টে আসতেই রিদওয়ান পদ্মজার গলা ছেড়ে দিল। পদ্মজা দুই-তিনবার কাশলো। তারপর রিদওয়ানের চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ শব্দ করে হেসে দিল! রিদওয়ানের শরীর রাগে কাঁপছে। সে পদ্মজার ব্যবহারে হতভম্ব! পদ্মজার চোখেমুখে ভয়ের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই! রিদওয়ান দ্রুতগতিতে অন্দরমহলে ভেতর চলে গেল। লতিফা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। রিদওয়ান চলে যেতেই লতিফা দৌড়ে আসে পদ্মজার কাছে। লতিফাকে দেখে পদ্মজা কোনো কারণ ছাড়াই বললো,' শিকার তাকে বলে যাকে আমরা হত্যা করার উদ্দেশ্যে আঘাত করি।'
লতিফা শুধু ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইলো।

খলিল টয়লেটে যাচ্ছিলেন,রিদওয়ানকে অস্থির হয়ে মজিদ হাওলাদারের ঘরের দিকে যেতে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। রিদওয়ান মজিদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজায় জোরে শব্দ করলো।

সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। অস্থির হয়ে আছে। মজিদ হাওলাদার সবেমাত্র শুয়েছেন। দরজায় এতো জোরে শব্দ হওয়াতে খুব বিরক্ত হলেন। তিনি চোখে চশমা পরে দরজা খুললেন। ততক্ষনে খলিল হাওলাদারও সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি রিদওয়ানকে ডাকলেন,' রিদু আব্বা?'

রিদওয়ান ঘাড় ঘুরিয়ে খলিলকে একবার দেখলো। দরজা খোলার শব্দ হতেই সে সামনে তাকায়। মজিদ কিছু বলার পূর্বে রিদওয়ান দুই হাত ঝাঁকিয়ে মজিদকে বললো,'আমার কথা তো কোনোদিন শুনেন না।পদ্মজা কী করছে খবর রাখছেন?'
খলিল দুই তলায় উঠার সিঁড়িতে তাকিয়ে বললেন,' এই ছেড়ি আবার কোন কাম করলো?'
মজিদ উৎসুক হয়ে রিদওয়ানের দিকে তাকালেন। রিদওয়ান এক হাত দিয়ে অন্যে হাতের তালুতে থাপ্পড় দিয়ে বললো,' খুন করছে...খুন। জসিমের গলা কেটে রান্নাঘরে ফেলে রাখছে।'
মজিদ ও খলিল চমকালেন! রিদওয়ান গলায় জোর বাড়িয়ে বললো,' খুন করেও একদম স্বাভাবিক আছে। মনে ভয়ডর নাই। রাম দা হাতে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কতোটা ভয়ংকর হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন কাকা? আপনার অনুমতি নাই বলে ওই মা** আমার সহ্য করতে হলো। নয়তো ওরে আমি কলপাড়েই গেঁথে আসতাম।'
মজিদ হাওলাদার কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। আচমকা এমন একটা খবর পেয়ে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন। রিদওয়ান গলার জোর আরো বাড়ালো,'পদ্মজার হাতে অস্ত্র উঠে গেছে কাকা! অস্ত্র! ওদিকে আমিরের খবর নাই। পাতালঘরের দরজায় নতুন তালা দিয়ে চাবি নিয়ে ভেতরে বসে আছে। খাবারও কেউ নিয়ে যায় না,নিতেও আসে না। ভেতরে ও কী করতেছে তাও জানি না। ও নিজে মরবে আমাদেরও মারবে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমির-পদ্মজা দুজনই আমাদের জন্য হুমকি কাকা। বুঝতেছেন না কেন? আজকের ঘটনার পরও কি বুঝবেন না? সময় থাকতে আপনি দুজনের কবর খোঁড়ার অনুমতি দেন।'

বৃহস্পতিবার, দুপুর ১:৪০ মিনিট। পূর্ণা দুপুরের নামায আদায় করে লাহাড়ি ঘরের চেয়ে কিছুটা দূরে অবস্থিত গোলাপ গাছটির পাশে বসে রয়েছে। গোলাপ গাছটি তার ভীষণ প্রিয়। এই গাছটি তার মন খারাপের সঙ্গী,একাকীত্বের সঙ্গী! প্রেমা পূর্ণার পিছনে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু পূর্ণা টের পেল না। সে অন্যমনস্ক। তার ঠোঁটে লেগে আছে মিষ্টি হাসি। প্রেমা পূর্ণার কাঁধে হাত রাখে। পূর্ণা চমকে উঠে। প্রেমাকে দেখে বুকে তিনবার থুথু দিল। তারপর বললো,' ভয় দেখালি কেন?'
'কখন ভয় দেখালাম?'
'কখন ভয় দেখালাম হা?'
প্রেমা ভ্রুকুঞ্চন করলো। পূর্ণা বললো,' কী দরকার বল?'
পূর্ণার ব্যবহার দেখে বিরক্তি ধরে গেছে প্রেমার। সে তীব্র বিরক্তি নিয়ে বললো,'বড় আম্মা খেতে ডাকছে।'
'যা,আমি আসছি।'
'আমার সাথে আসো।'
পূর্ণা রাগ নিয়ে বললো,'যেতে বলছি,যা তো।'
'তুমি কী ভাবছিলে? মুচকি-মুচকি হাসছিলে কেন?'
'তোকে বলতে হবে?'
প্রেমা দৃঢ়কণ্ঠে বললো,'হ্যাঁ,বলতে হবে।'
পূর্ণা মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বললো,'তর্ক করবি না। থাপ্পড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব।'
'সবসময় ঝগড়া করো কেন?'

'আমি করি? নাকি তুই বেয়াদবি করে আমাকে রাগাস!'
প্রেমা গাল ফুলিয়ে চলে যেতে নিল,তখনই পূর্ণা চট করে প্রেমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলো। প্রেমা পূর্ণাকে ধাক্কা দিয়ে সরানোর চেষ্টা করে বললো,'ছাড়ো। লাগবে না আমার আদর।'
পূর্ণা প্রেমাকে শক্ত করে ধরে রাখে। প্রেমার কাঁধে থুতুনি রেখে আহ্লাদী স্বরে বললো,' কালতো সারাজীবনের জন্য চলেই যাব। রাগ করে না লক্ষী বোন।'
পূর্ণার কথা শুনে প্রেমা চুপ হয়ে যায়। ঘাড় ঘুরিয়ে পূর্ণার দিকে তাকালো। অবাক হয়ে প্রশ্ন বললো,'কোথায় যাবা?'
পূর্ণা ঠোঁট কামড়ে হাসলো। প্রেমা জোর করে পূর্ণার থেকে ছুটে যায়। একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়াল।
পূর্ণা সারাজীবনের জন্য চলে যাবে শুনে প্রেমা বিচলিত হয়ে পড়েছে। সে প্রশ্ন করলো,'বলো, কোথায় যাবা?'
পূর্ণা হাত দিয়ে ঢেউয়ের মতো করে বললো,'অনেক দূরে!'
'জায়গার নাম নেই?'
পূর্ণা হাসলো। তার চোখেমুখে খুশি উপচে পড়ছে। প্রেমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙার পথে! পূর্ণা বললো,'বিকেলে জানতে পারবি।'
'এখন বললে কী সমস্যা? '
পূর্ণা হঠাৎ চোখমুখ কঠিন করে বললো,'বেশি কথা বলিস! আম্মা ডাকতেছে না খেতে? চল।'
'কিন্তু...'
পূর্ণা প্রেমাকে ধাক্কা দিয়ে তাড়া দিল,'চল,চল।'

বারান্দায় পা রাখার পূর্বে পূর্ণা ঘাড় ঘুরিয়ে গেইটের দিকে তাকালো। তার ভেতরে-বাহিরে বসন্তের কোকিল কুহু কুহু করে ডাকছে। মনের বাগানে ফুটেছে শত রঙের ফুল। সেই ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণে তলিয়ে যাচ্ছে সে। হারিয়ে যাচ্ছে বারংবার ফেলে আসা অনাকাঙ্ক্ষিত মধুর ক্ষণে। সেদিন পূর্ণা হাওলাদার বাড়ি থেকে ফিরেই মোড়ল বাড়ির উঠানে বসে পড়ে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাটিয়ে দেয় মুহূর্তের পর মুহূর্ত! বাসন্তী অনেক বুঝিয়েছেন, যেন পূর্ণা ঘরে যায়। চারিদিক ছিল কুয়াশায় ঢাকা। কুয়াশার জন্য কয়েক হাত দূরের বস্তুও চোখে পড়ছিল না। এমতাবস্থায় পূর্ণা উঠানে, শিশিরভেজা মাটিতে বসেছিল। প্রেমা-প্রান্ত কেউ বুঝাতে পারেনি। বাসন্তী কেঁদে বলেছেন,' আমি তোর আপন মা না এজন্যে আমার কথা শুনস না?'
তাতেও পূর্ণার ভাবান্তর হলো না। সে যে বসে আছে তো আছেই। পাথর হয়ে গেছে। না শীত,না বাসন্তীর কান্না কিছুই ছুঁতে পারেনি। বিচ্ছেদের যন্ত্রণা তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। মা সমতূল্য বড় বোনের সাথে মনমালিন্য, ভালোবাসার পুরুষের সাথে বিচ্ছেদ কী করে সহ্য করবে? কী করে?...বুকের ভেতরটায় আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। সে কী করে তা বাসন্তীকে দেখাবে?
সন্ধ্যার আযান পড়ার পরও যখন পূর্ণা ঘরে গেল না তখন বাসন্তী ও প্রেমা উঠানে পাটি এনে বিছালো। তারপর পূর্ণাকে প্রেমা বললো,'মাটিতে বসে থেকো না। পাটিতে বসো। কেন এমন করছো? বড় আপার সাথে কত খারাপ হলো! তার উপর তুমি এমন করছো!'
পূর্ণা আগের অবস্থানেই রইলো। "বড় আপার সাথে কত খারাপ হলো" কথাটি শুনে তার দুই গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। বাসন্তী এবং প্রান্ত পূর্ণাকে টেনে পাটিতে নিতে চাইলে পূর্ণা চিৎকার করে কেঁদে বললো,'কী সমস্যা তোমাদের? আল্লাহর দোহাই লাগে,একটু শান্তিতে থাকতে দাও। নয়তো আমি কিছু একটা করে ফেলবো। আমি আত্মহত্যা করবো। আমার আর সহ্য হচ্ছে না!'
পূর্ণার রুদ্রমূর্তির সামনে বেশিক্ষণ টিকে থাকার সাহস কারো হলো না। পূর্ণা যে ধাঁচের মেয়ে সে নিজের ক্ষতি করতে দুইবার ভাববে না। বাসন্তী ঘরে এসে চাপাস্বরে কাঁদতে থাকলেন। তিনি

আত্মগ্লানিতে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন। না পেরেছেন পদ্মজাকে অপবাদ থেকে বাঁচাতে,আর না পারছেন পূর্ণার কষ্ট কমাতে! সব ঘটনার জন্য তিনি নিজেকে দোষারোপ করছেন। বার বার মনে হচ্ছে, হেমলতা থাকলে এসব কিছুই হতো না। বাসন্তী মা হিসেবে নিজেকে ব্যর্থ মনে করছেন! প্রেমা বাসন্তীকে কাঁদতে দেখেও দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। তার নিজেরও বুক ভারী হয়ে আছে। গ্রামবাসী ছিঃ চিৎকার করছে। বাড়ি বয়ে এসে যা তা বলে যাচ্ছে। বড় বোন পদ্মজার সাথে মৃত মা হেমলতাকেও তারা ছাড়ছে না। সাথে মৃদুল-পূর্ণার নাম তো আছেই। কিশোরী এই ছোট মনে আর কতক্ষণ সহ্য ক্ষমতা ধরে রাখা যায়! প্রেমার চোখ দুটি ছলছল করে উঠে। চোখের জল গড়িয়ে পড়ার আগে দ্রুত মুছে ফেললো সে।

চারপাশ গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেছে। পূর্ণা উঠান ছেড়ে তার প্রিয় গোলাপ গাছটির পাশে এসে বসলো। গাছের পাতা আলতো করে ছুঁয়ে দিতেই দুই ফোঁটা শিশির ঝরে পড়ে মাটিতে। প্রেমা পূর্ণার জন্য অপেক্ষা করতে করতে বারান্দার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাসন্তী বারান্দার মুখে মোড়া নিয়ে বসে আছেন। পূর্ণাকে বাইরে রেখে তিনি ঘরে থাকতে পারবেন না! নিজের অজান্তে একসময় চোখ লেগে যায়। প্রান্ত টয়লেটে যাওয়ার জন্য বের হয়েছিল। লাহাড়ি ঘরের চারপাশ অন্ধকারে তলিয়ে আছে দেখে সে এগিয়ে আসে। অন্ধকারের জন্য পূর্ণাকে তার চোখেই পড়ছে না। তাই সে রান্নাঘর গিয়ে একটা হারিকেন জ্বালিয়ে নিয়ে আসে। তারপর পূর্ণার পাশে এসে বললো,' আপা, ঘরে চলো।'
পূর্ণা রুক্ষ চোখে তাকায়। কাঠ-কাঠ কণ্ঠে বললো,',যা এখান থেকে।'
তাও প্রান্ত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর পূর্ণার চেয়ে কিছুটা দূরে থাকা মুরগির খুপির উপর হারিকেন রেখে সে চলে যায়।

রাত গভীর থেকে গভীরত হয়। পূর্ণা গোলাপ গাছটি ছেড়ে লাহাড়ি ঘরের বারান্দায় যায়। সেখান থেকে আবার গোলাপ গাছের সামনে আসে। রাত বাড়ার সাথে কষ্টগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। আক্ষেপের ভারে শরীর ভার হয়ে আসছে! লাল বেনারসি পরার স্বপ্ন কী স্বপ্নই রয়ে যাবে? পায়ে আলতা দেয়া হবে না? হবে না একটা সংসার? যে সংসারে মৃদুল হবে কর্তা সে হবে কর্তী! মৃদুল কেন তাকে বুঝলো না? মৃদুল কি তাকে ভালোবাসেনি? কখনো মুখফুটে কেন বলেনি ভালোবাসার কথা? অসহ্য যন্ত্রণায় তার ইচ্ছে হচ্ছে নিজের চুল ছিঁড়ে ফেলতে!
গা ছমছমে পরিবেশ। নিস্তব্ধতায় ঘিরে আছে চারপাশ। বৃষ্টির ফোঁটার মতো শিশির পড়ছে। লাহাড়ি ঘরের টিনের ছাদে টুপটুপ শব্দ হচ্ছে! পূর্ণার শরীর মৃত মানুষের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে। মৃদু কাঁপছেও। তবুও তার ইচ্ছে হচ্ছে না,ঘরে যেতে। হঠাৎ এক জোড়া পায়ের শব্দ কানে এসে ধাক্কা দেয়। পূর্ণা থমকে যায়। সে টের পায় কেউ একজন তার চেয়ে কয়েক হাত দূরে এসে দাঁড়িয়েছে। পূর্ণা চট করে উঠে দাঁড়ালো। ঘাড় ঘুরিয়ে আগন্তুককে দেখে তার চোখেমুখে কোনো পরিবর্তন ঘটলো না। সে অন্যদিকে ফিরে তাকালো। তারপর আবার আগন্তুকের দিকে তাকালো। না সে সত্যি দেখছে! মৃদুল এসেছে! এই কুয়াশাজড়ানো রাত, টুপটুপ শিশির আর হারিকেনের হলুদ আলো স্বাক্ষী বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত মৃদুল ঘায়েল করা চাহনি নিয়ে তাকিয়ে ছিল পূর্ণার দিকে! সেই চাহনির তীরবিদ্ধে পূর্ণার বুকের স্পন্দন থেমে গিয়েছিল। থেমে গিয়েছিল শ্বাস-প্রশ্বাস! চোখের পলক পড়েনি দীর্ঘক্ষণ!

মৃদুল যখন অস্পষ্ট স্বরে ডাকলো,'পূর্ণা।'

তখন পূর্ণার সম্বিৎ ফিরলো। সে আবিষ্কার করলো, মৃদুলের উপস্থিতি, মৃদুলের চাহনি তার মনের রাগ-ক্ষোভ পানি করে দিয়েছে! এ কেমন শক্তি! তবে মৃদুলের কণ্ঠ শুনে অভিমানের পাহাড়টা যেন মজবুত হয়ে দাঁড়িয়েছে! অভিমানের ভারে পূর্ণা বাজখাঁই কণ্ঠে বললো,' কী চাই?'

মৃদুল মাথা নত করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। সে কোনো জবাব দিতে পারলো না। পূর্ণা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও যখন উত্তর পেল না। তখন মৃদুলের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায়,মৃদুল পথ আটকে দাঁড়ায়। তার মাথা নত।

পূর্ণা বললো,' কী চান আপনি? এতো রাতে আমার বাড়িতে এসেছেন কেন? আপনার তো এতক্ষণে নিজের বাড়িতে থাকার কথা ছিল!'
মৃদুল কিছু বলতে চাইছে কিন্তু পারছে না, গলা আটকে আসছে। সে পূর্ণার চোখের দিকে তাকালো। তার চোখেমুখে অসহায়ত্ব স্পষ্ট! পূর্ণার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠে। ফর্সা মানুষের এই এক সমস্যা, তারা কাঁদলে চোখমুখ লাল হয়ে যায়। তখন দেখে খুব মায়া হয়। পূর্ণা গলার স্বর নরম হয়,' কী বলবেন বলুন। বলে বিদায় হোন।'

কত নির্দয়ভাবে পূর্ণা বিদায় হতে বললো! মৃদুলের মনে হলো,এমন নিষ্ঠুর কথা সে আগে কখনো শুনেনি! সঙ্গে -সঙ্গে মৃদুলের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। সে তার ভুলের ক্ষমা কী করে চাইবে বুঝতে পারছে না। সারাদিন সে অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়েছে! হারে হারে টের পেয়েছে পূর্ণাকে শুধু মন নয়,তার সুখের চাবিও দিয়ে বসে আছে! কখন, কী করে তার এতোবড় ক্ষতি হয়ে গেল সে বুঝতেও পারেনি! ভেবেছিল,পূর্ণাকে এই মুখ আর দেখাবে না। কিন্তু রাতের আঁধার পাহাড়সম যন্ত্রণার সূচ নিয়ে যখন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে আর স্থির থাকতে পারলো না। উল্কার গতিতে হাওলাদার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে গিয়ে দারোয়ানের কাছে জানতে পারলো, পূর্ণা নিজের বাড়ি চলে গিয়েছে। মৃদুল আর দেরি করেনি। কুয়াশার স্তর ভেদ করে ছুটে আসে প্রিয়তমার বাড়ি! কিন্তু এই মুহূর্তে মনের মণিকোঠায় জড়িয়ে রাখা প্রিয়তমাকে দেখে তার কথা হারিয়ে গেছে,হারিয়ে গেছে সত্ত্বা। নিজ সত্ত্বা হারিয়ে কাউকে ভালোবাসতে নেই! এ ক্ষতি কখনো পূরণ হয় না। কিন্তু প্রেমিক মন কি আর এতকিছু বুঝে! মৃদুলের চোখে পানি দেখে পূর্ণার গলা জড়িয়ে আসে। সে গোপনে ঢোক গিললো। মৃদুল তার কান্না আটকিয়ে বললো,' আমি তোমারে ছাড়া থাকতে পারবো না পূর্ণা।'
পূর্ণা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠে। তখন মৃদুল তাকে অবজ্ঞা করে চলে গিয়েছিল,এখন সেও এর প্রতিশোধ নিবে! পূর্ণা বললো,' কিন্তু আমি আপনাকে চাই না। আমার সাথে যাকে মানায় না আমি তার ধারেকাছেও থাকতে চাই না।'
পূর্ণার উচ্চারিত একেকটা শব্দ মৃদুলের বুক ছিঁড়ে ফুটো করে দেয়। সে পূর্ণার দিকে এক পা বাড়িয়ে বললো,'আমি তহন বুঝি নাই। আমি...আমি আমার রাগ সামলাইতে পারি নাই।'
মৃদুলের কথার ধরণ এলোমেলো! সে ভীষণ অস্থির। সে যেন নিজের মধ্যে নেই! পূর্ণা এত সহজে নরম হওয়ার পাত্রী নয়। সে তার তেজ উর্ধ্বে রেখে বললো,'কৈফিয়ত দেয়ার জন্য কষ্ট করে কালো মেয়ের কাছে আসতে গেলেন কেন? রাতের কালো আঁধারে কালো মেয়েটাকে কি দেখা যাচ্ছে?'
মৃদুল কী বলবে,কী করবে বুঝতে পারছে না। আচমকা সে পূর্ণার কোমর জড়িয়ে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। হঠাৎ যেন পাহাড়ের শক্ত মাটির দেয়াল ভেঙে ঝর্ণধারার বাঁধ ভেঙে গেল। পূর্ণার পায়ের তলার মাটি শিরশির করে উঠে। মাথা চক্কর দিয়ে উঠে। সর্বাঙ্গে ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায়। যেন মাথার উপর বরফের পাহাড় ধ্বসে পড়েছে। মৃদুল কান্নামাখা

স্বরে বললো,' আমি কখন এমন হইয়া গেলাম পূর্ণা! তুমি আমারে কোন নদীতে নিয়া ঝাঁপ দিলা। নদীর একূলও পাই না,ওকূলও পাই না। তুমি হাত ছাইড়া দিলেই মরণ! ধইরা রাখো আমারে!'
মৃদুলের আকুল আবেদন শুনে পূর্ণার বুকের পাঁজর ব্যথায় টনটন করে উঠে। তার অভিমানের পাহাড় মুহূর্তে ধ্বসে যায়। মৃদুল কখন তাকে এতো ভালোবেসে ফেললো? এই জাদু কখন হলো! এভাবে কোনো প্রেমিক কাঁদতে পারে! পূর্ণা মৃদুলের সামনে বসলো। তার চোখ দুটি আবারও জলে পূর্ণ হয়ে উঠে। সে মৃদুলের এক হাতে শক্ত করে ধরে। মৃদুল বললো,,'পূর্ণা আমি আর কুনুদিন এমন করতাম না। কুনুদিন না! এইবারের মতো মাফ কইরা দেও। যদি আর এমন করি তুমি আমারে আমার লুঙ্গি দিয়া শ্বাস আটকায়া খুন কইরো!'
মৃদুলের কথা শুনে পূর্ণার মনের আকাশের মেঘ কেটে যায়। সে মৃদুলের হাতের উপর কপাল ঠেকিয়ে হাসতে হাসতে কান্না করে দিল। বিচ্ছেদের পরের পূর্ণমিলন এতো মধুর হয় কেন? পূর্ণার ইচ্ছে হচ্ছে,মৃদুলকে নিয়ে দূরে কোথাও হারিয়ে যেতে!

শেষরাতের বাতাস সাঁ সাঁ করে উড়ছে। লাহাড়ি ঘরের বারান্দার চৌকিতে বসে আছে মৃদুল-পূর্ণা। দুজনের মাঝে এক হাত দূরত্ব। হাড় কাঁপানো শীত! পূর্ণা ঠকঠক করে কাঁপছে। মৃদুল মৃদু ধমকের স্বরে বললো,'কখন থাইকা কইতাছি,ঘরে যাও।'
পূর্ণা কাঁপছে ঠিকই তবে তার মুখে হাসি। সে ঠোঁটে হাসি ধরে রেখে বললো,' কাঁপতে ভালো লাগে আমার!'
'অসুস্থ হইয়া যাইবা তো। শরীর মরা মানুষের মতো ঠান্ডা হইয়া গেছে।'
'কিছু হবে না।'
মৃদুল পূর্ণাকে দেখে অবাক হচ্ছে। একটা মানুষ এমন তীব্র ঠান্ডা কী করে সহ্য করতে পারে! ফজরের আযান পড়ার খুব বেশি সময় নেই। ফজরের আযানের পূর্বে মৃদুলকে তার আত্মীয়র বাড়িতে পৌঁছাতে হবে। ফজরের নামাযের পরই ট্রেন আসবে। মৃদল চৌকি থেকে নেমে বললো,' আমি যাই এহন?'
মৃদুলের কণ্ঠে জড়তা। সে যেতে চাইছে না। পূর্ণা চৌকি থেকে নেমে মৃদুলের পাশে এসে দাঁড়ালো। মৃদুলের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো,' আসবেন তো?'
মৃদুল পূর্ণার খুব কাছে এসে দাঁড়ালো। পূর্ণার দুই গালে হাত রেখে বিভ্রম নিয়ে বললো,' বৃহস্পতিবার বিকালের মধ্যেই আইসসা পড়ুম। আর শুক্রবার আমার এই রানির সাথে আমার নিকাহ হইবো।'
মৃদুল নিকাহ শব্দটা খুশিতে বাকবাকম হয়ে উচ্চারণ করে। পূর্ণা বললো,'আপনার আম্মা রাজি না হলে?'
'পুরা দুইন্নারে এক পাশে রাইখা শুক্রবার আমি তোমারে বিয়া করাম। বিয়ার শাড়ি,গয়না সব নিয়া আসুম। তুমি খালি প্রহর গুণতে থাহো।'
পূর্ণার খুশিতে কান্না পাচ্ছে। তিনদিন পর সেও বউ সাজবে! মৃদুলের বউ হবে! সুদর্শন, বাউন্ডুলে,রাগী ছেলেটার বউ! ভাবতেই বুকের ভেতর শিহরণ বয়ে যাচ্ছে। মৃদুল আমুদে গলায় বললো,' এহন যাও, লেপের তলে ঢুইকা ঘুম দেও। তোমারে ধরছি না সাপরে ধরছি বুঝা যাইতাছে না। এত্ত ঠান্ডা! যাও ঘরে যাও।'
'টর্চ নিয়ে আসেননি? অন্ধকারে যাবেন কী করে?'
মৃদুল চুল ঝাঁকি দিয়ে ভাব নিয়ে বললো,' আমি মিয়া বংশের ছেড়া! দুইন্নাত এমন কিছু নাই যে আমার পথ আটকাইবো! যেমনে আইছি ওমনেই যামু।'
পূর্ণা ফিক করে হেসে দিল।

গেইটের কাছাকাছি এসে পূর্ণা বললো,' তাড়াতাড়ি আসবেন কিন্তু! আমি অপেক্ষা করব।'
মৃদুল হেসে মাথা নাড়াল। ইশারায় আশ্বস্ত করলো, সে তাড়াতাড়ি আসবে! গেইটের কাছে গিয়ে ফিরে তাকালো মৃদুল। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে! মনে হচ্ছে কিছু একটা বলা হয়নি। সে কথাটি না বললে,বড় ভুল হয়ে যবে। মৃদুল পূর্ণার সামনে এসে দাঁড়ালো। খুব কাছাকাছি! পূর্ণাও উৎসুক হয়ে আছে। সেও কি যেন শুনতে চাইছে! মৃদুল তার শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভেজাল। তারপর ডাকলো,'পূর্ণা?'
মৃদুলের কথার সাথে মুখ থেকে ধোঁয়া বের হয়। পূর্ণা স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে। মৃদুল পূর্ণাকে একবার দেখলো তারপর লাহাড়ি ঘরের দিকে তাকালো। তারপর আবার পূর্ণার দিকে তাকিয়ে বললো,'তুমি ছাড়া এই পৃথিবীর সুখ আমার জন্যে হারাম হইয়া যাক পূর্ণা!'
মৃদুলের প্রতিটা কথা এতো মধুর কেন মনে হচ্ছে পূর্ণার! তারা যেন নতুন কোনো জগতে চলে এসেছে। যেখানে শুধু সে,মৃদুল, প্রেম,প্রেম আর প্রেম! পরক্ষণেই মৃদুল বললো,'ভালোবাসি না কইলে হয় না? কইতেই হয়?'
পূর্ণা চোখে জল নিয়ে হেসে উঠে। তার রেশমি কালো চুল মৃদু বাতাসে উড়ছে। কুয়াশার আবছা আলোয় শ্যামবর্ণের পূর্ণাকে আবেদনময়ী মনে হচ্ছে। রাতের অন্ধকারের নিজস্ব ক্ষমতা আছে। রাত মানুষের মনের অনুভূতিকে সযত্নে জাগ্রত করে তুলে। মৃদলের উপর রাত তার নিজস্ব ক্ষমতা ফলায়! ফলস্বরূপ, মৃদুলের মনের জানালায় উঁকি দেয় নিষিদ্ধ সব আবদার! যখন মৃদুলের নিজের মনের চাওয়া বুঝতে পারলো সে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে হঠাৎ বলে উঠলো,'শয়তান,শয়তান!'
পূর্ণা হতভম্ব হয়ে যায়। সে চোখমুখ বিকৃত করে বললো,'শয়তান কে? আমি?'
মৃদুল অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। সে বললো,' না,না! তুমি হইবা কেন?'
মৃদুল চোখ ঘুরিয়ে চারপাশ দেখতে দেখতে আবার বললো,'দেখো,আমার চারপাশে শয়তান ঘুরতাছে।
পূর্ণা মৃদুলের চারপাশ দেখে বললো,'কোথায়? কীভাবে দেখলেন?'

মৃদুল অসহায় চোখে তাকায়। অনেকক্ষণ তাকিয়েই থাকে। তারপর বললো,'আমার তোমারে চুমু খাইতে ইচ্ছা করতাছে। এইটা তো শয়তানের কাম!'
মৃদলের সহজ/সরল স্বীকারোক্তি। পূর্ণার কান গরম হয়ে যায়। লজ্জায় চোখ নামিয়ে ফেলে। মৃদুল অস্থির হয়ে বললো,'আমি যাইতাছি।'
কথা শেষ করেই মৃদুল ঘুরে দাঁড়ায়। গেইটের বাইরে যেতে যেতে দুইগালে থাপ্পড় দিয়ে কয়েকবার উচ্চারণ করলো,' আসতাগফিরুল্লাহ,আসতাগফিরুল্লাহ!'
মৃদুল চোখের আড়াল হতেই পূর্ণা একা একা হেসে কুটি-কুটি হয়ে যায়।

পূর্ণা পায়ে আলতা দিয়ে প্রেমাকে বললো,'ভালো দেখাচ্ছে না?'
প্রেমা পূর্ণার উপর ভীষণ রেগে আছে। সে তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে বললো,' কথা বলব না তোমার সাথে।'
'ওমা! আমি আবার কী করলাম?'
'আম্মা এতো রান্নাবান্না করছে। আর তুমি পুরো বাড়ি নতুন করে গুছালে এখন আবার সাজতে বসেছো। কেন এসব হচ্ছে সেটা বলছো না! কেন?'
পূর্ণা ঠোঁট টিপে হাসলো। দুই ডজন লাল কাচের চুড়ি দুই হাতে পরে বললো,'আমি কি আর কখনো সাজিনি?'
'এবার আলাদা মনে হচ্ছে।'
'সেটা তোর দোষ।'

'আপা,বলো না।'
'বিরক্ত করবি না তো।'
প্রেমা রাগে পায়ে গটগট শব্দ তুলে সোজা রান্নাঘরে চলে গেল। এখন সে বাসন্তীকে চাপ দিয়ে সব জেনে নিবে! প্রেমাকে রাগাতে পূর্ণার বেশ লাগে। সে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। মৃদুল পূর্ণার আলতা দেয়া পা খুব পছন্দ করে! যতবার পূর্ণা আলতা দিয়েছে মৃদুল ততবার প্রশংসা করেছে। পূর্ণার নিজেকে প্রজাপতি মনে হচ্ছে। মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়ে বেড়াতে ইচ্ছে করছে যত্রতত্র। চোখ বুঁজলেই সেদিনের রাতটা ধরা দেয় ছবির মতন! মৃদুল চলে যাওয়ার পরদিন সকালে উঠেই পূর্ণা পদ্মজার কাছে গিয়েছিল। দুই বোনের মন-মালিন্য শেষ হয়েছে। পূর্ণার মুখে সব শুনে পদ্মজা ভীষণ খুশি হয়েছে। মাঝে একদিনের বেশি সময় চলে গেল,পদ্মজার সাথে পূর্ণার দেখা হয়নি। তাই পূর্ণা সিদ্ধান্ত নেয় সে এখন হাওলাদার বাড়িতে যাবে। মৃদুলের জন্য অপেক্ষা করা সময়টা খুব বেশি দীর্ঘ মনে হচ্ছে। ওই বাড়িতে গেলে সময়টা কেটে যাবে, আর ফিরেই দেখবে মৃদুল চলে এসেছে! তাছাড়া আমিরের সাথে পূর্ণা সাক্ষাৎ করতে চায়। পদ্মজার অনিশ্চিত জীবনটা গুছিয়ে দেয়ার কোনো পথ আছে নাকি খুঁজতে হবে! পূর্ণা মাথায় ঘোমটা টেনে নিল। তারপর চিৎকার করে বাসন্তীকে বললো,'বড় আম্মা,আপার কাছে যাচ্ছি।'
রান্নাঘর থেকে বাসন্তীর জবাব আসে,'যাস না এখন।'

কিন্তু চঞ্চল পূর্ণা কী কারো কথা শুনার মেয়ে! সে দৌড়ে পালাতে চায়। গেইটের কাছে এসেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। বড়ই কাঁটা পড়ে ছিল,সেই কাঁটা তেড়চাভাবে পূর্ণার হাতে প্রবেশ করে। কিঞ্চিৎ রক্ত বেরিয়ে আসে। তাতেও দমবার পাত্রী নয় সে। কাঁটা বের করে দ্রুত মোড়ল বাড়ি ছাড়লো! বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর পূর্ণার মনটা হঠাৎ করেই বিতৃষ্ণায় ভরে উঠে। সে ঘাড় ঘুরিয়ে মোড়ল বাড়ির দিকে তাকালো। গাছগাছালির ফাঁকফোকর দিয়ে তাদের ঘরের ছাদ দেখা যাচ্ছে!

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৮৭
_____
পদ্মজা দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ করে ফরিনার কবরের পাশে গেল। সাথে নিয়ে এসেছে গোলাপ, জারবেরা,গাঁদা ও চন্দ্রমল্লিকা গাছের চারা। ফরিনার কবরের চেয়ে একটু দূরে গর্ত খুঁড়লো। প্রথমে গোলাপ গাছের চারা রোপণ করে। রিদওয়ান অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে পদ্মজাকে দেখে সেকেন্ড তিনেকের জন্য দাঁড়ালো। তার চোখেমুখে আনন্দের ছাপ! তারা গত দুইদিন পদ্মজার উপর কোনো রকম চাপ প্রয়োগ করেনি এবং বাজে আচরণও করেনি! পদ্মজা প্রথম যখন ব্যাপারটা ধরতে পারলো অবাক হয়েছিল। পরে আন্দাজ করে নিয়েছে, আড়ালে নিশ্চয়ই কোনো ষড়যন্ত্র চলছে! পদ্মজা স্বাভাবিক আচরণ করলেও ভেতরে ভেতরে সর্বক্ষণ ওঁৎ পেতে থেকেছে। সাবধান থেকেছে।কিন্তু কোনো আক্রমণ এখনো আসেনি। রিদওয়ান পদ্মজার কাছে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েও সেদিকে গেল না। পদ্মজার উদ্দেশ্যে শিস বাজিয়ে যেখানে চাচ্ছিল সেদিকে চলে যায়। পদ্মজা শিস শুনেও তাকালো না। সে বুঝতে পেরেছে শিসটা কে দিয়েছে! পদ্মজা আরেকটা গর্ত খুঁড়লো চন্দ্রমল্লিকার জন্য।

Kobitor.com

আমির জানালা খুলে বাইরে তাকালো। সঙ্গে-সঙ্গে চোখেমুখে এক মুঠো বাতাস আর তীব্র আলো ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমির চোখ ছোট ছোট করে ফেললো। তারপর চারপাশে চোখ বুলাল। অন্দরমহলের কারো উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে না। কারো সাড়া শব্দও নেই। বাড়িটা মৃত হয়ে গেছে! একসময় কত শোরগোল ছিল! শাহানা,শিরিন,রানি,লাবণ্য,ফরিনার মতো ভালোমনের সহজ-সরল মানুষগুলো ছিল। এখন কেউ নেই! লাবণ্যর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল,হয়েছে কী? লাবণ্য নিজের ভাইকে ছাড়া কী করে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল! আর রানি? রানি ভাগ্যের সাথে অভিমান করে কোথায় হারিয়ে গেল? আদৌ বেঁচে আছে ? নাকি অভিমানের পাল্লাটা এতোই ভারী যে সইতে না পেরে নিজেকে উৎসর্গ করেছে? আমিরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। সে ফরিনার কবরের দিকে তাকালো। পদ্মজা বাঁশের কঞ্চি নেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছে মাত্র। তার সাদা শাড়ির আঁচল মাটি ছুঁইছুঁই। শাড়ির একপাশে কাদা মাখানো। সাদা শাড়ি পরা অবস্থায় পদ্মজাকে দেখে আমিরের আত্মা স্তব্ধ হয়ে যায়! সে চেয়ার খামচে ধরে। বুকের ভেতর সূচের মতো তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা শুরু হয়। ক্ষণ মুহূর্তের পার্থক্যে সেই যন্ত্রণা বুক ছাপিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাখ্যাতীত যন্ত্রণার অনুভতিতে তার ভেতরটা গাঁট হয়ে যায়।
সে তিনরাত, দুইদিন পাতালঘরে থেকে আজ সকালে বেরিয়ে এসেছে। অন্দরমহলে না গিয়ে সোজা আলগ ঘরে চলে আসে। মগার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে। মগা আমিরকে তার পাশে শুতে দেখে চমকায়। তবে উদ্ভ্রান্ত আমিরের সাথে কথা বলার সাহস হয় না। সে মেরুদণ্ড সোজা করে চুপচাপ শুয়ে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পর আমির ঘুম ঘুম চোখে বললো,'আমি যে এখানে আছি কেউ যেন জানতে না পারে।'
মগা সোজা থেকেই চোখ ঘুরিয়ে আমিরের পিঠের দিকে তাকিয়ে বললো,' আইচ্ছা।"
আমির ঘুমিয়ে পড়ে। এইতো কিছুক্ষণ আগেই তার ঘুম ভেঙেছে। শরীরে এক ফোঁটাও শক্তি ছিল না। দুইদিন শুকনো খাবার আর দুই বোতল পানি খেয়ে কাটিয়েছে। মগা আমিরের মুখ দেখে বুঝতে পারে, আমির ক্ষুধার্ত! সে অন্দরমহল থেকে পিঠা এনে দেয়। লতিফা গতকাল বিকেলে পিঠা বানিয়েছিল। আমির বিনাবাক্যে পিঠা খেল। তারপর জানালা খুলে পদ্মজার পরনে সাদা শাড়ি দেখে থমকে গেল,স্তব্ধ হয়ে গেল। আমিরের বুকের ভেতর থেকে কেউ একজন বললো, "এই চোখ গলে যাক। দৃষ্টি কমে যাক। সাদা রঙ এতো বিচ্ছিরি কেন?"
আমির অযত্নে বড় হওয়া মাথার চুলগুলো এক হাতে টেনে ধরে হা করে শ্বাস নিল। জানালা দিয়ে আসা আলোয় মগা আবিষ্কার করলো,আমিরের হাতে অগণিত কামড়ের দাগ! তাও সে চুপ থাকলো। আগ্রহ চাপা দিল। আমির হাতে কামড় দেয়ার জন্য হা করে তখন মগার উপস্থিতি টের পায় আর থেমে যায়। তার চোখ দুটি অস্বাভাবিক রকমের লাল! মগা চোখের দৃষ্টি নামিয়ে ফেলে। আমির পানি পান করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে।

পূর্ণা হাওলাদার বাড়িতে ঢুকেই আলগ ঘরের সামনে আমিরকে দেখতে পায়। আমিরকে দেখে অজানা,বোবা একটা অনুভূতি কুন্ডলী পাকিয়ে পূর্ণার বুকের ভেতর ঢুকে পড়ে। সে দৌড়ে আসে। পূর্ণাকে আসতে দেখে,আমির তার এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে, হাসি হাসি মুখ করার চেষ্টা করলো। পূর্ণা আমিরের সামনে এসে দাঁড়ায়। সে অবাক চোখে আমিরকে দেখে। আমিরের মাথার চুল লম্বা হয়েছে। চুলগুলো আগে চিকচিক করতো এখন কেমন ময়লা দেখাচ্ছে! দাঁড়ি-গোঁফের জন্য গাল দেখা যাচ্ছে না। শুকিয়েছে অনেক। আমিরকে দেখে পূর্ণার চোখেমুখে যে আনন্দটা আগে ফুটে উঠতো সেটা আজ নেই। বরং বিষণ্নতায় ছেয়ে আছে! আমিরকে দেখেই পূর্ণার চোখ দুটি বিষণ্ন হয়ে উঠেছে।

পূর্ণার আমিরের জন্য মায়া হয়। আমির কখনো তার বোনের জামাই ছিল না,বড় ভাই ছিল! তাই অনুভূতিটা ছোট বোনের মতোই রক্তাক্ত।
পূর্ণা পাংশুটে স্বরে বললো,'আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারি না ভাইয়া।'

পূর্ণার কথা শুনে আমির অবাক হলো না। সে শুনেছে, পূর্ণা একরাত এখানে ছিল। তাহলে পদ্মজা নিশ্চয়ই কিছু বলেছে। পূর্ণা আবার বললো,' এতো নিখুঁত অভিনয় কেউ করতে পারে না। তোমার ধমক,উপদেশ, ভালোবাসা কিছু অভিনয় ছিল না। এতটুকু আমি বুঝতে শিখেছি। তুমি চাইলে সব খারাপ কাজ ছেড়ে দিতে পারবে। ভাইয়া দয়া করে তুমি আমার ভালো ভাই-ই থাকো!'
পূর্ণা কেঁদে দিল। সে কান্না ছাড়া অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে না। আমির সবসময় পূর্ণার মাথায় হাত রেখে উপদেশ দেয়,স্বান্তনা দেয়। অভ্যাসমতো আজও পূর্ণার মাথায় হাত রাখতে গেল,কিন্তু রাখলো না। থেমে গেল। যদি পূর্ণা এই ছোঁয়াকে অপবিত্র মনে করে! আমির নিজের হাত গুটিয়ে নিল। প্রসঙ্গ পাল্টাতে বললো,' মৃদুল নাকি আজেবাজে কথা বলেছে?'
পূর্ণার বুকের ভেতরে থাকা টনটনে অভিমানটা কণ্ঠস্বরে বলে উঠলো,'কথা ঘোরাচ্ছ কেন ভাইয়া?'
আমির নিরুত্তর। পূর্ণা বললো,' তোমার নাকি মন নেই? মায়াদয়া নেই? তুমি নাকি পাষাণ, নিষ্ঠুর!' এতো করুণ কারো কণ্ঠ হয়? বোন বলছে, তুমি নাকি পাষাণ,নিষ্ঠুর! উত্তরে কী বলবে আমির? হ্যাঁ আমি পাষান বলবে? নাকি চুপ থাকবে? আমির বুঝতে পারলো না। পূর্ণা আমিরের নিশ্চুপ থাকাটা পছন্দ করছে না। শ্যামবর্ণের আমির হাওলাদারকে একসময় পূর্ণা পছন্দ না করলেও এখন আত্মার সাথে মিশে গিয়েছে। আমির বাচাল প্রকৃতির মানুষ। সারাক্ষণ কথা বলে। কিন্তু আজ তার মুখে কথা নেই। সে নির্জীব, নিষ্ক্রিয়। পূর্ণা সাবধানে ভেজা কণ্ঠে বললো,' আমিও কি তোমাকে ঘৃণা করব ভাইয়া?'
আমির ছটফট করতে থাকে। তার পা দুটি অস্থির,চোখের দৃষ্টি অস্থির। কপালে ছড়িয়ে থাকা কয়টা চুল টেনে ধরে। পূর্ণা গাঢ় স্বরে বললো,'আপা খুব কষ্টে আছে ভাইয়া। আপা ছোট থেকে কষ্ট পেয়ে আসছে। এখনো পাচ্ছে। আর কতদিন কষ্ট পাবে?কবে সবকিছু ঠিক হবে?'
আমির চটজলদি উত্তর দিল,',দুইদিন!'
পূর্ণা ভ্রু কুঁচকাল। বললো,' দুইদিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে?'
আমির কথা বললো না। তবে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালো। পূর্ণার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। তবে কি,আমির সবকিছু ছেড়ে দিতে যাচ্ছে! পূর্নার ঠোঁটের হাসি প্রশস্ত হয়। সে খুশিতে বাকবাকুম হয়ে যায়। বললো,'সত্যি?'
আমির ধীরসুস্থে বললো,'আমাদের কী কথা হয়েছে পদ্মজাকে বলো না এখন।'
'বলব না,ভাইয়া। ভুলেও বলব না।'
আমিরের সাথে পূর্ণার বেশিক্ষণ কথা হলো না। আমির চুপচাপ,বিষণ্ন। পূর্ণা অনুমতি নিয়ে পদ্মজার কাছে চলে যায়। আমির বারান্দা থেকে চেয়ার নিয়ে বাইরে এসে বসলো। লতিফা মগাকে বাজারে পাঠানোর জন্য আলগ ঘরে আসে। ঘর থেকে বাইরে তাকিয়ে আমিরকে দেখতে পেল। আমিরকে দেখে সে প্রাণ ফিরে পায়! উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ঘর থেকে চিৎকার করে ডাকলো,'ভাইজান।'
আমির তাকালো। লতিফা ছুটে বাইরে আসে। সে গত দুইদিন পাতালঘরের আশেপাশে গিয়ে ঘুরঘুর করেছে কিন্তু আমিরের দেখা পায়নি। পদ্মজার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা না বলা অবধি সে কিছুতেই শান্তি পাবে না!

পদ্মজা চারা লাগানোর পর আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে গোড়ার মাটি শক্ত করে দিল। এরপর গোড়ায় পানি দিল। তারপর গাছকে খাড়া রাখার জন্য বাঁশের কঞ্চি ব্যবহার করে। কাজ শেষ করে হাত ধুয়ে উঠতেই পূর্ণার গলা ভেসে আসে,'আপা?'
পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। পূর্ণার চোখ দুটি মারবেলের মতো গোল গোল হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। পদ্মজার বুঝতে পারলো,তার পরনের সাদা শাড়ি দেখে পূর্ণা অবাক হয়েছে! পূর্ণা এগিয়ে এসে রাগী স্বরে বললো,'সাদা শাড়ি পরছো কেন আপা? তুমি কি বিধবা?'
পদ্মজা বালতি হাতে নিয়ে বললো,'বিধবা হলেই মানুষ সাদা শাড়ি পরে? এমনি পরা যায় না?'
'বিবাহিতারা সাদা শাড়ি পরতে পারে না। আবার এমন শাড়ি! অন্য কোনো রঙই নাই।'
'বলছিলাম না,এই বাড়িতে না আসতে? আমিতো আগামীকাল সকালেই যেতাম।'
'তুমি শাড়ি পাল্টাও।'
পদ্মজা ভ্রুকুটি করে বললো,'তুই তো ক্যাটকেটে হয়ে গেছিস। সংসার করবি কী করে?'
'আপা তুমি এই সাদা শাড়ি এক্ষুনি পাল্টাবে।'
পূর্ণাকে বাচ্চাদের মতো জেদ করা দেখে পদ্মজা হাসলো। বললো,'কেন ভালো দেখাচ্ছে না?'
পূর্ণা চোখ ছোট ছোট করে বললো,'না,দেখাচ্ছে না। ভূতের মতো দেখাচ্ছে।'
পূর্ণার দৃঢ়কণ্ঠ! তাকে এখন যাই বলা হউক সে শুনবে না। আগামীকাল বিয়েটা হয়েই গেলে পদ্মজার শান্তি। পদ্মজা অন্দরমহলের দিকে যেতে যেতে বললো,'ঘরে আয়।'
'আগে বলো,শাড়ি পাল্টাবা?'
পদ্মজার পূর্ণার দিকে তাকালো। পূর্ণা রাগী রাগী ভাব আনার চেষ্টা করে। পদ্মজা হাসলো। বললো,'ঘরে চল। পাল্টাব।'
পূর্ণা পদ্মজাকে পিছন থেকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। আজকের দিনটা আসলেই সুন্দর! যা চাচ্ছে তাই হচ্ছে! সে উল্লাসিত। পদ্মজা বললো,' বাড়ি ছেড়ে এলি কেন? মৃদুল এসে তোকে না দেখলে মন খারাপ করবে।'
'করলে করুক!'

ঘরে এসে পূর্ণা জোর করে পদ্মজাকে কালো শাড়ি পরিয়ে দিল। পদ্মজাও মেনে নিল। যদি মৃদুল আজ আসে আগামীকাল আল্লাহ চাইলে পূর্ণার বিয়ে হবে। তারপর চলে যাবে শ্বশুরবাড়ি। এরপর আর কোনোদিন দেখা হবে নাকি পদ্মজা জানে না! সজ্ঞানে,পরিকল্পিতভাবে সে যা করতে যাচ্ছে,তাতে আবার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই
আজ আর কালকের দিনটা শুধু পূর্ণার মতোই হউক! পূর্ণা পদ্মজাকে শাড়ি পরানো শেষে বললো,'কত সুন্দর লাগছে! আর তখন কী একটা মরা রঙের শাড়ি পরেছিলে। দেখতে খুব খারাপ লাগছিল।'
'আসলেই দেখতে খারাপ লাগছিল?'
পূর্ণা অসহায় চোখে তাকায়। সে কী করে বলবে, তার আপাকে সবকিছুতেই ভালো দেখায়। কিন্তু সাদা রঙটা যে অশুভ ইঙ্গিত দেয়!
পূর্ণার মনের অবস্থা পদ্মজা যেন উপলব্ধি করতে পারে। সে পূর্ণাকে বিছানায় বসিয়ে বললো,' আজ আমার বোনকে খুব বেশি সুন্দর লাগছে।'
পূর্ণা লজ্জা পেল। পদ্মজা বললো,' কী খাবি?'
পূর্ণা আয়েশ করে বসে বললো,'
'খাব না। খেয়ে আসছি।'
'ভাপা পিঠা খাবি? লুতু বুবু বানিয়েছে।'

'না আপা কিছুই খাবো না। আপা?'
পূর্ণা চাপাস্বরে 'আপা' ডাকলো। পদ্মজা উৎসুক হয়ে তাকালো। পূর্ণা বললো,' বাড়ির মানুষদের কী অবস্থা?'
'জানি না। খাওয়ার সময় শুধু দেখা হয়। তারাও কিছু বলে না আমিও না।'
পূর্ণা প্রবল উৎসাহ নিয়ে জানতে চাইলো,'ওদের নিয়ে কী পরিকল্পনা করেছো?'
পদ্মজা তার পরিকল্পনা চেপে গেল,'এখনো ভাবিনি। তুই তোর বিয়েতে মন দে। নামায-রোজা কিন্তু কখনো ছাড়বি না। ভদ্রভাবে থাকবি। মাথা ঢেকে রাখবি সবসময়। আর অন্যায় করবি না আর কখনো সহ্য করবি না। ঠিক আছে?'
পূর্ণা গর্ব করে বললো,'আমি গত দুইদিন এক ওয়াক্ত নামাযও ছাড়িনি। এখনো দুপুরের নামায পড়ে আসছি।'
'এইতো,ভালো মেয়ে। ভালো বউও হবে।'
পূর্ণার চোখভর্তি কাজল। ডাগরডোগর চোখ দুটি কাজলের ছোঁয়াতে ফুটে আছে। সোজা সিঁথি করে লম্বা চুল বেণী করা। কানে সাত রঙের গোল আকৃতির দুল। গায়ের ওড়নায় পাথরের কাজ। হাতে ঝনঝন করছে কাচের চুড়ি। সত্যি খুব সুন্দর লাগছে। পদ্মজা মুগ্ধ হয়। সে পূর্ণার এক হাতের উল্টোপাশে চুমু দিয়ে বললো,' সত্যি আজ খুব বেশি সুন্দর লাগছে! নজর না লাগুক। মাশা-আল্লাহ।'
পূর্ণা মনে মনে ভীষণ খুশি হয়। গড়গড় করে উগড়ে দেয় ভেতরের সব কথা,স্বপ্ন,আশা। তার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে,সে যেন বহু বছর পর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছে। বা একটা রঙিন ফড়িং বোতল থেকে মুক্ত হয়ে আকাশে উড়ছে। পূর্ণাকে এতো খুশি দেখে পদ্মজার মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায়। তার কোমল হৃদয়টা পূর্ণার মনখোলা হাসি দেখে খুশিতে কেঁদে উঠে।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে পূর্ণা অন্দরমহল থেকে বের হয়। পদ্মজা মগাকে ডেকে বললো,পূর্ণাকে এগিয়ে দিয়ে আসতে। পূর্ণা জেদ ধরে,'আমি একা যেতে পারবো আপা। সন্ধ্যা তো হয়নি।'
পূর্ণার জেদকে পদ্মজা পাত্তা দিল না। তাই পূর্ণা মগার সাথে যেতে রাজি হয়। পূর্ণা যাওয়ার আগে শক্ত করে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরলো। পদ্মজা পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো,'সকালেই আসব।'
পূর্ণা পদ্মজার দিকে মুখ তুলে তাকায়। বললো,'তোমার সুখই আমার সুখ আপা। তুমি আমার মা,তুমিই আমার ভালোবাসা।'
পূর্ণা কেন এতো ভালোবাসে? পদ্মজার বুক ভরে যায়। সে পূর্ণার গাল ছুঁয়ে বললো,'আম্মাকে তোর মাঝে খুঁজে পাই আমি। যখন শ্বশুরবাড়ি চলে যাবি আমার মাও চলে যাবে।'
পূর্ণার কান্না পায়। সে আবার পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে। দুই বোনের বুকের ভেতরটা জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। পদ্মজা বেলা দেখে তাড়া দিল,' বাড়ি যা। সন্ধ্যা হয়ে যাবে।'
'আরেকটু জড়িয়ে রাখি।'
পূর্ণার মায়াময় আবদার! পদ্মজা কী বলবে খুঁজে পায় না। পূর্ণাকে বুকের সাথে শুধু চেপে ধরে রাখে। আকাশপানে চেয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করে,তার বোনটা যেন সুখী হয়। মৃদুলের ভালোবাসায় পূর্ণার জীবনটা যেন পূর্ণ হয়ে উঠে।

হাওলাদার বাড়ি থেকে দুই মিনিট দুরত্বে গিয়ে পূর্ণার মনে পড়ে,সে মৃদুলের কথা আমিরকে বলেনি। এমনকি বিয়ের কথাও বলেনি! পদ্মজা আমিরকে কিছু বলবে না পূর্ণা জানে। এখন যদি সেও না বলে,কাল যদি আমির তাদের বাড়িতে না যায়? পূর্ণা হাঁটা থামিয়ে মগাকে বললো,'এখন বাড়ি যাব না। আমাকে আবার ও বাড়িতে যেতে হবে।'

'রাইত হইয়া যাইব।'
'তুমি যাও। আমি আমির ভাইয়ার সাথে দেখা করব।'
মগা কান চুলকাতে চুলকাতে বললো,'পরে আমি তোমারে দিয়া আইতে পারতাম না। বাজারে যামু।'
'তুমি বাজারে যাও। আমাকে ভাইয়া দিয়ে আসবে।'
'আইচ্ছা,তাইলে আমি যাই।'

মগা বাজারের দিকে চলে যায়। পূর্ণা আবার হাওলাদার বাড়িতে আসে। হাওলাদার বাড়ির সুপারি গাছগুলো মৃদু বাতাসে দুলছে। বাতাস শীত বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। পূর্ণা তার ওড়না ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিল। আলগ ঘরের আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সন্ধ্যার আযানের সুর ভেসে আসে কানে। দিনের আলো বিদায় নিচ্ছে,ফিরে আসছে গাঢ় অন্ধকার। আলগ ঘরের সবকটা ঘরে পূর্ণা আমিরকে খুঁজলো। ধান রাখার ঘরে গিয়ে সে একটু ভয় পেয়েছিল বৈকি! সেই ঘরে জানালা নেই। তাই ঘরটি অন্ধকারে ডুবে ছিল। ঘরে প্রবেশ করতেই একটা কালো বিড়াল ঝাঁপিয়ে পড়ে মাটিতে। পূর্ণার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। বুকে থুথু দিয়ে দ্রুত সে ঘর থেকে বের হয় আসে। প্রতিটি ঘরে আমিরকে খোঁজে। কিন্তু কোথাও আমিরকে পেল না। অন্দরমহলে গেল নাকি?
পূর্ণা যখন আলগ ঘর থেকে বের হতে যাবে তখন দেখলো, খলিল হাওলাদারের সাথে বোরকা পরা একটি মেয়ে। তারা দ্রুত হাঁটছে। মেয়েটির হাতে চাপাতি! পূর্ণার মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে যায়। শিরশির করে উঠে বুকের ভেতরটা। খলিল চোরের মতো চারপাশ দেখছে আর হাঁটছে। পূর্ণা নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। খলিল মেয়েটিকে নিয়ে অন্দরমহলে না গিয়ে অন্দরমহলের পিছনে যাচ্ছে।
পূর্ণার মনে প্রশ্ন জাগে,তারা কি পাতালঘরে যাচ্ছে? সাথে মেয়েটি কে? খলিলের মতো খারাপ লোকের সাথে একটা মেয়ে জঙ্গলের দিকে কেন যাবে? মেয়েটির হাতে চাপাতি-ই বা কেন? পূর্ণার মাথায় প্রশ্নগুলো আসতেই সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। শিরদাঁড়া উঁচিয়ে আলগ ঘর থেকে বের হলো। একবার ভাবলো,পদ্মজাকে গিয়ে বলবে। কিন্তু তারপর ভাবলো, ততক্ষণে যদি মেয়েটি হারিয়ে যায়। মেয়েটির সম্পর্কে বোধহয় পদ্মজা জানে না। তাই তাকে বলেনি! মেয়েটি যদি পদ্মজার কোনো ক্ষতি করে বসে! কিছু করার আগে জানতে হবে মেয়েটি কে? এই বাড়ির সাথে তার কী সম্পর্ক! পূর্ণা বুকে থুথু দিয়ে খলিলের পিছু নিল। সে ঠোঁট টিপে সাবধানে এগিয়ে যায়। উত্তেজনায় তার হাত-পা কাঁপছে। কান দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। বার বার ঢোক গিলছে। ততক্ষণে আকাশ তার ঝাঁপি থেকে অন্ধকার নামিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো পৃথিবী গভীর অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। পূর্ণা যত এগুচ্ছে তত কাঁপুনি বাড়ছে। নিঃশ্বাস নিচ্ছে ঘনঘন। একবার ভাবলো,চলে যাবে। কিন্তু কৌতূহল তাকে জাপটে ধরে রেখেছে। তাই পিছু হটতে পারলো না। চারপাশ নির্জন,ছমছমে! খলিল মেয়েটিকে নিয়ে অন্দরমহলের পিছনে চলে যেতেই পূর্ণা দৌড়ে শেষ মাথায় আসে। অন্দরমহলের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সাবধানে জঙ্গলের দিকে উঁকি দেয়। খলিল বোরকা পরাহিত মেয়েটিকে নিয়ে জঙ্গলের মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি চারপাশে চোখ বুলিয়ে পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা চাবি বের করে মেয়েটির হাতে দিলেন। তারপর চাপাস্বরে কিছু বললেন। মেয়েটিও যেন কিছু বললো! পূর্ণা রাতের জঙ্গল ভয় পায়। একটু পর গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে যাবে চারপাশ। তার ভীতু মন কিছুতেই খলিলের পিছু পিছু জঙ্গলের ভেতর যেতে সায় দিবে না! তাই পূর্ণার বোকা মস্তিষ্ক বুদ্ধি করলো,সে দূর থেকে খলিলের উপর পাথর ছুঁড়ে মারবে। পাথর কে মেরেছে সেটা দেখার জন্য খলিলের সাথে মেয়েটিও তাকাবে। আর তখনই পূর্ণা

মেয়েটির মুখ দেখে নিবে আর দৌড়ে পালাবে। যে ভাবনা সে কাজ! পূর্ণা চারপাশে চোখ বুলিয়ে ছোট একটা পাথর কুড়িয়ে নিল। তারপর খলিলের উপর ছুঁড়ে মারলো। পাথরটি সোজা খলিলের ঘাড়ের উপর পড়লো। খলিল চমকে তাকালেও মেয়েটি তাকায়নি। মেয়েটি স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তার চুপচাপ থাকাটা বলে দেয়,সে সাবধানী মানুষ! শত্রুর উদ্দেশ্য বুঝার ক্ষমতা আছে! পূর্ণার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। খলিল পূর্ণার দিকে তেড়ে আসার আগে পূর্ণা ছুটে পালাতে উল্টোদিকে দৌড় দেয়। কিন্তু শেষ রক্ষে হলো না। আচমকা সেখানে রিদওয়ান উপস্থিত হয়। জাপটে ধরে পূর্ণাকে।

পূর্ণা চিৎকার দেয়ার পূর্বে রিদওয়ান মুখ চেপে ধরলো। মেয়েটি রিদওয়ানকে দেখে জঙ্গলের ভেতরে চলে যায়। খলিল রিদওয়ানের দিকে এগিয়ে আসেন।
পূর্ণা ছটফট করছে ছোটার জন্য। কিন্তু রিদওয়ানের বিশাল দেহের সাথে সে পারছে না। রিদওয়ান খলিলের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললো,' ওরে নিয়ে বাড়ির সামনে দিয়ে আসতে না করছিলাম না? বাড়িতে মানুষ নাই বলে এমন অসাবধান হবেন?'
খলিল কৈফিয়তের স্বরে বললেন,' না পাইরা আইছি।'
রিদওয়ান আগুন চোখে জঙ্গলের দিকে তাকালো। তারপর নিজের গলার মাফলার দিয়ে পূর্ণার মুখ বেঁধে দিল। আর খলিলের গলার মাফলার দিয়ে পা বাঁধলো। পূর্ণার দুই হাত পিছনে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরলো। তারপর জোর করে পূর্ণাকে জঙ্গলের ভেতর নিয়ে যায়।

ভয়ে পূর্ণার বুক কাঁপছে। শরীর অবশ হয়ে আসছে। প্রাণপণে চেষ্টা করছে ছোটার জন্য।
রিদওয়ান টেনে হিঁচড়ে পূর্ণাকে পাতালঘরের সামনে নিয়ে আসে। পূর্ণা চোখ ঘুরিয়ে দানবের মতো দাঁড়িয়ে থাকা বড় বড় গাছ দেখে শিউরে উঠে। মুখ দিয়ে "উউউউ" ধরণের শব্দ করতে থাকে।
তখন একটা গর্ত থেকে মেয়েলি স্বর ভেসে আসে,' চাবি কাজ করতাছে না।'
কণ্ঠ স্বরটি পূর্ণার খুব বেশি পরিচিত মনে হয়! পূর্ণা উৎসুক হয়ে সেখানে তাকালো। খলিলের হাতের টর্চের আলোয় পাতালে যাওয়ার সিঁড়ি চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়। সেই দৃশ্য দেখে পূর্ণার পা থেকে মাথার তালু অবধি কেঁপে উঠে। সে পদ্মজার কাছে পাতালঘরের বর্ণনা শুনেছে কিন্তু এখন সরাসরি দেখছে! অনুভূতি ব্যাখ্যা করার মতো না! তার বুকের ভেতরে দামামা বেজে চলেছে!
রিদওয়ান পূর্ণাকে টেনেহিঁচড়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামিয়ে আনে। পাতালঘরে প্রধান দরজায় সামনে এসে দাঁড়ায়।

মেয়েটির হাত থেকে চাবি নিয়ে খলিল দরজা খোলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনিও পারলেন না। টর্চের আলো মেয়েটির পায়ের কাছে পড়ে আছে। পূর্ণা চোখ ছোট করে তাকিয়ে আছে মেয়েটির মুখ দেখার জন্য। মেয়েটির মুখ অন্ধকারে তলিয়ে আছে। খলিল হাত নাড়াচাড়া করাতে টর্চের আলো অস্থির হয়ে এদিকসেদিক ছুটছে। একসময় আলো মেয়েটির মুখের উপর পড়লো আবার তাৎক্ষণিক সরেও গেল। চোখের পলকের গতিতে আলো সরে গেলেও পূর্ণা দেখে ফেললো মেয়েটির মুখ!
পূর্ণার মনে হলো,আশেপাশে কোনো বজ্রপাত পড়লো মাত্র! তার চোখ দুটি বড় বড় হয়ে যায়। সে জোরে জোরে লাফাতে থাকলো। রিদওয়ান পূর্ণাকে ঠেসে ধরে। পূর্ণা গোঙাতে শুরু করে। সে মেয়েটির উদ্দেশ্যে কিছু বলছে। কিন্তু মুখ বেঁধে রাখার জন্য কথাগুলো গোঙানোর মতো মনে হচ্ছে। রিদওয়ান পূর্ণাকে বিশ্রী কয়েকটা গালি দিয়ে খলিলকে রাগী স্বরে বললো,'এখনো খোলা হয়নি?'
খলিল হাওলাদার বললেন,'চাবিডা কাম করে না।'

'আপনি এই মা** হাত ধরেন। আমি দেখতাছি।'
খলিল পূর্ণার হাত ধরলেন। রিদওয়ান চাবি দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করে। পূর্ণা মেয়েটির দিকে আগুন চোখে তাকিয়ে আছে। খলিল মেয়েটির উদ্দেশ্যে বললেন,' তোর ওড়না দে। এই ছেড়ির হাত বান্ধা লাগবো।'
মেয়েটি তার মাথার ওড়না খুলে পূর্ণার হাত বাঁধার জন্য আসতেই খলিল পূর্ণার হাত ছেড়ে দিলেন। পূর্ণা সাথে সাথে তার দুই হাতে খামচে ধরলো মেয়েটির দুই গাল। একটা গালিও দিল। কিন্তু সেই গালি স্পষ্ট উচ্চারণ হলো না। খলিক পূর্ণাকে জোরে লাথি দিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেললেন। শুকনো পাটকাঠির মতো পূর্ণা এক লাথিতে মিইয়ে গেল। শরীরের শক্তি কমে গেল। তারপর খলিল আর মেয়েটি মিলে পূর্ণার হাত শক্ত করে বাঁধলো। পূর্ণার কোমর ব্যথায় টনটন করে উঠে। গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

রিদওয়ান চেষ্টা করেও চাবি কাজে লাগাতে পারলো না। তীব্র রাগ নিয়ে সে বললো,' দরজার চাবি এটা না।'
'আমির তো এইডাই দিল।' বললেন খলিল।
রিদওয়ানের মাথা গরম হয়ে যায়। সে ছুঁড়ে ফেলে চাবি। পা দিয়ে মেঝেতে লাথি দেয় কয়েকবার। তারপর দুই হাত তুলে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলো। কয়েকবার শ্বাস নিল। তারপর পূর্ণার সামনে বসে খলিলের উদ্দেশ্যে বললো,' এই মেয়ের কোনো ব্যবস্থা করতে হবে আব্বা।'
খলিল বললেন,'কী করবি?'
রিদওয়ান কিছু একটা চিন্তা করলো। তারপর পূর্ণার মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে পূর্ণাকে প্রশ্ন করলো,'আব্বার পিছু নিয়েছিলে কেন? কতটুকু জানো তুমি?'
পূর্ণা সর্বপ্রথমে মেয়েটির উদ্দেশ্যে থুথু ফেললো। তারপর রাগে কিড়মিড় করে রিদওয়ানকে বললো,' জারজের বাচ্চা থুথু দেই তোর মুখে আর তোর বাপের মুখে।'
রিদওয়ান হাসলো। দ্রুতগতিতে মেঝেতে পা ভাঁজ করে বসলো। তারপর পূর্ণার মুখর উপর ঝুঁকে তুই-তুকারি করে বললো,' আমিরের মুখেও দিবি?'
পূর্ণা চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। রিদওয়ান হাসি হাসি মুখ রেখে খলিলের দিকে তাকালো। বললো,'কুমারী মেয়ের থুথুও মজা কী বলেন আব্বা?'
খলিলের উত্তরের আশায় না থেকে রিদওয়ান পূর্ণার মুখের একদম কাছে এসে জোরে নিঃশ্বাস ফেললো। রিদওয়ান উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে পূর্ণা শরীর ঘৃণার রি রি করে উঠলো। রিদওয়ান এক হাতে ঠেসে ধরে পূর্ণার মুখ। তারপর পূর্ণার ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে পূর্ণার গায়ের গন্ধ শুঁকে। তাকে উন্মাদের মতো দেখাচ্ছে। পূর্ণার জান বেরিয়ে যাওয়ার যোগাড়! রিদওয়ানের ভারী দেহের ভরে তার শরীরের হাড্ডি বিষিয়ে উঠছে। একটুও নড়তে পারছে না। চোখ ফেটে জল পড়ছে। রিদওয়ান পূর্ণার জামার পিঠের চেইন খুলে পূর্ণার ঘাড়ে চুমু দিল। সাথে সাথে ঘৃণায় পূর্ণা চোখ বন্ধ করে ফেললো। তখন চোখের সামনে ছবির মতোন ধরা দেয় মৃদুলের মুখটা। কোথায় সে? সে কি এসেছে? সে কি অনুভব করছে,তার প্রিয়তমা এক হায়েনার শিকার হয়েছে? পূর্ণার মনটা হুহু করে কেঁদে উঠে। ভেতরে ভেতরে সে আর্তনাদ করে ডাকলো, তার দ্বিতীয় মাকে! যাকে সে আপা বলে ডাকে!

রিদওয়ান পূর্ণার মুখ ছেড়ে চট করে উঠে দাঁড়ালো। গায়ের কাপড় খুলতে খুলতে খলিলকে বললো,' দেখবেন? নাকি যাবেন?'
'কোনো ভেজাল হইবো না তো?' খলিলের গলার স্বর পাংশুটে।

'কীসের ভেজাল?'
'আমির যদি জানে।'
'কী বলবে ও? বউয়ের প্রতি মায়া দেখায় না হয় বুঝলাম। শালিরে দিয়ে কী দরকার ওর? আর যা নিয়ম তাই হচ্ছে আব্বা। পূর্ণা যখন সব জেনে গেছে ওর বাঁচার অধিকার নাই।' রিদওয়ান উত্তেজিত। সে কথা শেষ করে পূর্ণার দিকে ঝুঁকলো। পূর্ণা জোরে কেঁদে উঠলো। চিৎকার করে মেয়েটির উদ্দেশ্যে বললো,' ভাবি,বাঁচাও। দোহাই লাগে,কিছু করো।'
রিদওয়ান ফিক করে হেসে ফেললো। পূর্ণা আরো ঘাবড়ে যায়। সে আকুতি করে মেয়েটিকে বললো,'ভাবি,এভাবে চুপ থেকো না। আল্লাহ সইবে না।'
রিদওয়ান পূর্ণার দুই গাল টিপে ধরে জিহ্বা দিয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে গাঢ় স্বরে বললো,' তোদের মা* বললে তোদের ঘেন্না হয়। আর আসমানিরে মা* বললে ও খুশি হয়। সাহায্য চাওয়ারও মানুষ পাইলি না।'
খলিল ব্যাপারটা উপভোগ করছেন। তিনি হেসে আসমানিকে বললেন,' যখন ছেড়া আছিলাম রিদুর মতো আছিলাম। যে ছেড়ি একবার আমার হাতে পড়ছে কাইন্দা বাপ ডাকছে। ডরায়া মুইত্তা দিছে।'

খলিল কথা শেষ করে হাসলেন। তার হাসির শব্দ ফ্যাচফ্যাচে! খুবই বিশ্রী। আসমানি মৃদু হেসে আবার চুপসে গেল। পাতালঘরের দরজা না খোলাতে সে চিন্তিত। আবার রিদওয়ান এতোটাই উত্তেজিত যে,দরজার সামনে ফাঁকা জায়গায় তার খেল দেখানো শুরু করেছে! দরজা খোলার নামগন্ধ নেই,চিন্তাও নেই! খলিল এক হাতে আসমানিকে জড়িয়ে ধরে একটু দূরে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালেন।তারপর আমুদে গলায় বললেন,' আমার রাজকন্যের মন খারাপ কেরে?

রিদওয়ান পূর্ণার বুকের উপর থাবা দিতেই পূর্ণা আর্তনাদ করে উঠলো ,'আম্মা...আপা....'
রিদওয়ান পূর্ণার বুকের উপর বসে পূর্ণার মুখ চেপে ধরে কিড়মিড় করে চাপাস্বরে বললো,'চুপ,একদম চুপ!'

পূর্ণা স্পষ্ট টের পাচ্ছে তার পৃথিবী বিকট শব্দ তুলে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ওইতো...ওইতো মৃদুল দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে লাল বেনারসি। পূর্ণা চিৎকার করে মৃদুলকে ডাকলো। কিন্তু মৃদুল আসলো না। সে কেন বাঁচাতে আসছে না? কেন আসছে না? মৃদুল হঠাৎ করেই কাঁদতে থাকলো। কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়লো। তারপর চোখের পলকে সে উধাও হয়ে যায়!
পূর্ণার শরীর কেঁপে উঠে। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। নিজেকে বুঝায়,তার আপা আসবে, আসবেই! পূর্ণার চোখের পর্দায় পদ্মজার আগমন ঘটে।
পদ্মজা আসছে। হ্যাঁ আসছে, হাতে রাম দা নিয়ে দৌড়ে আসছে। তার চোখের দৃষ্টিতে আগুন। শক্তিশালী বাতাস তাকে আটকানোর চেষ্টা করছে। তার চুলগুলোকে উড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না।
সব কিছু ছাড়িয়ে সে ছুটে আসছে। এক কোপে সব জানোয়ারের মাথা শরীর থেকে আলাদা করে দিতে সে আসছে! কিন্তু দেরি করছে আসতে! ভীষণ দেরি করছে! পূর্ণা শব্দ করে নিঃশ্বাস ছেড়ে, চোখ বুজলো। নিষ্ঠুর মাটি নীরব থেকে দেখে পূর্ণার সতীত্ব হরণ! সময়ের ব্যবধানে বেঁহুশ হয়ে যায় পূর্ণা।
বাপ-বেটা মিলে পর পর দুইবার ধর্ষণ করে। পূর্ণার গলা তৃষ্ণায় চৌচির। প্রাণ ভ্রমর যাই যাই! চোখ দুটি নিভু নিভু। রিদওয়ান দূরে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙছে। খলিল ও আসমানি মিলে পূর্ণার গলায়

রশি টেনে ধরে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। হত্যার সময় পূর্ণা হাত-পা দাপিয়ে কাতরায়! আস্তে আস্তে হারিয়ে যায় নিস্তব্ধ প্রগাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে!

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ
(গল্পের প্রয়োজন অনেক নেগেটিভ দৃশ্য,শব্দ ব্যবহার করতে হলো।)

আমি পদ্মজা - ৮৮

_____
মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে যেতেই গাছের পাতাগুলো নড়েচড়ে উঠে। রিদওয়ান চমকে সেদিকে তাকালো। আকাশের অর্ধবৃত্ত চাঁদটি দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলোতে রিদওয়ান আবিষ্কার করলো,সে প্রচণ্ড শীতেও ঘামছে। তার পায়ের কাছে পড়ে আছে পূর্ণার লাশ। অন্ধকার, ছমছমে পরিবেশ। শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। রিদওয়ান প্যান্টের পকেট খুঁজে বিড়ি আর দিয়াশলাই বের করলো।
পূর্ণাকে হত্যার পর যখন ভাবলো অন্য মেয়েগুলোর মতো চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে পূর্ণার লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিবে তখন খলিল উপর থেকে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এসে চাপাস্বরে বললেন,' কে জানি আইতাছে। মনে কয়,আমির। হুন রিদু,এইবার আমির তোর উপরে চ্যাতলে আমি কিছু করতে পারতাম না। ভাইজানেও করব না। ভাইজানে আমারে আগেই কইছে।'

খলিল হাওলাদার অন্দরমহলে যাচ্ছিলেন। পাতাল ছেড়ে একটু সামনে এগোতেই চোখে পড়ে কে যেন টর্চ নিয়ে এদিকে আসছে। তিনি আন্দাজ করেছেন, অজ্ঞাত লোকটি আমির। তারপরই দৌড়ে আসেন। খলিলের মুখে আমির নামটা শুনতেই রিদওয়ান বুকের ভেতর ভয় জেঁকে বসে। রিদওয়ান আমিরকে ভয় পেতে চায় না। তবুও ভয় তাকে ছাড়ে না। ভয় পাওয়ার কিছু কারণও রয়েছে। প্রথমত, পারিজার হত্যার ব্যাপারে আমির সব জানে। রিদওয়ান টের পায় আমিরের মনে এই হত্যা নিয়ে ক্ষোভ রয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, এই পাপের জগতের জন্য পদ্মজার সাথে তার বিচ্ছেদ হয়েছে। সে এখন বিচ্ছেদের আগুনে পুড়ছে। জ্বলন্ত কয়লা হয়ে আছে। এখন যদি শুনে,পূর্ণাকে এভাবে কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হয়েছে
জ্বলন্ত কয়লা নিজ শক্তিকে আগুন তৈরি করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।
রিদওয়ান পূর্ণাকে ধর্ষণের আগে যদিও বলেছিল, আমির শালীর জন্য কিছুই করবে না। কিন্তু রিদওয়ান এখন বুঝতে পারছে, সে তখন উত্তেজিত হয়ে ভুল কথা বলেছে। শালীর জন্য কিছু না করুক, শালীর মৃত্যু আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ নিশ্চয়ই করবে! পূর্ণা পদ্মজার জীবন! আর পদ্মজা আমিরের প্রাণভোমরা! সংযোগ তো আছেই। কিছুতেই ঝুঁকি নেয়া যাবে না। আবার খলিল হাওলাদার বলছেন,এবার আর ছেলের পক্ষ নিবেন না! রিদওয়ান এতো চেষ্টা করেও খলিল-মজিদকে নিজের বশে আনতে পারেনি। সব মিলিয়ে বিপদের আশঙ্কা শতভাগ! রিদওয়ান ভাবলো, আপাতত আমিরকে রাগানো ঠিক হবে না। আমিরকে হত্যা করার ব্যাপারে মজিদ,খলিল দুজনকে রিদওয়ান বাগে আনতে পেরেছে। একটা মৃত লাশের জন্য পরিকল্পনা নষ্ট করা উচিত হবে না। আর দুটো দিন সহ্য করতেই হবে আমিরকে।

রিদওয়ান খলিল ও আসমানিকে নিঃশ্বাসের গতিতে বললো,' তোমরা এখানে থাকো। দড়িটা ওই চিপায় লুকিয়ে রাখো। আমি যে এখানে ছিলাম আমির যেন জানতে না পারে।'
রিদওয়ান পূর্ণার লাশ কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তারপর দ্রুত ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। ঝোপঝাড়ে কেউ থাকলে সেটাও টের পেয়ে যায় আমির। এই ক্ষমতা সে কোথায় পেয়েছে,রিদওয়ানের জানা নেই। তবে আমিরের কাছে শুনেছে,আমির লুকিয়ে থাকা মানুষটির নিঃশ্বাস ও তাকিয়ে থাকাটা অনুভব করতে পারে! তাই রিদওয়ান চোখ বুজে,নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঘাপটি মেরে বসে থাকে।

আমির পাতালে ঢুকলো। খলিল সিঁড়ির দিকে টর্চ ধরলেন। মুখে টর্চের তীব্র আলো পড়তেই আমির কপাল কুঁচকে দুই হাত সামনে বাড়িয়ে আলোর গতিবেগ রোধ করে মুখে অস্ফুট বিরক্তিসূচক শব্দ করল।
খলিল হেসে আমুদে কণ্ঠে বললেন,' বাবু আইছস নাকি!'
আমির চোখ ছোট ছোট করে ধমকের স্বরে বললো,'আরে এভাবে মুখের উপর টর্চ ধরে রাখছেন কেন?'
খলিল টর্চের আলো দ্রুত অন্যদিকে সরিয়ে নিলেন। আমির তার হাতের চাবি খলিলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো,'এইযে চাবি।'
খলিল চাবি হাতে নিয়ে বললেন,' কুন সময় থাইকা খাড়ায়া আছি। চাবি লইয়া আইয়া ভালা করছো আব্বা।'
'আনতে গেলেন না কেন?আমি অন্দরমহলেই ছিলাম।'
'এইতো অহন যাইতে চাইছিলাম।'
আমির টর্চ আসমানির মুখের উপর ধরে বললো,' তোর এই সময় এখানে কী?'
আসমানি তার বোরকা খুলতে খুলতে বললো,' রিদওয়ানে ডাকছে।'
'রিদওয়ান কোথায়?'
'জানি না। আমারে আইতে কইয়া নিজের আওয়ার নাম নাই। না আইলেও সমস্যা নাই। তুমি আইছো চলবো।' আসমানি লম্বা করে হাসলো। খলিল বা আসমানি কারো চোখেমুখে একটু আগের ঘটে যাওয়া ঘটনার বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। আমির আসমানির নোংরা অঙ্গভঙ্গি দেখে হাসলো। আসমানির সামনে সে যতবার আসে ততবার আসমানি বিভিন্নভাবে তাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। গত চার বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে,কিন্তু ফল এখনো পায়নি। আমির আসমানির খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। চাপাস্বরে বললো, 'খোদার কসম,তোর মতো বে** দুটো দেখিনি।'
আমিরের অপমানজনক কথা আসমানি গায়ে লাগা তো দূরের কথা, কানেই ঢোকায়নি। খলিল দরজা খুললেন৷ তিনজন একসাথে ভেতরে প্রবেশ করলো। দরজা লাগানোর সময় আমির তার টর্চের আলোতে মেঝেতে একটা নুপুর দেখতে পেলো। সে ভ্রুকুটি করে এগিয়ে আসে। হাতে নুপুরটি তুলে নেয়। আসমানি পিছন থেকে বললো,' আমার নুপুর।'

এই মুহূর্তে রিদওয়ান ঝোপঝাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবছে, লাশটার কী করা যায়? পাতালে তো এখন ঢোকা যাবে না। সেখানে আমির আছে। অন্দরমহল থেকে রাম দা আর বস্তা নিয়ে আসতে অন্দরমহলে যাওয়া যায়। তারপর জঙ্গলের পিছনের ভাঙা দেয়াল টপকে ঘাটে চলে গেলেই নিশ্চিত। ঘাটে তাদের ট্রলার আছে। একবার ট্রলারে উঠতে পারলে পূর্ণার লাশ আর কেউ পাবে না। রিদওয়ান হাতের বিড়ি ফেলে পূর্ণার লাশ রেখে দ্রুত অন্দরমহলে যায়। পূর্ণার ফ্যাকাসে মুখের উপর একটা জোনাকিপোকা বসে। জোনাকিপোকার জ্বলে জ্বলে আবার নিভে যাওয়া

আলোয় পূর্ণার মুখটা আরো ভীষণ অসহায় দেখাচ্ছে! বুক মোচড় দিয়ে উঠার মতো। পূর্ণার দুই হাত নিস্তেজ হয়ে ঘাসে পড়ে আছে। সারা জনমের জন্য সে ঘুমিয়ে পড়েছে। এই পৃথিবীর বুকে তার একুশ বছরেরই জীবন ছিল। কী হতো যদি আরো কয়টা দিন সে বাঁচতে পারতো?

রিদওয়ান ভীষণ উত্তেজিত। শত-শত খুন করার পর এই প্রথম কোনো মৃত দেহ নিয়ে সে বিপাকে পড়েছে। অন্দরমহলের সামনে এসে দেখে,পদ্মজা দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজার সাথে কথা বলছে প্রান্ত! প্রান্ত কি পূর্ণার খোঁজে এসেছে? রিদওয়ান এক হাতে নিজের ঘাড় ম্যাসাজ করলো। অন্দরমহল থেকে বস্তা বা রাম দা আনা এখন বিপদজনক। পদ্মজা বুদ্ধিমতী, তার রিদওয়ানকে সন্দেহ করার সম্ভাবনা শতভাগ। সন্দেহ না এই মেয়ে নিশ্চিত হয়ে যাবে। লতিফাকে দেখা যাচ্ছে না, তাহলে ওকে দিয়ে সাহায্য নেয়া যেত। এখন কী করবে সে? রিদওয়ানের মাথা ফাঁকা হয়ে যায়। পরক্ষণেই মন বলে উঠলো, সামান্য নারীকে সে কেন ভয় পাবে? তারপর আবার ভাবলো, না এখন আমির বা পদ্মজার মুখোমুখি হওয়া যাবে না,এতে বহু কাঙ্ক্ষিত সাজানো পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। রিদওয়ান উল্টো ঘুরে জঙ্গলে ছুটে আসে। পূর্ণার লাশের পাশে এসে দাঁড়ায়। আরেকটা বিড়ির জন্য পকেটে হাত দেয়। বিড়ি নেই। সে পায়চারি করতে করতে ভাবতে থাকলো। কী করা যায়? হুট করে তার মাথা কাজ করে। ট্রলারে করে পূর্ণার লাশ নিয়ে দূরে চলে যাবে। পথে কোনো না কোনো ব্যবস্থা হবে। ভাবতে দেরি হলেও কাজে দেরি করলো না। সে পূর্ণার লাশ কাঁধে তুলে নিল। জঙ্গল পেরিয়ে ভাঙা ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো। ভাঙা অংশ কম। পূর্ণার লাশ নিয়ে একসাথে বের হওয়া সম্ভব নয়। আগে রিদওয়ানকে বের হতে হবে তারপর পূর্ণার লাশ টেনে বের করতে হবে। রিদওয়ান পূর্ণার লাশ রেখে নিজে আগে বের হওয়ার জন্য উদ্যত হলো। বাইরের দৃশ্য দেখে সঙ্গে - সঙ্গে সে চমকে গেল! বাইরে চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। একজন ইয়াকুব আলী। যিনি গত চার বছর ধরে মজিদ হাওলাদারের মাতব্বর পদের প্রতিদ্বন্দ্বী। সাথে উনার বিএ পাশ ছেলে ইউসুফ আর রয়েছে চামচা দুজন। তারা এই রাতের বেলা গাঢ় অন্ধকারে এখানে কী করছে? একইদিনে এতো বিপদ! রিদওয়ান তার ঠোঁট ভেজাল। নিজেদের গোলকধাঁধায় আটকে রাখা এলাকা যেন এখন নিজেদের জন্যই গোলকধাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে!

কয়দিন আগে ইয়াকুব আলীর এক লোক এখানে এসেছিল। তারপর আমিরের হাতে খুন হলো। আর এখন ইয়াকুব আলী নিজে তার ছেলেকে নিয়ে এসেছেন! কী চাচ্ছে এরা? কিছু কি সন্দেহ করেছে?
যদি নারী পাচার সম্পর্কিত কিছু জেনে থাকে! ভাবতেই রিদওয়ানের হৃৎপিণ্ড ছ্যাঁৎ করে উঠলো। কেউ যেন তার হৃৎপিণ্ডে গরম খুন্তি ছুঁইয়ে দিয়েছে। রিদওয়ান নিজেকে আড়াল করে নেয়। ইয়াকুব আলী চলে যান। রয়ে যায় বাকি তিনজন। তারা চারপাশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখছে। এই খবর দ্রুত মজিদ এবং খলিলকে দিতে হবে। রিদওয়ান দ্রুত সরে আসে। পূর্ণার লাশ দেখে সে থমকে দাঁড়ায়। এক মুহূর্তের জন্য সে পূর্ণার কথা ভুলে গিয়েছিল। আগে এই লাশের ব্যবস্থা করতে হবে। এই মুহূর্তে সে একা হয়ে পড়েছে। মজিদ হাওলাদার বাড়িতে নেই। খলিল হাওলাদার আমিরের সাথে পাতালে রয়েছেন। দলের কেউও আপাতত কাছে নেই! সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ি অবস্থা! রিদওয়ান পূর্ণার লাশ আবার কাঁধে তুলে নিল। একটা মৃত,নিস্তেজ দেহ নিয়ে টানাহেঁচড়া করে দম বেরিয়ে যাচ্ছে। মাথার রগ দপদপ করছে। এতদিনের অভিজ্ঞতা আজ রিদওয়ানের কোনো কাজেই লাগছে না। কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। আচ্ছা,আমির তার জায়গায় থাকলে কী

করতো? কিছুতো করতোই৷ রিদওয়ান নিজের উপর বিতৃষ্ণা নিয়ে বললো,'আব্বা,কাকা ঠিকই বলে। আমিরের মাথার এক ফোঁটা বুদ্ধি আমার মাথায় নাই।'

অনেক ভাবাভাবির পর রিদওয়ান পূর্ণার লাশ একটি গাছের পাশে রাখলো। তারপর শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ালো৷ বার কয়েক নিঃশ্বাস নিল এবং ছাড়লো। এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে অন্দরমহলে গেল। সদর ঘরে পদ্মজা বসে আছে। পদ্মজার চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। রিদওয়ান অবাক হওয়ার ভান ধরে প্রশ্ন করলো,' এই রাতের বেলা সবাই এমন তব্ধা লেগে বসে আছে কেন?'
পদ্মজা রিদওয়ানের দিকে ঘুরেও তাকালো না। প্রান্ত বললো,'মেজো আপাকে খুঁজে পাচ্ছি ন।'
রিদওয়ান এক গ্লাস পানি খেয়ে হেসে বললো,' এই মেয়ে বাঁদরের মতো। দেখো,কার বাড়িতে আছে।'
'আপার আজ কোথাও যাওয়ার কথা না।'
'যেতেও পারে।'
কথা শেষ করে রিদওয়ান নিজ ঘরে চলে গেল। ঘরে এসেই সে অস্থির হয়ে উঠে। দ্রুত তোষকের নিচ থেকে বড় একটা বস্তা নিয়ে, ছোট করে ভাঁজ করে। তারপর ভাঁজকরা বস্তা শার্টের ভেতর বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। রাম দা নিতে চেয়েছিল। কিন্তু রাম দা লুকানোর মতো জায়গা তার শরীরে নেই! সে চারপাশে চোখ বুলিয়ে সাবধানে আবার জঙ্গলে আসে। পূর্ণার লাশ বস্তার ভেতর ভরে কাঁধে তুলে নেয়। অন্দরমহলের চারপাশ সুপারি গাছে আচ্ছাদিত। সুপারি গাছ আর রাতের অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে রিদওয়ান গেইটের কাছে খুব সহজেই চলে আসে।

গেইটের দারোয়ান মুত্তালিব ঝিমুচ্ছেন। মুত্তালিব মজিদের বিশ্বস্ত দারোয়ান। সে এই বাড়ি সম্পর্কিত সবকিছু জানে। কিন্তু কখনো খুন হতে দেখেনি বা খুন হওয়া লাশও দেখেনি। এমন দায়িত্ব সে কখনো পায়নি। এই বাড়ির গোপনীয়তা গোপন রাখাই তার কাজ। রিদওয়ান বাধ্য হয়ে মুত্তালিবকে নতুন দায়িত্ব দেয়ার জন্য ডাকলো,' মুত্তালিব কাকা?'
মুত্তালিব পিটপিট করে তাকালেন। রিদওয়ানের মুখটা স্পষ্ট চোখের সামনে ভাসতেই তিনি চট করে উঠে দাঁড়ালেন। রিদওয়ান ইশারায় শান্ত হতে বললো। মুত্তালিব উৎসুক হয়ে তাকালেন। রিদওয়ান তার কাঁধের বস্তা মুত্তালিবের পায়ের কাছে রাখে। মুত্তালিব প্রশ্ন করলেন,'বস্তার ভিতরে কিতা?'
রিদওয়ান শান্তস্বরে জানালো,' লাশ।'
রিদওয়ান শান্তস্বরে বললেও মুত্তালিবের জন্য এই শব্দটি ভয়ানক ছিল। তিনি চমকে উঠলেন। রিদওয়ান চারপাশ দেখে বললো,' আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। বিনিময়ে বেতনের চেয়ে তিনগুন পাবেন।'
মুত্তালিবের বেতন সাধারণ বেতনের চেয়ে এমনিতেই তিনগুণ। তার উপর আরো তিনগুণ মানে রাজপ্রাসাদ জেতার মতো! লোভনীয় প্রস্তাব! মুত্তালিবের চোখ দুটি চকচক করে উঠে। অর্থের লোভে মনের ভয় চাপা পড়ে। তিনি অভিজ্ঞ স্বরে সাহস নিয়ে বললেন,' তুমি খালি কও,বাকি কাম আমার।'
রিদওয়ান আরেকটু এগিয়ে আসে ফিসফিসিয়ে বললো,' ভ্যানগাড়িটা নিয়ে আসেন। ছন নিবেন বেশি৷ তারপর এই বস্তাটা আজমপুরের হাওড়ে ফেলে আসবেন।'
মুত্তালিব মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। ভয়টা আবার জেগে উঠে। কিন্তু অর্থের জন্য তিনি জোর করে ভয়কে চাপা দেয়ার চেষ্টা করলেন।এতগুলো টাকা জলে ভাসিয়ে দেয়া যায় না! তার

চেয়ে একটা দেহ জলে ভাসিয়ে দেয়াই উত্তম! তিনি ভ্যানগাড়ি নিয়ে আসেন। ভ্যানগাড়িটি হাওলাদার বাড়ির। সাথে অনেক ছনও নিলেন। দুজনের তাড়াহুড়ো করে ছনের ভেতর বস্তা রাখলো। রিদওয়ান বললো,'সাবধানে কাজ করবেন। এমন জায়গায় ফেলবেন যাতে কেউ লাশ খুঁজে না পায়।'
মুত্তালিব চারপাশ দেখে ঢোক গিললেন। তার চোরাচাহনি! তিনি আতঙ্কিত। কিন্তু তা রিদওয়ানের সামনে প্রকাশ করতে নারাজ। তিনি রিদওয়ানকে আশ্বস্ত করলেন,'কোনো ভুল হইবো না। কাম সাইরাই আমি আইতাছি।'
'সকালেই আপনি আপনার টাকা পেয়ে যাবেন। ' বললো রিদওয়ান।
মুত্তালিব হাসি বিনিময় করলেন। তারপর মাফলার দিয়ে মুখ ঢেকে অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়েন।

মুত্তালিবের পা বার বার ফসকে যাচ্ছে। তিনি ভয় পাচ্ছেন। যদি কেউ টের পেয়ে যায় তখন কী হবে? তিনি ঘামছেন,হাতও কাঁপছে। পথে এক দুজন লোকের সাক্ষাৎ পেয়ে তিনি নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি জানেন না,কার লাশ নিয়ে তিনি পথ পাড়ি দিচ্ছেন। বার বার মনে হচ্ছে, বস্তার ভেতর থেকে লাশটি বেরিয়ে এসে তার গলা চেপে ধরবে। রক্ত চুষে খাবে। চিরচেনা পথঘাটকে তার পরিত্যাক্ত মনে হচ্ছে। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দে নিজেই উৎকর্ণ হয়ে উঠছেন বার বার। আটপাড়া ছেড়ে নোয়াপাড়ায় আসেন। রাস্তার দুই ধারে গাছ-গাছালি। তারপর যতদূর চোখ যায় বিস্তীর্ণ ক্ষেত। তিনি হাঁপিয়ে উঠেছেন। ভয়ে বুকে চাপ অনুভব করছেন। আজমপুর যেতে পথে থানা পড়ে। থানার সামনে দিয়ে তিনি কী করে যাবেন? যদি কেউ বুঝে যায়! এই চিন্তায় রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার উপক্রম। ভয়ে রক্ত হিম হয়ে গেছে। তিনি ক্লান্ত হয়ে গাড়ি থামালেন। মিনিট ছয়েক পথের ধারে বসে বিড়ি ফুঁকলেন। ভয় কিছুতেই কাটছে না। বুকের ভেতর একটা যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। টাকার লোভে এতোবড় ঝুঁকি নেয়া ঠিক হয়নি। তিনি ভাবলেন, ও বাড়িতে তো এই কাজ করার অনেক মানুষ আছে। তাকেই কেন এই কাজ দেয়া হলো? এই লাশের সাথে কি কোনো বড় বিপদ জড়িত? মুত্তালিবের লাশের মুখ দেখার কৌতূহল জাগলো। তিনি চারদিক দেখে বস্তার মুখ খুললেন। বেরিয়ে আসে চেনা শ্যামবর্ণের মুখখানা। গলায় গাঢ় দাগ! চোখেমুখে আঁচড়। মুত্তালিব ভয়ে কান্না করে দিলেন। এই মেয়েটাকে তিনি সন্ধ্যাবেলায় দেখেছেন জলজ্যান্ত! এখন মৃত! তিনি বুকে হাত দিয়ে বসে পড়েন। বাতাস ও পাতার ঘর্ষণে সৃষ্ট শব্দে তিনি চমকে উঠেন। প্রস্রাবের বেগ বেড়ে যায়। চোখের পলকে লুঙ্গি ভিজে যায়। তিনি নিজের কাজে নিজে লজ্জিত হোন। লজ্জা,ভয় সব মিলিয়ে মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে গেছে। আজমপুর যেতে আরো দুই ঘন্টা লাগবে। এতক্ষণ তিনি এই লাশ নিয়ে কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারবেন না। মুত্তালিব দ্রুত বস্তার মুখ বেঁধে ফেলেন। আরেকটু এগিয়ে নোয়াপাড়ার শেষ মাথায় পৌঁছালেন। সেখানে ক্ষেতের পাশে ঘন ঝোঁপঝাড় রয়েছে। এখানে সহজে কারোর আসার কথা নয়। ঝোঁপঝাড়ের ভেতর ছন বিছিয়ে সেখানে বস্তাটি রাখলেন। তারপর বস্তার উপর আরো ছন দিয়ে দ্রুত জায়গা ছাড়লেন।

_____
সকাল নয়টা বাজে। পূর্ণার হদিস মিলেনি। পূর্ণা লাপাত্তা,এই খবর পুরো গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রেমা ঘরে বসে কান্নাকাটি করছে। মৃদুলও আসেনি। বাসন্তী ও প্রান্ত এদিকওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। তাদের সাথে আরো কয়েকজন রয়েছে। সবাই মিলে পূর্ণাকে খুঁজছে। পদ্মজার নানাবাড়ির মানুষজন বলতে, পদ্মজার নানু আর প্রতিবন্ধী হিমেল বেঁচে আছে। তারা দুজনই অনেকদিন ধরে পদ্মজার খালার বাড়ি ঢাকাতে আছে। গ্রামে কাছের আত্মীয় বলতে আর কেউ নেই। হাওলাদার বাড়িতে তো পূর্ণা নেই। পদ্মজা মগার কাছে যখন শুনলো,পূর্ণা আমিরের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। তাৎক্ষণিক পদ্মজা আমিরকে খোঁজে। সে পাতালঘরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু চাবি

না থাকার কারণে যেতে পারেনি। চিন্তায় তার মাথা ব্যথা উঠে গেছে। মজিদ গ্রামের বাইরে ছিলেন। তিনি ভোররাতে ফিরেন। রিদওয়ান ঘরে বেঘোরে ঘুমিয়েছে। দুজনের মধ্যে কারো বিরুদ্ধে শক্ত প্রমাণ নেই। তবে পদ্মজা সন্দেহের তালিকায় দুজনকেই রেখেছে৷ বাকি রইলো খলিল আর আমির হাওলাদার। তারা দুজন রাত থেকে চোখের বাইরে আছে। দুজনের সাথে মুখোমুখি হতে হবে। পদ্মজার ধারণা,পূর্ণা বন্দী হয়েছে। তাকে ভয় দেখানোর জন্য এরা পূর্ণাকে বন্দি করেছে। পদ্মজা সরাসরি মজিদ এবং রিদওয়ানকে সকালে প্রশ্ন করেছে। দুজনই উত্তর দিয়েছে,তারা জানে না। আমিরের সাথে সাক্ষাৎ হলেই,নিশ্চিত হওয়া যাবে।
বেলা সাড়ে নয়টায় আমিরের দেখা মিলে। তার পরনে ঢিলা সাদা রঙের পায়জামা আর ফতুয়া। অনেক পুরনো কাপড়! হাঁটার তালে ফতুয়া দুলছে। সে সোজা আলগঘরে আসে। মগার হাতে একটা নীল খাম আরেকটা ছোট কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বললো,' এই কাগজে আলমগীর ভাইয়ার ঠিকানা আছে। ঠিকানায় এই খাম পৌঁছে দিবি।'
মগা বাধ্যর মতো মাথা নাড়ালো। যে ঠিকানা লেখা আছে সে ঠিকানায় পৌঁছাতে মগার ষোল ঘন্টা লাগবে। আমির চারপাশ দেখে বললো,'মরে গেলেও এই খাম অন্য কারো হাতে দিবি না। দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ করে রওনা হবি।'
'আইচ্ছা।'
আমির ঘুরে দাঁড়ায় চলে যেতে। মগা ডাকলো,' ভাই?'
আমির তাকালো। মগা বললো,'পূর্ণায় রাইতে তোমার লগে দেখা করতে আইছিল না?'
আমির চোখ ছোট ছোট করে ফেললো। বললো,' না তো। কেন?'
মগা উসখুস করে বললো,'পূর্ণারে খুঁইজা পাইতাছে না কাইল থাইকা।'
আমির সোজা হয়ে দাঁড়ায়। সে মগাকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তখন সেখানে উপস্থিত হয় পদ্মজা। পদ্মজা আমিরের উদ্দেশ্যে বললো,' আমাকে নিজের দাসী বানাতে আমার বোনকে পথ করেছেন আপনি? পূর্ণা কোথায়?'
পদ্মজার কণ্ঠে তেজের আঁচ পাওয়া যায়। সে রাগান্বিত। আমির আশ্চর্য হয়ে গেল। সে পাল্টা প্রশ্ন করলো,' আমি কী করে জানবো? পূর্ণা তোমার কাছে গিয়েছিল না?'
মগা বললো,' ভাই,পূর্ণারে নিয়া বাড়িত যাইতাছিলাম। তখন পূর্ণায় পথে থাইমা কইলো তোমার লগে দেখা করবো। পরে নাকি তুমি হেরে বাড়িত দিয়া আইবা।'
আমির একবার পদ্মজাকে দেখলো তারপর মগার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো,' তারপর এই বাড়িতে আসছিল?'
'আইছিল মনে কয়।'
'তুই কোথায় ছিলি?'
মগা মাথা নত করে বললো,' বাজারে।'
আমির চিন্তায় পড়ে যায়। সে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে বললো,' আমার সাথে তো পূর্ণার দেখা হয়নি। মগা,তুই পূর্ণাকে নিজ চোখে দেখেছিস এই বাড়িতে ঢুকতে?'
মগা না সূচক মাথা নাড়াল। আমির দ্রুত গেইটের দারোয়ান মুত্তালিবের কাছে যায়। মুত্তালিব পদ্মজাকে দেখে ভয় পেয়ে যায়। কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়ায়। আমির মুত্তালিবকে প্রশ্ন করলো,' পূর্ণা গতকাল বেরিয়ে যাওয়ার পর আবার বাড়িতে আসছিল?'
মুত্তালিব কোনো রকম দ্বিধা ছাড়া মিথ্যা বললেন,' না আহে নাই তো।'
পদ্মজা থমকায়। এতক্ষণ ভেবেছিল,পূর্ণা বোধহয় আমিরের হাতে বন্দি আছে। কিন্তু পূর্ণা নাকি আসেইনি! আমির বাইরে বেরিয়ে যায়। পদ্মজা মিনিটের পর মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। পূর্ণার পরিয়ে দেয়া কালো শাড়িটা এখনো তার গায়ে জড়িয়ে আছে। লতিফা ও রিনু পদ্মজার পিছনে

এসে দাঁড়ায়। তখন গেইটের ভেতর এসে প্রবেশ করে বিপর্যস্ত প্রান্ত। সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে পদ্মজার জন্য মৃত্যুর সংবাদ।

হেমলতার হাতে বানানো শীতল পাটির উপর শুয়ে আছে পূর্ণা। পা থেকে গলা অবধি চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা। পদ্মজা মোড়ল বাড়িতে পা রাখতেই সবাই তার দিকে তাকালো। মানুষের ভীড় জমেছে। নোয়াপাড়ার গরীব ঘরের এক ছোট মেয়ে প্রতিদিন ভোরে রান্নার জন্য শুকনো পাতা কুড়ায়। বস্তা ভরে শুকনো পাতা নিয়ে বাড়ি ফেরে। সঙ্গে থাকে তার ছোট ভাই। দুজন মিলে নিত্যদিনের মতো আজও পাতা কুড়াতে বের হয়েছিল। ঝোপঝাড়ে ছনের স্তূপ দেখে তারা খুব অবাক হয়। রান্নার কাজে ছন খুব ভালো কাজ করে। তারা ছন সংগ্রহ করতে গিয়ে একটা ভারী বস্তা আবিষ্কার করে। বস্তার মুখ খুলে দুজনই ভয় পেয়ে যায়। দৌড়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনা গ্রামে ছড়িয়ে দেয়। গ্রামের কয়েকজন পূর্ণাকে চিহ্নিত করে। তারপর নিয়ে আসে আটপাড়ায়। পূর্ণার লাশ মোড়ল বাড়িতে নিয়ে আসতে আসতে পুরো গ্রাম পূর্ণার মৃত্যুর খবর জেনে যায়।
মোড়ল বাড়িতে কত রকম মানুষ উপস্থিত হয়েছে। তাও পদ্মজার কাছে চারপাশ জনমানবহীন লাগছে। তার চোখ শুষ্ক। প্রেমা বুক ফাটিয়ে কাঁদছে। কাঁদছে বাসন্তী ও প্রান্ত। তারা পারলে জোর করে পূর্ণাকে জাগিয়ে তুলে। পদ্মজা ধীরপায়ে পূর্ণার মাথার কাছে এসে বসলো। পূর্ণার আঁচড় কাটা মুখটা জুড়ে গুচ্ছ,গুচ্ছ মায়া। পদ্মজা এক হাতে ছুঁয়ে দেয় পূর্ণার মুখ। তারপর মৃদুস্বরে ডাকলো,' পূর্ণা? পূর্ণারে....
পূর্ণা সাড়া দেয় না। সে এখন মৃত একটি লাশ মাত্র। যে কিছুক্ষণের মধ্যে মাটির নিচে চিরজীবনের জন্য চলে যাবে। পদ্মজা চোখ ঘুরিয়ে চারপাশ দেখলো। তাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে। পদ্মজা চারিদিকে তাকিয়েও কোনো মানুষ দেখতে পেল না! অথচ তার চারপাশে মানুষজনের মেলা বসেছে! পদ্মজা পূর্ণার এক হাত মুঠোর নিয়ে চুমু দিল। পূর্ণার আঙুলে চুল প্যাঁচানো। পদ্মজা সময় নিয়ে চুল থেকে পূর্ণার আঙুল মুক্ত করলো। অনেক লম্বা একটা চুল! মেয়ে মানুষের চুল। পূর্ণা মৃত্যুর পূর্বে কোনো মেয়ের চুল টেনে ধরেছিল তা স্পষ্ট! পদ্মজা পূর্ণার কপালে চুমু দিল। তারপর আবার আদুরে স্বরে ডাকলো,' পূর্ণা?বোন আমার। তোর আপা ডাকছে...তোর পদ্মজা আপা।'
পূর্ণা আর সাড়া দিবে না...কোনোদিন দিবে না! তার দুরন্তপনা জীবনের জন্য থেমে গেছে। পদ্মজা বিশ্বাস করতে পারছে না! সে অস্থির হয়ে উঠে। একটু দূরে সরে বসে। তার নিঃশ্বাস এলোমেলো এবং ভারী। বুকের ভেতর তোলপাড় বয়ে যাচ্ছে। তার মস্তিষ্কের স্নায়ু নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। সে হামাগুড়ি দিয়ে আরেকটু দূরে সরে যায়। মাথায় হাত দিয়ে বসে। তারপর আরেকটু দূরে সরে যায়! এভাবে যেতে যেতে অনেক দূরে চলে যায়। মানুষ তাকে হা করে দেখছে। কিছুক্ষণ দূরে বসে থেকে চট করে উঠে দাঁড়ায়। দ্রুতপায়ে পূর্ণার কাছে আসে। পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে চারপাশ দেখলো। কী অদ্ভুত! সে এখনো কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু বাসন্তী, প্রেমা ও প্রান্তকে দেখছে। আর দেখছে ঘুমন্ত পূর্ণাকে। পদ্মজা পূর্ণার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো,' আমার সুন্দর চাঁদ,আজ তোর বিয়ে। মৃদুল...মৃদুল ভাই কোথায়? সে কি আসেনি?'

পদ্মজা চারপাশে চোখ বুলিয়ে মৃদুলকে খুঁজলো। যখন সে মৃদুলকে খুঁজতে লাগলো তখন তার চোখে পড়লো,অনেক অনেক মানুষ এসেছে। এতো মানুষ কখন এলো? মৃদুল কোথায়? পদ্মজা মৃদুলকে খুঁজতে উঠে দাঁড়ায়। মানুষের ভীড়ে ঢুকে সে মৃদুলকে খুঁজতে থাকে। আমির দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তার বুক ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সে এলোমেলো হয়ে যাওয়া পদ্মজাকে দেখছে। পদ্মজা বুকের ভেতর যে সহ্য ক্ষমতা পুষে রেখেছিল, আজ সেটা ধ্বংস হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে পদ্মজা নিজের মধ্যে নেই। একটুও কাঁদছে না। আমিরের ইচ্ছে হচ্ছে,পদ্মজাকে বুকের

সাথে জড়িয়ে রাখতে। যেন সে হাউমাউ করে কাঁদতে পারে। কিন্তু সেই ইচ্ছে প্রকাশের দুঃসাহস আমিরের নেই। সে এগিয়ে এসে পূর্ণার মুখের দিকে তাকালো। পূর্ণা খুন হয়েছে শুনে,আমির রিদওয়ান,খলিল আর মজিদকে সন্দেহ করেছিল। কিন্তু আমিরের জানামতে, এরা এতো বড় ভুল করবে না। তারা কখনো ঝোপঝাড়ে লাশ ফেলবে না। তারা নদীতে ভাসিয়ে দেয়,যাতে প্রমাণ মুছে যায়। কিন্তু পূর্ণার শরীরে এখন অগণিত প্রমাণ পাওয়া যাবে। একজন কুখ্যাত অপরাধী হিসেবে আমির নিশ্চিত, এমন বোকামি একমাত্র প্রথম খুন করা কেউই করবে। অথবা যাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে লাশ গুম করার,সে বোকা! অলন্দপুরে তারা ছাড়া আর কে হতে পারে? বাসন্তীর হাতের নাড়াচাড়ায় পূর্ণার পায়ের চাদর সরে যায়। তার এক পায়ের নুপুর দেখে আমিরের গায়ের পশম দাঁড়িয়ে পড়ে! সঙ্গে সঙ্গে সে রাগে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ফেললো। তার চোখের রং পাল্টে যায়। চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। এবার সে নিশ্চিত এই কাজ কারা করেছে! আমির দ্রুতপায়ে সবার অগোচরে মোড়ল বাড়ি ছাড়লো। তার গন্তব্য আজিদের বাড়ি।

মৃদুল! সে আজ বেজায় খুশি। ট্রলার নিয়ে এসেছে বউ নিতে। সাথে এসেছে মা-বাবাসহ আত্মীয়স্বজন। গতকাল তার আসার কথা ছিল। কিন্তু আসতে পারেনি। জুলেখা প্রথম রাজি হোননি। যখন দেখলেন মৃদুল সত্যি তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখন তিনি হার মানলেন। বললেন,তিনি এই বিয়েতে রাজি। তিনি ছেলের বিয়েতে থাকতে চান। আর কাছের কয়েজনকে নিয়ে তারপর বউ আনতে যেতে চান। আত্মীয়দের নিয়ে তৈরি হতে হতে রাত হয়ে যায়। তারপর নিজেদের ট্রলার নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বিয়ের উদ্দেশ্যে। জুলেখা এখনো গাল ফুলিয়ে বসে আছেন। তিনি মন থেকে এই বিয়েতে রাজি নন। মৃদুলের তাতে যায় আসে না,তার মা-বাবা বিয়েতে থাকছে এটাই অনেক। আটপাড়ার খালে এসে ট্রলার থামে। খাল থেকে পূর্ণাদের বাড়ি যেতে মিনিট পাঁচেক লাগে। উত্তেজনায় মৃদুলের বুক কাঁপছে। তার ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। যেকোনো কথায় সে হাসছে। ট্রলার থেকে নামার সময় একটা কালো ব্যাগ হাতে তুলে নেয়। মৃদুলকে ব্যাগ নিতে দেখে তার এক ভাই বললো,' আরে ব্যাঠা, ব্যাগ আমার কাছে দে। তুই জামাই মানুষ।'
মৃদুল দিতে রাজি হলো না। এই ব্যাগে থাকা প্রতিটি জিনিস লাল। সে নিজে পূর্ণার জন্য পছন্দ করে কিনেছে। ব্যাগের সবকিছু দিয়ে আজ পূর্ণা সাজবে। সে নিজের হাতে এই ব্যাগ পূর্ণার হাতে দিতে চায়। মৃদুল নাছোড়বান্দা। তার ভাই তার সাথে তর্ক করে পারলো না। মৃদুল খুশির জোয়ারে ভাসছে। সে সবার আগে আগে হেঁটে যায়। মিনিট দুয়েক হাঁটার পর মোড়ল বাড়ির সামনে সে ভীড় দেখতে পেল। মৃদুল অবাক হলো। গ্রামবাসীকে দাওয়াত দেয়া হলো নাকি? নিজে নিজে উত্তর খুঁজে নিল। দাওয়াতই হবে। পূর্ণা কতো পাগল! মৃদুল হাসলো। কিন্তু সেই হাসি মিলিয়ে গেল বাড়ির কাছাকাছি এসে। বাড়ি থেকে কান্নার স্বর ভেসে আসছে। জুলেখা বললেন,' বাড়ির ভিতরে কান্দাকাটি হইতাছে না?'

মৃদুল চুপসে গেল। মনে মনে প্রশ্ন করলো, পদ্মজা ভাবির সাথে আবার কিছু হলো নাকি? সে দৌড়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে। মানুষজনকে ঠেলেঠুলে পূর্ণার লাশের সামনে এসে দাঁড়ায়। পূর্ণার লাশ দেখেই চোখ বন্ধ করে ফেললো। খুশিতে মাথা নষ্ট হয়ে গেল নাকি? চোখ কীসব দেখছে! মৃদুল আবার চোখ খুললো। পূর্ণাকে পা থেকে মাথা অবধি দেখলো। পূর্ণার পায়ে এখনো আলতা লেগে আছে। কাদামাখা লাল টুকটুকে দুটো পা। এই পায়ে হেঁটে দৌড়ে তার কাছে আসার কথা ছিল না? অথচ কেমন নিস্তেজ হয়ে শুয়ে আছে পূর্ণা! মৃদুল তার হাতের ব্যাগটা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে। পূর্ণার মাথার কাছে চলে আসে। পূর্ণার মাথাটা নিজের কোলে নিয়ে ছলছল চোখে সবার দিকে তাকায়। বাসন্তী মৃদুলকে দেখে আরো জোরে কাঁদতে থাকলেন। ঘটনাটা বুঝতে

মৃদুলের অনেক সময় লাগে। সে পূর্ণার গালে আলতো করে থাপ্পড় দিয়ে পূর্ণাকে ডাকলো। ভালোবাসার মানুষের সাথে সংসার করার আশায় পবিত্র মিলনের আকাঙ্ক্ষায় সে ছুটে এসেছে। কিন্তু সে মানুষটি নাকি মৃত! মৃদুল অবাক চোখে তার মা-বাবার দিকে তাকায়। কেমন স্বপ্ন লাগছে সব! পুলিশ এসে ভীড় কমিয়ে দেয়। লাশের আশপাশ থেকে সবাইকে সরে যেতে বলে। মৃদুল বোকা বোকা চোখে পুলিশদের দিকে তাকায়। একজন পুলিশ তার বাহু ধরে সরে যেতে বললে,মৃদুল পূর্ণাকে অনুরোধ করে বললো,' পূর্ণা,এই পূর্ণা। উঠো। আমার শেষ কথাটা রাখো। উঠো তুমি। আমি তোমারে নিয়া যাইতে আইছি।'
মৃদুল দ্রুত ব্যাগের চেইন খুললো। তার হাত কাঁপছে। এসব কী হলো? কেন হলো? পৃথিবীটা এরকম করে ভেঙে যাচ্ছে কেন? বুকের ভেতর কীসের এতো শব্দ? সে ব্যাগ থেকে লাল টুকটুকে বেনারসি বের করলো। তারপর সেই বেনারসি পূর্ণার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে পূর্ণাকে বললো,'আমরা যে ঘরে সংসার পাতাম সেই ঘর আমি সাজায়া আইছি পূর্ণা। সুন্দর কইরা সাজায়া আইছি।'
পুলিশ তাড়া দিচ্ছে। কেউ ছোঁয়ার আগে লাশ তারা নিয়ে যাবে পরীক্ষার জন্য। খুন হওয়া লাশ ছোঁয়ার অনুমতি নেই। কিন্তু মৃদুল জাপটে ধরে রেখেছে পূর্ণাকে। পদ্মজা দূরে বসে আছে। হাঁটুতে থুতুনি ঠেকিয়ে মৃদুলকে দেখছে। তার ঠোঁটে হাসি লেগে আছে। যেন সত্যি মৃদুল বিয়ে করতে এসেছে! আর বিয়ে হচ্ছে। মানুষগুলো একবার পদ্মজাকে দেখছে আরেকবার মৃদুলকে! মৃদুলের বাবা মৃদুলকে বলে পূর্ণাকে ছেড়ে দিতে। মৃদুল আরো শক্ত করে ধরে। সে বিড়বিড় করছে। পূর্ণাকে কানে কানে কিছু বলছে।যখন দুজন লোক মৃদুলকে টেনে তুলতে নিল,মৃদুল চিৎকার করে কেঁদে উঠলো,' পূর্ণা...আমার পূর্ণা। তুমি উঠো না কেন? আম্মা...আম্মা তুমি কই? আম্মা চুড়ি বাইর করো,আলতা বাইর করো আরো কি কি আছে না? সব বাইর করো আম্মা। পূর্ণারে সাজাইবা সবাই। আমি বিয়া করব আম্মা। আম্মা...আম্মা পূর্ণারে উঠতে কও। আম্মা ওরে কারা মারছে? আম্মা.. '
মৃদুলের পাগলামি দেখে ভড়কে যান জুলেখা। এতোবড় ছেলে কেমন হাউমাউ করে কাঁদছে! তিনি দৌড়ে মৃদুলের পাশে আসেন। মৃদুল জুলেখার দিকে তাকিয়ে বললো,' আম্মা মরা মানুষরে বিয়া করা যায় না? আমারে বিয়া দেও আম্মা। তারপর একলগে কবর দেও। আমি ওরে ছাড়া কেমনে থাকুম আম্মা?'

মৃদুল পূর্ণাকে বেনারসি দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলে। তাকে মানুষজন খামচে ধরেও আটকাতে পারছে না। সে পূর্ণাকে শাড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে বুকের সাথে জড়িয়ে রাখে। তার দুই হাত টেনে ছোটাতে চেষ্টা করে সবাই। কিন্তু পারছে না। মৃদুল কিছুতেই পূর্ণাকে ছাড়বে না। আকাশের মালিক যেন নিজ দায়িত্বে মৃদুলের উপর শক্তির ভান্ডারের সব শক্তি ঢেলে দিয়েছেন। এভাবে চলতে থাকলে,লাশ পঁচে যাবে। তদন্তও ঠিকঠাক হবে না। একজন পুলিশ হাতের লাঠি দিয়ে মৃদুলের পিঠে আঘাত করলো। মৃদুল তাও তার কাজে অটল থাকে। সে হাউমাউ করে কাঁদছে। পূর্ণাকে চিৎকার করে ডাকছে। বুক ফেটে যাচ্ছে তার। সে পূর্ণার মাথায় চুমু দিয়ে পূর্ণাকে বললো,' কবুল,কবুল,কবুল। আমি কবুল কইছি পূর্ণা। তুমি কও। সবাই হুনছে আমি কইছি। সবাই হুনছেন না? এহন তুমি কও। পূর্ণা...আমারে এতো বড় শাস্তি দিও না পূর্ণা। আমারেও সাথে নিয়া যাও।'

মৃদুল মানুষজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো,' আমারেও সবাই কবর দেন। পূর্ণার লগে কবর দেন। দিবেন আপনেরা? আমি কবুল কইছি না? অর্ধেক বিয়াতো হইয়া গেছে। হইছে না?'
মৃদুল কাঁদতে কাঁদতে হাসলো। জুলেখা কান্না শুরু করেছেন। মৃদুলের এমন পাগলামি তিনি সহ্য করতে পারছেন না। ছেলেটা পাগল হয়ে গেল নাকি? তার কলিজার টুকরা এমন করে কাঁদছে কেন! কীসের অভাব তার! নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও তিনি মৃদুলকে সুখী দেখতে চান।

Kobitor.com

তিনি মনে মনে চাইছেন,অলৌকিক কিছু হউক,মেয়েটা জেগে উঠুক। মৃদুল হাসুক! মৃদুলের পিঠ ছিঁড়ে যাচ্ছে আঘাতে-আঘাতে। তারা সবাই উন্মাদ এক প্রেমিককে আঘাত করছে যেন পূর্ণাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু মৃদুল তো ছাড়বে না। সে কিছুতেই ছাড়বে না। মৃদুল পূর্ণার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো 'এই কালি? কালি কইছি তো। গুসা করো...গুসা করো আমার সাথে। গালি দেও আমারে। ও পূর্ণা...ও ভ্রমর। চাইয়া দেহো একবার। আসমানের পরী তুমি...সবচেয়ে সুন্দর মুখ তোমার। হাসো পূর্ণা। হাসো।'

বেশ অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধস্তির পর মৃদুলের থেকে পূর্ণাকে সরানো যায়। মৃদুল বন্দী পাখির মতো ছটফট করছে। সে পায়ে মাটি খুঁড়ছে। সবাইকে অনুরোধ করছে তাকে ছেড়ে দিতে। চিৎকার করার কারণে মৃদুলের গলার রগ ফুলে লাল হয়ে গেছে। মানুষের টানাহেঁচড়ায় তার পরনের পাঞ্জাবি ছিঁড়ে গেছে। নিজের অজান্তে এক শ্যামকন্যার প্রেমে উন্মাদ হয়ে ত্যাগ করে সে সর্বসুখ! ত্যাগ করে সকল প্রকার চাওয়া-পাওয়া, স্বপ্ন-আশা! এমনও হয়?

চলবে....
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৮৯

_____
আকস্মিক থাপ্পড়ে রিদওয়ানের ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠে প্রচণ্ড আক্রোশে। সে দাঁতে দাঁত চেপে ক্ষোভ আড়াল করে। মজিদ হাওলাদার টেবিলে থাপ্পড় দিয়ে চাপাস্বরে বললেন,' এমন বোকামি কী করে করলি? এখন কে বাঁচাবে?'
রিদওয়ান মাথা নত করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। পূর্ণার খবরটা শোনার পর থেকে বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে গেছে। পূর্ণার শরীরে অগণিত প্রমাণ রয়েছে যা রিদওয়ানের জন্য বিপদজনক। মুত্তালিব যেখানে সেখানে ফেলে চলে আসবে জানলে সে এই দায়িত্ব দিত না। কিন্তু যা হওয়ার তো হয়েই গেছে। এখন তাকে একমাত্র মজিদ বাঁচাতে পারেন। খলিল মিইয়ে যাওয়া গলায় বললো,' ভাইজান,ও বুঝে নাই। না বুইঝা কইরা ফেলছে।'
মজিদ চেয়ারে বসলেন। জগ থেকে ঢকঢক করে পানি খেয়ে বললেন,' যা করেছে করেছেই! কিন্তু শেষে কী বোকামিটা করলো! লাশ কেউ ঝোপে ফেলে আসে?'
রিদওয়ান মুখ খুললো,' আমি মুত্তালিব কাকারে বলছিলাম,লাশটা আজমপুর হাওড়ে ফেলে আসতে।'
রিদওয়ানের কথা যেন আগুনে ঘি ঢাললো। মজিদ উঠে দাঁড়ান। রিদওয়ানের পিঠে একনাগাড়ে কয়টা থাপ্পড় বসিয়ে খিটখিট করে বললেন,' তুই চুপ থাক হারামজাদা!'
রিদওয়ানের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যায়। মজিদ খলিলের দিকে তাকিয়ে বললেন,'এখন এখানে বসে থাকবি? নাকি আমার সাথে যাবি?'
খলিল চট করে উঠে দাঁড়ালেন। মজিদ মাথার টুপিটা ঠিক করে রিদওয়ানকে বললেন,' তুইও আয় সাথে।'
রিদওয়ান পথ আটকে বললো,' কাকা,একটা কথা ছিল।'
'আবার কী বলবি তুই?'

'গতকাল রাতে ভাঙা ফটকের বাইরে ইয়াকুব আলী আর তার ছেলেকে দেখছি।'
মজিদের চোখমুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। ইয়াকুব আলী শিক্ষিত মার্জিত একজন ব্যক্তি। যিনি ইসলামের আদর্শে চলাফেরা করেন। নিজের সর্বত্র বিলিয়ে দেন গরীব-দুঃখীদের। কিন্তু মজিদকে টেক্কা দিয়ে মাতব্বরি পদটা ছিনিয়ে নিতে পারেননি। তবে তিনি ক্ষমতাবান ব্যক্তি। মজিদের সামনে দাঁড়ানোর মতো ক্ষমতা তার আছে। গত চার বছর ধরে এই মহান ব্যক্তির মুখোমুখি মজিদকে হতে হচ্ছে। চার বছর আগে ইয়াকুব আলী সৌদিতে ছিলেন। সৌদি থেকে এসেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জনসেবা করবেন। এই লোক তার বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করছে মানে তো,বিপদজনক কিছু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে৷ মজিদ আন্দাজ করে নিলেন,সেদিনের সমাবেশের ঘটনা থেকে ইয়াকুব আলীর কিছু সন্দেহ হয়েছে। তিনি রিদওয়ানের দিকে তাকিয়ে রাগী স্বরে বললেন,' বিপদের জাল চারিদিকে, তার মধ্যে তুই আবার আরেক অঘটন ঘটালি!'
রিদওয়ান প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো,' আপনি পূর্ণার ব্যাপারটা সামলান। আমি বাকিগুলো সামলে নেব।'
রিদওয়ানের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ মজিদের গায়ে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে। তিনি কটাক্ষ করে বললেন,'তুই আমার বা* করবি!'

অপমানে রিদওয়ানের মুখটা থমথমে হয়ে যায়। সে খলিলের দিকে তাকায়। খলিল চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। মজিদ রাগে ফুঁসছেন। তিনি মেঝেতে থুথু ফেলে বেরিয়ে পড়লেন। মজিদের সাথে খলিলও বেরিয়ে গেলেন। রিদওয়ান অনেকক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর জগের পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়ল। রিনু আলগ ঘর ছেড়ে দৌড়ে অন্দরমহলে চলে আসে। সে আলগ ঘর ঝাড়ু দিতে গিয়েছিল। তারপরই মজিদ,খলিল ও রিদওয়ানের কথা শুনেছে। বাড়িতে আমিনা আর আলো আছে। লতিফা পদ্মজার সাথে গিয়েছে। রিনু রান্নাঘরে এসে চার-পাঁচ গ্লাস পানি খেল। তার বুক কাঁপছে। সে বাকহারা! পূর্ণাকে রিদওয়ান আর খলিল খুন করেছে! এটা শুনে তার মাথা ভনভন করছে।

আজিদের বাড়ির আঙিনা শূন্য! কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আমির চারপাশে চোখ বুলিয়ে সোজা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। আসমানি হঠাৎ আমিরকে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। সে নিজেকে ধাতস্থ করার পূর্বে আমির তার গলা চেপে ধরলো। আসমানি আকস্মিক ঘটনায় হতভম্ব। সে দ্রুত আমিরের হাত চেপে ধরে। আমির দাঁতে দাঁত চেপে বললো,' একটা মিথ্যা বললে,সোজা নরকে পাঠিয়ে দেব মা* ঝি।'
আসমানির নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কথা বলতে পারছে না। এক্ষুনি বুঝি দম বেরিয়ে যাবে! তার মুখ দিয়ে ঘ্যারঘ্যার জাতীয় শব্দ বেরিয়ে আসে৷ আমির আসমানির হাঁটুতে লাথি দিয়ে আসমানিকে মাটিতে ফেলে দেয়,তারপর চুলের মুঠি ধরে শক্ত করে। আসমানি কাশতে থাকে। হৃৎপিণ্ড আরেকটু হলে ফেটে যেত৷ শ্বাসনালী ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে আসতো! তার মনে হচ্ছে,সে নতুন জীবন পেয়েছে। আসমানি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। রাগে আমিরের কপালের রগ ভেসে উঠেছে। পারলে সে আসমানিকে পিষে ফেলে! আমির গলার আওয়াজ নীচু করে বললো,' পূর্ণার সাথে কী হয়েছিল?'
আসমানির চোখ দুটি বড় বড় হয়ে যায়৷ সে আমিরকে যতটুকু চিনে গতকালই আন্দাজ করতে পেরেছিল,আমির দ্রুত সব ধরে ফেলবে। কিন্তু এতো দ্রুত ধরে ফেলবে ভাবেনি। আসমানি কথা বলার জন্য উদ্যত হলো তখন আমির হুমকি দিল,' একটা অক্ষর মিথ্যে বললে এখানেই পুঁতে যাবো। সত্য বলার সুযোগ দেব না।'

আমিরের কথা শুনে ভয় পেয়ে যায় আসমানি। দুই বছর আগের কথা, তাদের দলের একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। আমির সেই বিশ্বাসঘাতককে যেখানে ধরেছিল সেখানেই মাটি খুঁড়ে পুঁতে এসেছিল! আসমানি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো,' চুল ছাড়ো। কইতাছি।'
আমির আরো শক্ত করে ধরে। আসমানি আর্তনাদ করে উঠলো। সে যত সময় নিবে তত বেশি অত্যাচারিত হবে। তাই দ্রুত সব বলে দিল। আমির আসমানিকে ছেড়ে দেয়। ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ান মালেহা বানু। তিনি আজিদের মা এবং আসমানির শ্বাশুড়ি। আমির চলে যেতে উঠে দাঁড়ায়। আসমানি তড়িৎ গতিতে বলে উঠলো,' কিছু খাইয়া যাও।'

আমির শুনেও না শোনার ভান করে মালেহা বানুর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। মালেহা বানু অবাক চোখে আসমানিকে দেখছেন।মাতব্বরের ছেলে তার ছেলের বউকে মারলো কেন? তিনি প্রশ্ন করতে গিয়েও করলেন না। তীব্র কৌতূহল চাপা দিয়ে দরজা ছেড়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। শফিক আমিরের হাতে খুন হওয়ার পর মালেহা বানু অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি জানেন শফিক নিখোঁজ। আসমানি এবং আজিদ শফিকের পরিণতি জানে। তারা কেউ শফিককে হারিয়ে একটুও ব্যথিত নয়। পাপের রাজত্বে প্রয়োজনে সহযোগী পাওয়া যায়, আপনজন নয়! মালেহা বানু এ সম্পর্কিত কিছুই জানেন না। তিনি সবসময় নীরব। পাড়া ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন। দুই ছেলে অর্থ উপার্জন করছে এইতো অনেক! তিনি রানীর মতো আছেন। আর কী লাগে? তার রাগটা আসমানির উপর। আসমানির সাথে শফিকের দৃষ্টিকটু ঘেষাঘেষি তিনি অনেকবার দেখেছেন! এ নিয়ে কথা শুনাতে গেলে,শফিক ও আজিদ দুজনই ক্রুদ্ধ হতো! তাই তিনি অনেকদিন হলো আসমানির সাথে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছেন।

বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আজিদের সাথে দেখা হয়। আজিদ আমিরকে দেখে বললো,'হুনলাম,পূর্ণা নাকি খুন অইছে?'

আমির উত্তর দিল না। সে আজিদকে এড়িয়ে যায়। আজিদ ঘাড় ঘুরিয়ে আমিরের উপর কটমট করে তাকায়। সে তার বড় ভাই শফিকের কথা শুনে এদের সাথে যুক্ত হয়েছিল। সেখানে দেখা হয় আসমানির সাথে। আসমানি সুন্দরী। রূপের ঝলকে পুরুষ মানুষকে কাত করার ক্ষমতা তার আছে। আজিদ মাঝেমধ্যে পাতালে যেত তাও আসমানির সাথে সময় কাটানোর জন্য। আসমানি একাধারে পাতালের প্রতিটি পুরুষের সাথে রাত কাটাত। আজিদ প্রথম অবাক হয়েছিল,একটা মেয়ে কী করে এতোটা খারাপ হতে পারে? তারপর অবশ্য জেনেছে,আসমানি তার জন্মদাত্রীর মতো হয়েছে। আমিরের দাদি নূরজাহানের সঙ্গী হিসেবে তার একজন বান্ধবী ছিল। সেই বান্দবীর মেয়ে আসমানি। মায়ের পেশা মেয়ে পেয়েছে! আসমানি ষোল বছর বয়স থেকেই তার গ্রামে কু-কীর্তি করে বেরিয়েছে। গ্রামের সালিশে যখন তাকে গ্রাম থেকে বের করে দিল,তখন মজিদ হাওলাদার আর আমির হাওলাদার আসমানিকে আজিদের গলায় ঝুলিয়ে দিল। আজিদ এমন একটা মেয়েকে বউ হিসেবে গ্রহণ করতে সংকোচ করেছিল। কিন্তু তার বড় ভাই বিয়েটা সমর্থন করে। এখানে আজিদের আর কিছু বলার ছিল না। সে আসমানিকে বিয়ে করে। তবে ইদানীং একটা বাচ্চার জন্য আজিদের মন কাঁদে। আসমানির কখনো বাচ্চা হলে সে মানতে পারবে না,এই বাচ্চা তার। এ নিয়ে সে যন্ত্রণায় আছে। মনে মনে হাওলাদার বাড়ি আর মৃত শফিকের উপর ক্ষিপ্ত সে। গত কয়দিন ভেবে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে,মজিদের অনুমতি নিয়ে সে আরেকটা বিয়ে করবে। আজিদ সোজা কলপাড়ে চলে আসে। আজ বিকেলে তাকে রওনা হতে হবে। মালেহা বানুর অসুস্থতা বেড়েছে। শহরের ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

তখন সময় বোধহয় রাত নয়টা। আমির অন্দরমহলে না গিয়ে সোজা আলগ ঘরে প্রবেশ করলো। গাঢ় অন্ধকারে আলগ ঘর ডুবে আছে। চারিদিক এতটাই নির্জন যে,মনে হচ্ছে মৃত্যু নেমে এসেছে চারিদিকে। খলিল-মজিদ বাড়িতে নেই। তারা লোক দেখানো ভালোমানুষিতে ব্যস্ত। দুজনে মোড়ল বাড়ির অভিভাবক হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমির জানে,তারা প্রমাণ লুটপাটে ব্যস্ত। প্রমাণ নষ্ট করা তাদের বাঁ হাতের কাজ! আমির বিছানা হাতড়ে বালিশের নিচ থেকে দিয়াশলাই বের করে হারিকেন জ্বালাল। মগা বিকেলে বেরিয়ে গেছে। তাই আলগ ঘরে সুনসান নীরবতা। নয়তো অন্যবার মগার নাক ডাকার শব্দে আলগ ঘরে টেকা যায় না।

আমির তার খয়েরী শার্টের পকেট থেকে একটা লাল ছোট খাম বের করলো। তারপর হারিকেনের সামনে বসলো। পাশের ঘরে ধপ করে শব্দ হয়। আমির সে ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলো,বিড়াল ছোটাছুটি করছে। নিশ্চয়ই ইদুর দেখেছে! সে হারিকেন নিভিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। লাল খামটি পায়জামার পকেটে রাখে। অন্দরমহলের চারপাশ ঘিরে জোনাকি পোকারা অনর্থক গল্প করে যাচ্ছে। আমির জোনাকিপোকাদের ভীড়ে দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। আজকের দিনটা অন্যরকম হওয়ার কথা ছিল! কিছুটা সুন্দর কিছুটা দুঃখের! অথচ সবটাই শব্দহীন। আমির কিছু একটা ভেবে অন্দরমহলে প্রবেশ করে। লতিফা আমিরকে দেখে দৌড়ে এসে পথ আটকে বললো,' ভাইজান,পদ্মর কী হইলো বুঝতাছি না। কথাবাতা কয় না।'
লতিফা চিন্তিত। আমির প্রসঙ্গ পাল্টে বললো,' আমি থাকব এখানে। তুই রান্না বসা।'
কথা শেষ করে উপরে উঠে গেল আমির। লতিফা রান্নাঘরে চলে যায়। আমির আজ পদ্মজার সাথে থাকবে শুনে সে কেন জানি খুব খুশি হলো! পুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল,আমির সারাক্ষণ ঘরের ভেতর আঠার মতো লেগে থাকতো। না নিজে বের হতো আর না পদ্মজাকে বের হতে দিতো! এ নিয়ে ফরিনা,রানি,নূরজাহান ও আমিনার কত কথা ছিল! লতিফার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো। অতীত এতো সুন্দর কেন হয়?

দ্বিতীয় তলায় উঠতেই আমিরের শরীর কাঁটা দিয়ে উঠে। বারান্দা জুড়ে উত্তুরে হাওয়া বইছে। আকাশের তারা ও অর্ধচন্দ্রের আলো ছাড়া আর কোনো আলো নেই। এমন একটা পরিবেশে মিনমিনিয়ে কেউ কাঁদছে । বড্ড অচেনা এই কান্না! যেন কোনো অশরীরী শত জনমের দুঃখ একসাথে মনে করে কাঁদছে! আমির দ্রুত পায়ে পদ্মজার ঘরে আসে। ঘরের প্রতিটি কোণা অন্ধকারে তলিয়ে আছে। বাতাসে একটা ভারী কান্না ভেসে বেড়াচ্ছে। আমির আন্দাজে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো। বিছানার পাশে একটা টেবিল আছে। সে টেবিলে হারিকেন থাকে আর ড্রয়ারে থাকে দিয়াশলাই। আমির দিয়াশলাই বের করে হারিকেন জ্বালাল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো,দেয়াল ঘেঁষে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে পদ্মজা। সে কাঁদছে! কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। তার করুণ কান্না এসে আমিরের বুক ভিজিয়ে দেয়। ও বাড়ির অবস্থা ভালো নেই। প্রেমার গা কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে। চোখ খুলে তাকাতে পারছে না। বাসন্তী পড়েছেন বড় কষ্টে! একদিকে পূর্ণার সমাপ্তি অন্যদিকে প্রেমার গা কাঁপানো জ্বর! মৃদুলের গলা ভেঙে গেছে,বড্ড এলোমেলো হয়ে গেছে সে। বাবা-মায়ের বড় আদরের একমাত্র ছেলে। কখনো মায়ের হাতে মার খেয়েছে কিনা সন্দেহ! তার প্রাপ্তির খাতা সবসময় পরিপূর্ণ ছিল। সে কখনো কষ্টে কাঁদেনি,বাস্তবতা দেখেনি। সোনার চামচে খেয়ে বড় হওয়া আহ্লাদী আদুরে ছেলে! তার জন্য এই ধাক্কাটা মৃত্যুর মতো! সে স্বাভাবিক হতে কত সময় নিবে কে জানে! অথচ সবকিছু ছেড়ে পদ্মজা অন্দরমহলে চলে এসেছে। তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। এক জায়গায় সারাক্ষণ বসে ছিল।

তারপর হুট করেই অন্দরমহলে চলে আসে। সাথে খন্ড খন্ড মেঘ আষাঢ়ী দুই চোখে জড়ো করে নিয়ে আসে।
আমির কথা বলার জন্য যখন উদ্যত হলো সে টের পেলো তার হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়ছে! এমন কেন হয়? পদ্মজা কোন আসমানের চাঁদ যে তাকে ছোঁয়ার কথা ভাবলেই আমিরের গলা শুকিয়ে আসে! কয়দিনের দূরত্বে, মানুষটার চোখের দিকে তাকাতেও সংকোচ হচ্ছে! অথচ,ফেলে আসা দীর্ঘ ছয় বছরের প্রতিটি রাত দুজন দুজনের বুকের সাথে লেপ্টে কাটিয়েছে। কত উছলে পড়া জ্যোৎস্না রাতে তারা ভালোবাসার গল্প রচনা করেছে! আমির রয়ে সয়ে বললো,' চলে এলে কেন?'
পদ্মজা মাথা তুলে তাকালো। পদ্মজার চোখের দৃষ্টিতে আমির এলোমেলো হয়ে গেল। বুক প্রবলভাবে কাঁপতে থাকলো। পদ্মজার দৃষ্টির জাল আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে তাকে। সে বিছানার উপর বসলো। বুকের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। অথচ পদ্মজা নির্লিপ্ত। পদ্মজার নাকের নাকফুলটা জ্বলজ্বল করছে। নাকফুলটি বিয়ের পর আমির পরিয়ে দিয়েছিল। নাকফুলে গেঁথে দিয়েছিল জনম জনমের ভালোবাসা। অথচ,এখন সেই ভালোবাসা বিষের দাঁনার মতো রূপ নিয়েছে! পদ্মজা এক হাতে মাথা ঠেকিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো,' আমি কিছু পেলাম না জীবনে। আব্বার অবহেলা আর নোংরা কথা শুনে কাটিয়েছি ষোলটা বছর। তারপর আমার মা,আমার মা আমাকে ছেড়ে চলে গেল। সে হচ্ছে আরেক বিশ্বাসঘাতক।'
শেষ লাইনটায় ক্ষোভ-অভিমান প্রকাশ পায়। পদ্মজা গলার জোর বাড়িয়ে 'বিশ্বাসঘাতক' শব্দটি উচ্চারণ করলো। আমির চট করে বললো,' উনি বিশ্বাসঘাতক নন।'
পদ্মজা ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো দুই হাতে খামচে ধরে মেঝে। আমিরের দিকে রক্তচোখে তাকায়। তার বুক থেকে আঁচল মেঝেতে পড়ে। সে রাগে দাঁতে দাঁত চেপে আমিরকে বললো,' করেছে,করেছে। সবকিছুর জন্য আমার মা দায়ী। সব ভুল আমার মায়ের। সে আমাকে জন্ম দিয়েছে। আমাকে আগুনে ঠেলে দিয়ে নিজে চলে গেছে। ছোট থেকে আমাকে বলে এসেছে, সারাজীবন আমার সাথে থাকবে। আমাকে আগলে রাখবেন। যাই হয়ে যাক,সব আমাকে বলবে। কিন্তু আম্মা,একটা কথাও রাখেনি। রাখেনি কোনো কথা। প্রতারক,বিশ্বাসঘাতক। সব দোষ আমার মায়ের। সব দোষ...'

পদ্মজা অস্থির হয়ে পড়েছে। তার নিঃশ্বাস এলোমেলো। সে বিপর্যস্ত। কাঁদতে কাঁদতে হুট করে আমিরের দিকে তাকিয়ে সে হাসলো। বললো,' সবাই কী ভেবেছে? আমাকে কষ্ট দিয়ে কাঁদাবে? আমি কাঁদব না। কিছুতেই কাঁদব না।'
কাঁদব না বলেও আবার কাঁদতে শুরু করলো। কষ্টের মাত্রা পেরিয়ে গেলে,মানুষ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সে তার জীবনের ছোট ঘটনাগুলোকে বড় করে ভাবতে থাকে।সারাক্ষণ বিলাপ করে আর কাঁদে। পদ্মজার অবস্থা এখন ওরকম! সে তার চেনা সত্ত্বা থেকে বেরিয়ে পড়েছে। পদ্মজার কান্না শুনে আমিরের মাথা ফেটে যাচ্ছে। সে চিৎকার করে বলতে চাইছে, পদ্মবতী, কান্না থামাও। কান্না থামাও তুমি। আমি সহ্য করতে পারছি না। এতো কেন কষ্ট তোমার? তুমি পদ্মবতী নাকি কষ্টবতী?
মনের কথা মনে রয়ে গেল। আমির পারলো না কিছু বলতে। সে বিছানার মাঝে গিয়ে বসলো। দুই হাতে নিজের মাথার চুল টেনে ধরে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয়। আত্মগ্লানি তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। সে যেন অদৃশ্য কোনো শেকলে বন্দী। পদ্মজার আর্তনাদ, বিলাপ গুমরে গুমরে কেঁদে ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমির টের পাচ্ছে! আর টের পাচ্ছে বলেই,মনে হচ্ছে তার মস্তিষ্কে কেউ যেন রড দিয়ে পিটাচ্ছে। সে জানালার বাইরে তাকায়। রাতের লক্ষ তারাতেও যেন বেদনার গুঞ্জন। হৃদয়ের শহর খাঁখাঁ করছে। ইচ্ছে হচ্ছে,অন্যবারের মতো পালিয়ে যেতে। কিন্তু আজ সে

পালাবে না। সে পালাতে চায় না। তার ভেতরটা তিরতির করে কাঁপছে। মোলায়েম বাতাসের ঝংকারে রগে রগে শিরশির অনুভুতি হচ্ছে। আমির পদ্মজার দিকে তাকায়। নিজের মাথার চুল আরো জোরে টেনে ধরে। পদ্মজা পা ছড়িয়ে বসলো। দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজলো। আমির পদ্মজার উপর চোখ রেখে নিজের হাত কামড়ে ধরে। সে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে, সে কি নিজের সিদ্ধান্তে অটল? হ্যাঁ/না,/হ্যাঁ/না একটা সিদ্ধান্তের ব্যবধান মাত্র। তাহলেই মনের যুদ্ধের সমাপ্তি! খুব দ্রুত উত্তর আসে হ্যাঁ! মুহূর্তে অদৃশ্য ভারী দেয়াল ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। পৃথিবীর সব ফুল জেগে উঠে। শান্ত সমুদ্রের ঢেউ যেন বিকট শব্দ তুলে আছড়ে পড়ে তীরে। আমির বিছানা থেকে নেমে পদ্মজার দুই বাহু চেপে ধরে দাঁড় করায়। পদ্মজা দরজার বাইরে তাকিয়ে আছে। তার বার বার হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। একবার পূর্ণাকে দেখছে তো অন্যবার পারিজাকে। দুজনই রক্তাক্ত অবস্থায় তার সামনে আসে। পদ্মজা খামচে ধরে আমিরের চোখমুখ। নখের আঁচড়ে গাল ছিঁড়ে নেয়। আমির তার দুই হাতে পদ্মজাকে বুকের সাথে চেপে ধরলো। পদ্মজা আবার কান্না শুরু করে।

আমির পদ্মজাকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বললো,'একটু শান্ত হও...একটু!'
পদ্মজা এতক্ষণ আমিরকে টের পায়নি। এখন টের পাচ্ছে। সে এক ঝটকায় আমিরের হাত দূরে সরিয়ে দেয়। তারপর বিছানার মাঝে গিয়ে বসলো। আমির পদ্মজার সামনে এসে বসে। আমিরের মুখটা দেখে মনে পড়ে যায় প্রথম দিনের কথা। যেদিন পাতালে আমিরের সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল। আমির নগ্ন মেয়েগুলোকে বেল্ট দিয়ে পিটাচ্ছিল! পদ্মজার রক্ত ছলকে উঠে। তার বোনের সাথেও কি এমন হয়েছে? কিছু বুঝে উঠার পূর্বে পদ্মজা আমিরের গলা চেপে ধরলো। আমির হকচকিয়ে গেলেও বাঁধা দিল না। পদ্মজা আমিরের মুখের উপর ঝুঁকে কিছু একটা বিড়বিড় করে। যা অস্পষ্ট। বিড়বিড় করতে করতে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে দুই হাতে আমিরের গলা চেপে ধরে রাখে। আমির গলায় প্রচণ্ড চাপ অনুভব করে। তার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে। চোখ বুজতেই যন্ত্রণায় চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে। পদ্মজা আমিরের গলা ছেড়ে দিল। দূরে সরে বসলো। আমিরের শুকিয়ে যাওয়া মুখটা দেখে ফিক করে হেসে দিল। তারপর আবার নীরব হয়ে গেল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠে,হেমলতার মৃত মুখ,পারিজারর মৃত মুখ,পূর্ণার মৃত মুখ! পূর্ণা একটা গাছের সামনে বসে কাঁদছে। এইতো তার চেয়ে মাত্র কয়েক দূরেই সেই গাছটা। পারিজা একটা বাড়ির ছাদে বসে আছে। তার গলা থেকে রক্ত ছুঁইয়ে- ছুঁইয়ে পড়ছে! পদ্মজা থম মেরে সেখানে তাকিয়ে রইলো। অদ্ভুত স্বরে কেঁদে উঠলো। আমির নিজেকে ধাতস্থ করতে সময় নিল। পদ্মজা কান্না থামিয়ে অবাক চোখে আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে। সে কিছু দেখছে! আমির পদ্মজার কাছে এসে বসে। পদ্মজার এক হাত মুঠোয় নিয়ে আঙুলগুলো আলতো করে ছুঁয়ে দেয়। পদ্মজার মুখের উপর কয়টা চুল উড়ে বেড়াচ্ছে। আমির অবাধ্য চুলগুলোকে পদ্মজার কানে গুঁজে দিল। পদ্মজার চোখ,নাক,গাল,ঠোঁট পর্যবেক্ষণ করে আমির উঁকি দিল অতীতে। গল্পটা ভীষণ ব্যক্তিগত। পদ্মজা একবার বিরক্ত হয়ে রাগী স্বরে বলেছিল,'আরেকটা চুমু দিলে আমি বাড়ি ছেড়ে কিন্তু চলে যাব।'
আমির পদ্মজার কথায় থমকে যায়। তখন ঢাকায় নতুন নতুন তাদের সংসার। পদ্মজা ভার্সিটিতে পড়ছে। আগামীকাল তার পরীক্ষা তাই সে পড়ছিল। কিন্তু আমির সেদিন বাড়িতে ছিল। আর সারাক্ষণ পদ্মজাকে বিরক্ত করে যাচ্ছিল। পদ্মজার মুখের সামনে গিয়ে একবার নাকে চুমু দেয় তো আরেকবার গালে। বারংবার পদ্মজা পড়ার খেই হারিয়ে ফেলছিল। সে ভীষণ রেগে যায়। আর কথাটা বলে ফেলে। আমিরতো বরাবরই রাগী। সে তাৎক্ষনিক রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যা সময় বাড়ি ফেরে তাও পদ্মজার সাথে কোনো কথা বললো না। পদ্মজা তো অবাক। সে কথা

বলতে গেলে, হু হ্যাঁ ছাড়া আমির কিছু বলে না। পদ্মজা মুখে কিছু বলতে লজ্জা পায়৷ তাই সে বিভিন্নভাবে আমিরের আকর্ষণ পাওয়ার চেষ্টা করেছে। আমির প্রথম পদক্ষেপে নরম হয়ে গেলেও প্রকাশ করলো না। সে গম্ভীর হয়ে থাকে। চুপচাপ খেয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। অথচ অন্যবার পদ্মজাকে টেনে নিয়ে যায়,তারপর একসাথে ঘুমায়। আমিরের আচরণে পদ্মজা মনে ব্যথা পায়। একটা কথার জন্য এরকম কেউ করে? পদ্মজা অভিমানে বৈঠকখানায় বসে থাকে। আমির এদিকে চিন্তিত৷ রাত বাড়ছে,পদ্মজা আসে না কেন? সে ভাবলো,পদ্মজা এসে ইনিয়েবিনিয়ে কথা বলে তার রাগ ভাঙানোর চেষ্টা করবে। তখন সে কিছু একটা চেয়ে বসবে। কিন্তু তার অর্ধাঙ্গিনী তো ঘরেই আসছে না! আমির বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সিঁড়ি ভেঙে নামার সময় দেখে পদ্মজা সোফায় গাল ফুলিয়ে থম মেরে বসে আছে! রাগ ভাঙানোর বদলে উল্টো রাগ করে বসে আছে। কি অদ্ভুত! আমির খ্যাক করে গলা পরিষ্কার করে বললো,' রাত কয়টা বাজে কারো খবর আছে? কেউ কি ঘরে যাবে না?'
পদ্মজা অভিমানী স্বরে বললো,' কেউ তাকে পাত্তা না দিলে সে কেন ঘরে যাবে?'
আমির হেসে ফেললো। সে পদ্মজার সামনে এসে বসে। পদ্মজার চোখে জল চিকচিক করছে। আমির পদ্মজার হাতে চুমু দিয়ে বললো,' কী বাচ্চাকাচ্চা বিয়ে করলাম রে। একটুতে কেঁদে দেয়।'
'তো ছেড়ে দিন না।'
আমিরের চোখ দুটি বড় বড় হয়ে যায়! পদ্মজা এতো কথা কবে শিখলো। কী অভিমান তার!
আমির হাসি দীর্ঘ করলো। পদ্মজার মুখের উপর ঝুঁকে বললো,' মৃত্যুর আগে ছাড়ছি না। পরপারে যদি আবার দেখা হয় তখনও তোমার পিছু নেব।'
আমিরকে মুখের উপর ঝুঁকতে দেখে পদ্মজা লজ্জা পেয়ে গেল।

ও বাড়ির প্রতিটি ইট তাদের ভালোবাসার স্বাক্ষী। সবখানে ভালোবাসা লেপ্টে লেপ্টে আছে। আমির বর্তমানে ফিরে আসে। সে রান্নাঘরে যায়। লতিফাকে বলে গরম পানি আর ছোট তোয়ালে নিয়ে আসে। পদ্মজার মাথাটা ভীষণ ব্যথা করছে। তার চোখ দুটির উপর যেন ভারী পর্দা টানানো। এই জগতের কিছু দেখছে না। সে চোখ বুজলো। তার হাঁটু থেকে পা অবধি কাঁদা লেগে আছে। আমির ভেজা তোয়ালে দিয়ে পদ্মজার হাত-পা মুছে দিল। তারপর লতিফাকে ডেকে আনে। লতিফা পদ্মজাকে দেখে ভয় পেয়ে যায়। সে পদ্মজাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমির লতিফাকে বললো,' কয়দিনে ঠিক হয়ে যাবে। শোন তোর সাথে কিছু কথা আছে।'
লতিফা উৎসুক হয়ে তাকায়। আমির বললো,' পদ্মজার যত্ন নিবি। রাধাপুরের রঞ্জন মিয়ারে চিনিস না?'
লতিফা বললো,' চিনি।'
'উনি নিজের হাতে বাদামের তেল বানান। খাঁটি বাদামের তেল। পদ্মজা চুলে বাদামের তেল দেয়। উনার কাছ থেকে সবসময় বাদামের তেল আনবি। আর, ওর পিঠের হাড়ে মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। ছোটবেলা কোথাও আঘাত পেয়েছে। যখন ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটবে বুঝবি,পিঠের হাড়ে যন্ত্রণা হচ্ছে। তখন ধরে নিয়ে সরিষা তেল ডলে দিবি আর গরম সেঁক দিবি। তিনবেলা নিজ দায়িত্বে জোর করে খাওয়াবি। আর পিঠের দিকে কিন্তু খেয়াল অবশ্যই রাখবি।'
লতিফা জানে না তাকে কেন এই দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে৷ সে প্রশ্নও করলো না। বাধ্যের মতো মাথা নাড়াল। পদ্মজা আবার মিনমিনিয়ে কাঁদছে। অস্পষ্ট স্বরে পূর্ণাকে ডাকছে। লতিফা পদ্মজার শাড়ি ও বিছানার চাদর পাল্টে দিল৷ শাড়ি পাল্টানোর সময় যখন পদ্মজা অর্ধনগ্ন তখন সে লতিফাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললো, 'পূর্ণা..পূর্ণা...বোন আমার।'

লতিফা চমকে গেল। তাকে পদ্মজা পূর্ণা বলছে কেন? পদ্মজার কান্না শুনে আমির ছুটে ঘরে আসে। পদ্মজা আমিরকে দেখেই,টেবিল থেকে হারিকেন নিয়ে তার উপর ছুঁড়ে মারে। তারপর চিৎকার করে বললো,' খুনী,ধর্ষক, জানোয়ার...জানোয়ার....।'
পদ্মজার চিৎকারে অন্দরমহল কেঁপে উঠে। হারিকেনের কাচের উপর ব্যবহৃত প্লাস্টিক আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তাই পদ্মজা চিকন তার দিয়ে সেটি জোড়া দেয়। তারের একাংশ খাড়া হয়ে ছিল। সেই খাড়া অংশ আমিরের চোখের পাশে ঢুকে পড়ে। আরেকটু হলে চোখ গলে যেত। সঙ্গে সঙ্গে আমির মেঝেতে বসে পড়লো। দুই-তিন ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে আসে। লতিফা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। পদ্মজা রাগে কিড়মিড় করতে করতে চাদর ছুঁড়ে ফেলে মাটিতে। আমির লতিফাকে বললো,' পদ্মজাকে দেখ তুই।'
তারপর সে অন্য চোখে পথ দেখে সোজা কলপাড়ে চলে যায়। চোখের পাশে আঘাত পেলেও চোখের ভেতর ভীষণ ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। খলিল-রিদওয়ান সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছে। এসেই পদ্মজার চিৎকার শুনে। পদ্মজার চিৎকার কোনো স্বাভাবিক মানুষের মতো না। তাছাড়া তারা দুজনই পদ্মজাকে ও বাড়িতে কাঁদতে দেখেনি। অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখেছে। খলিল রিদওয়ানকে বললো,' এই ছেড়ি পাগল হইয়া গেল নাকি?'
রিদওয়ান হেসে বললো,' আরো আগে হওয়ার কথা ছিল আব্বা।'

আমিরকে কলপাড়ে দৌড়ে যেতে দেখে রিনুও পিছনে যায়। সে কল চাপে। আমির উন্মাদের মতো চোখে পানি দিতে থাকে। তার চোখ জ্বলে যাচ্ছে। যাক, সে তো এটাই চায়! হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃত সব ছারখার হয়ে যাক!
পদ্মজা লতিফার হাত খামচে ধরে। তার চোখমুখ অদ্ভুত দেখাচ্ছে। সে চাপা স্বরে প্রশ্ন করলো, 'আমার বোনকে কে খুন করেছে? কার আদেশে হয়েছে?'
পদ্মজার চাহনি দেখে মনে হচ্ছে,লতিফা যদি প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারে তাহলে পদ্মজা তাকেও খুন করে ফেলবে। লতিফা পদ্মজার সাথে বাড়ি ফেরার পর রিনু লতিফার কাছে ছুটে আসে। সে যা যা শুনেছে সব লতিফাকে বলে। লতিফা এখন সব জানা সত্ত্বেও বলতে চাইছে না। সে বললো,' শাড়িডা আগে পিন্দো। ঠান্ডা লাগব।'
পদ্মজা লতিফার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। সে লতিফার হাত খামচে ধরে রাখা অবস্থায় বললো,' কী জানো তুমি? বলো আমাকে।'

যতক্ষণ লতিফার মুখ থেকে কিছু না শুনবে ততক্ষণ লতিফার হাত পদ্মজা ছাড়বে না। তার নখ লতিফার হাতের চামড়া ভেদ করেছে। লতিফা সংক্ষেপে দ্রুত সব বললো। সব শুনে পদ্মজা লতিফার হাত ছেড়ে নিজের হাত নিজে খামচে ধরে। মুখ দিয়ে 'ইইইই' জাতীয় শব্দ করে রাগে কাঁপতে থাকে। লতিফা ভয় পেয়ে যায়। সে পদ্মজার মাথায় হাত রাখে,পদ্মজা সেই হাত এক ঝটকায় সরিয়ে দেয়। লতিফা দূরে সরে আসে। পদ্মজা শূন্যে তাকিয়ে নিজেকে স্থির করলো। তারপর চুপচাপ শাড়ি পড়ে শুয়ে পড়ে। লতিফা ধীর পায়ে পদ্মজার পায়ের কাছে এসে বসলো।

ঘন্টাখানেক পার হওয়ার পর আমির ঘরে আসে। আমিরকে দেখে লতিফা বেরিয়ে যায়। আমির এক চোখে ঝাপসা দেখছে। সে ধীরপায়ে পদ্মজার পায়ের কাছে এসে বসলো। চোখ ঘুরিয়ে ঘরের চারপাশ দেখে আবিষ্কার করলো, পুরো ঘর জুড়ে গাঢ় বিষাদের ছায়া। এ ঘরে আনন্দরা আসে না অনেকদিন! আমির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পদ্মজার পায়ের আঙুল ফুটিয়ে দিল। কাঁদতে ইচ্ছে করছে তার। ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করছে। মৃদুলের মতো হাউমাউ করে যদি কান্না করা যেত! আমির ঠোঁট কামড়ে ধরে। দুই গাল বেয়ে আষাঢ়ের বৃষ্টি নামে। সেই বৃষ্টিতে পদ্মজার দুই পা স্নান করে। তাদের

জীবনের সব সুর,ছন্দ এক থাবায় কে ছিনিয়ে নিল? কেন হলো না দীর্ঘ সংসার! তবে কেন হয়েছিল,পাপ-পবিত্রের মিলন? শূন্যে অভিযোগ তুলেও উত্তর মিলে না। আমির তার চোখের জল মুছে ফেললো। তারপর পদ্মজার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে। একবার ভাবলো,পদ্মজাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরবে। তারপর আবার ভাবলো, যদি পদ্মজার ঘুম ভেঙে যায়। পাশেও শুয়ে থাকতে পারবে না। তাই চুপচাপ দূরত্ব রেখে শুয়ে থাকে। শেষ রাতে পদ্মজা ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠে। সে স্বপ্নে শুধু রক্ত দেখছে। রক্তের সাগর,রক্তের নদী,রক্তের পুকুর! পদ্মজা ভয়ে চট করে চোখ খুলে। সে ঘুমাচ্ছে না বরং বার বার পূর্ণার সাথে সাক্ষাৎ করছে! পাশ ফিরে দেখে আমির শুয়ে আছে। তার চোখ দুটি বোজা। গত দিনগুলোতে সে ঘুমায়নি। পদ্মজার সংস্পর্শে আসতেই তাকে ঘুম জেঁকে ধরেছে। পদ্মজা আমিরকে দেখে থমকায়। আমিরের এক চোখ ফুলে গেছে। পদ্মজা আলতো করে আহতস্থান ছুঁয়ে দেয়। কী যেন মনে পড়তেই অন্যদিকে ফিরে শুয়ে পড়ে। আমির চোখ খুললো। সে পদ্মজার পিঠের উপর নির্বিকারভাবে চেয়ে রইলো।

ফজরের আযানের সুর ভেসে আসে কানে। বিষাদ রাঙা ভোরের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘরের ভেতর। আমির উঠে বসে। পদ্মজা আবার ঘুমিয়েছে। ঘুমের মাঝে বিড়বিড় করছে। আমির কান পেতে শুনে,পদ্মজা পূর্ণাকে কিছু বলছে! সে তার পায়জামার পকেট থেকে লাল খামটি বের করে বালিশের কভারের ভেতর রেখে দিল। তারপর বিছানা থেকে নেমে পদ্মজার মুখের সামনে চেয়ার নিয়ে বসলো। ভোরের মায়াবী আলোয় পদ্মজার বিষণ্ন মুখটা আরো বিষণ্ন দেখাচ্ছে। আমির সাবধানে পদ্মজার কপালে চুমু দিল,হাতে চুমু দিল। তারপর মিষ্টি করে হেসে বললো,' তুমি চাও বা না চাও,পরপারে দেখা হলে আবার তোমার পিছু নেব।'

চলবে...
®ইলমা বেহেরোজ

(সতর্কতা - নিজ দায়িত্বে পর্বটি পড়বেন। এই পর্বে নৃশংস খুনের বর্ণনা রয়েছে।)

আমি পদ্মজা - ৯০ (১)

চাঁদটা ঠিক মাথার উপরে। চারিদিকে ভয়াবহ নিস্তব্ধতা। জোনাকি পোকা ও রাতের প্যাঁচা কারোর মুখে রা নেই। এমনকি বাতাসের নিজস্ব শব্দও থমকে গিয়েছে। শুধু শোনা যাচ্ছে তাণ্ডবলীলার আহবান। গাছের ডালপালার আড়াল থেকে নিশাচর পাখিরা চেয়ে আছে। তারা তেজস্বী পদ্মজার আগমন দেখছে। পদ্মজার একেকটা কদম নিশাচর পাখিদের মনে বজ্রপাতের মতো আঘাত হানছে। তার সাদা শাড়ি থেকে বিচ্ছুরিত সাদা রঙ নিশাচরদের চোখ ঝলসে দিচ্ছে। পদ্মজার এক হাতে রাম দা অন্যহাতে দঁড়ি। দঁড়ি দিয়ে বাঁধা তিনটে নেড়ি কুকুর! আচমকা কুকুরগুলো চিৎকার করে উঠলো। নিশাচর পাখিরা ভয় পেয়ে এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে গেল। গাছের ডালপালা নড়ে উঠাতে পদ্মজাসহ তিনটে কুকুর আড়চোখে উপরে তাকালো। চার জোড়া হিংস্র চোখ জ্বলজ্বল করছে! কুকুরগুলোর চোখের চেয়ে মানবসন্তান পদ্মজার চোখের দৃষ্টি ভয়ংকর! যেন চোখ নয় আগ্নেয়গিরি! এক্ষুনি আগুন ছড়িয়ে দিয়ে চারপাশ ভস্ম করে দিবে! পদ্মজা পায়ে হেঁটে ঘাস পেরিয়ে একটা পুকুরের সামনে এসে দাঁড়ালো। পুকুরের জল কুচকুচে কালো। পুকুরের চেয়ে

কিছুটা দূরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় রেইনট্রি গাছ । গাছগুলোর শত বছর বয়স। রেইনট্রি গাছের সাথে বাঁধা অবস্থায় ঘুমাচ্ছে মজিদ,খলিল,আমির,রিদওয়ান ও আসমানি।

পদ্মজা পাশ থেকে ছোট চৌকিখাট টেনে নিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় বসলো। তার শরীরের রক্ত বুদবুদ করে ফুটছে! ঘুমন্ত অমানুষগুলোকে দেখে তার ঠোঁটে তিরস্কারের মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। যখন চোখ খুলে আমির ও তার দলবল আবিষ্কার করবে, তারা বন্দী! আর সামনে তিনটে কুকুরের সাথে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মজা! তখন তাদের কেমন অনুভূতি হবে?

_____

সাত ঘন্টা পূর্বে, তখন শেষপ্রহরের বিকেল। পদ্মজা লতিফাকে পানি আনতে পাঠিয়েছে। সে রান্নাঘরে রান্না করছে। লতিফা কলপাড়ে এসে আমিরকে দেখতে পেল। আমির আলগ ঘরে প্রবেশ করেছে মাত্র। লতিফা কলসি রেখে আমিরের কাছে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো। কিন্তু দুই কদম হেঁটে এসে সে থমকে দাঁড়ায়। দ্রুত উল্টো ঘুরে কলপাড়ে চলে আসে। কলপাড়ে খালি কলসিটা স্থির হয়ে আছে। লতিফা কলসির উপর চোখ নিবদ্ধ রেখে কপাল কুঁচকায়। নূরজাহানের ঘর থেকে তিনদিন আগেই ঘুমের ঔষধ সংগ্রহ করে রেখেছিল পদ্মজা। আজ রাতের খাবার পরিবেশন করার পূর্বে খাবারের সাথে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দেয়া হবে। যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে তখন পদ্মজা আক্রমণ করবে! এই পরিকল্পনাই লতিফাকে জানানো হয়েছে। লতিফা কলপাড়ে এসে আমিরকে দেখে দূর্বল হয়ে পড়ে। তার বলে দিতে ইচ্ছে হয়,আমির যেন রাতের খাবার না খায়! কিন্তু যখন মনুষ্যত্ব জেগে উঠলো সে থেমে গেল।

আজ লতিফার একখানা বড় কাজ আছে। রিনুকে নিয়ে তার পালাতে হবে! এই বাড়িতে কিশোরী রিনু এসেছে গতবছর। তার আগেও অন্দরমহলে রিনু নামে একজন কাজের মহিলা ছিল। তিনি ডায়রিয়ায় গত হয়েছেন দুই বছর আগে। এতিম লতিফা প্রথম যখন এই বাড়িতে এসেছিল,মজিদ ও খলিলের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছিল। তারপর লতিফা ফরিনাকে সব জানায়। ফরিনা প্রতিবাদ করায় আমির সব শুনলো। আমির তার বাপ-চাচাকে নিষেধ করে লতিফাকে নির্যাতন করতে। সে চায়,তার মায়ের সেবা করা মানুষগুলো নিরাপদ থাকুক।
এরপর প্রায় দুই-তিনবছর নিরাপদে কেটে গেলেও পনেরো বছর বয়সে রিদওয়ানের মাধ্যমে লতিফা ধর্ষিতা হয়। ধর্ষণের পর লতিফা পালানোর জন্য ছটফট করেছে। দরজা বন্ধ করে দিনের পর দিন লুকিয়ে হাউমাউ করে কেঁদেছে। তারপর বেশ কয়েকবার মজিদ ও খলিলের থাবার শিকার হতে হয়েছে। দিনগুলো বিষাক্ত ছিল। পালানোর মতো জায়গা ছিল না। তাই একসময় লতিফা ভাগ্যকে মেনে নিল। সহ্য করে নিল সবকিছু। অন্দরমহলের পাশাপাশি পাতালঘরের বিশ্বস্ত সহযোগী হয়ে উঠলো। তবে গত চার বছর ধরে সে মজিদ,খলিল আর রিদওয়ানের থাবা থেকে মুক্ত। এর পিছনেও কাহিনি রয়েছে। ফরিনার প্রতি লতিফার ভালোবাসা এবং সম্মান দেখে আমির লতিফার ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। তার হুমকিতে থেমে যায় লতিফার কালরাত্রিগুলো। লতিফা বিশ্বস্ততার সাথে আমিরের গোপন আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলে। পদ্মজা, রুম্পা ও হেমলতাকে চোখে চোখে রাখা ছিল লতিফার দায়িত্ব। গত বছর কিশোরী রিনু নতুন এসেছে অন্দরমহলে। সে এ বাড়ি সম্পর্কে কিছুই জানে না। মজিদ হাওলাদার উদারতা দেখিয়ে এতিম রিনুকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। যেহেতু রিনুকে উদারতার জন্য আনা তাই রিনুকে দেখেশুনে রাখা হয়। বিয়ের জন্য পাত্রও খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু লতিফা দেখেছে,রিদওয়ানের কু-দৃষ্টি রিনুর উপরে আছে। রিনুর সাথে একই বিছানায় থাকতে থাকতে লতিফা রিনুকে আপন ছোট বোন ভাবা শুরু করেছে। সে রিনুকে ছোট বোনের মতো ভালোবাসে। রিনুকে অভিশপ্ত নিখুঁত যন্ত্রণাময় কালরাত্রিগুলো থেকে বাঁচাতে লতিফা দ্রুত পালাতে চায়। তাই আমিরের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা

সত্ত্বেও গোপন পরিকল্পনার কথা বলতে পারলো না। দমে গেল! সে কলসি রেখে দ্রুতপায়ে অন্দরমহলে চলে যায়।
রান্নাঘরে পা রাখতেই পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। সে পাথরের মতো স্থির! লতিফার হাত খালি দেখে যান্ত্রিক স্বরে বললো,' পানি কোথায়?'
লতিফা নিজের হাতে নিজের কপাল চাপড়ালো। সে কলসি রেখে চলে এসেছে। লতিফা টান টান করে হেসে বললো,' এহনি আনতাছি। খাড়াও। '
লতিফা কলসি আনতে চলে গেল। পদ্মজা এক এক করে পাতিলে মশলা ঢাললো। মুরগি কষানো হবে। পুলিশ ভোরে পূর্ণার লাশ ফেরত দিয়েছে। বাসন্তী নাকি রাতে স্বপ্ন দেখেছেন,পূর্ণা লাহাড়ি ঘরের পাশে কবর খুঁড়ছে। তাই তিনি সবাইকে অনুরোধ করেছেন,পূর্ণার কবর যেন লাহাড়ি ঘরের পাশে গোলাপ গাছটির নিচে হয়। বাসন্তীর কথা রাখা হয়। পূর্ণা তার প্রিয় গোলাপ গাছটির নিচে পরম শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। পদ্মজা আজও কাঁদলো না। সে চুপচাপ কোরান শরীফ পড়েছে। তারপর পূর্ণাকে কবর দেয়া হলে অন্দরমহলে ফিরে এসেছে। এ নিয়ে সমাজে নানান কথা হচ্ছে। পদ্মজার ব্যবহারে অবাক হয়েছে প্রেমা,বাসন্তী ও প্রান্ত। মৃদুলের অবস্থা নাজেহাল। তাকে হাজার টেনেও পূর্ণার কবর থেকে সরানো যাচ্ছে না। খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। মৃদুলের মা জুলেখা বানু ছেলের পাগলামি দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মোড়ল বাড়ির অবস্থা করুণ! পদ্মজা ভাবনা ছেড়ে কাজে মন দিল। লতিফা কলসি নিয়ে দৌড়ে আসে। তারপর মেঝেতে কলসি রেখে বললো,' লও পানি।'
পদ্মজা পূর্বের স্বরেই বললো,' যা যা আনতে বলেছিলাম,আনা হয়েছে?'
'হ,আনছি।'
'রিনু ব্যাগ গুছিয়েছে?'
'হ,গুছাইছে।'
'রিনুকে ডাকো।'
লতিফা রান্নাঘর থেকে গলা উঁচু করে ডাকলো,' রিনুরে...ওই রিনু।'
রিনু আশেপাশেই ছিল। লতিফার ডাক শুনে দ্রুত হেঁটে আসে। সে গতকাল থেকে আতঙ্কে আছে। ভয়ে রাতে ঘুমাতে পারেনি। রিনুর সামনের দাঁতগুলো উঁচু। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। কিন্তু মনটা সাদা। সরল-সহজ একটা মেয়ে। রিনু এসে বললো,' হ, আপা?'
পদ্মজা বললো,' রাতে বের হয়ে যাবি লুতু বুবুর সাথে। পথে একদম ভয় পাবি না। আমি লুতু বুবুকে কিছু টাকা দিয়েছি আর একটা ঠিকানা দিয়েছি। আল্লাহ সহায় আছেন। বিসমিল্লাহ বলে বের হবি। পথে আল্লাহকে স্মরণ করবি বেশি বেশি। ইনশাআল্লাহ কোনো ক্ষতি হবে না।'
রিনু বাধ্যের মতো মাথা নাড়াল। লতিফা পদ্মজাকে বললো,' তোমারে ওরা কিচ্ছু যদি করে?'
পদ্মজা উত্তর দিল না। লতিফা উত্তরের আশায় তাকিয়ে রইলো। অনেকক্ষণ পর পদ্মজা বললো,' আমার ঘর থেকে কাপড়ের ব্যাগটা নিয়ে পুকুরপাড়ের আশেপাশে কোথাও রেখে আসো। এখন আরেকটু পেঁয়াজ, রসুন বাটো।'
'রাইখা আইছি। সব কাম শেষ। গোয়ালঘরের পিছনে তিনডা কুত্তা বান্ধা আছে। চিল্লাইছে অনেকক্ষণ, খাওন দিছি এরপরে থামছে। আর ওইযে আলমারিডার পিছনে একটা বৈয়াম আছে। ওইডার ভিতরে রিনু বিষ পিঁপড়া ভরছে। এইডাও একটু পরে রাইখা আমুনে।'
'মরে যাবে না?'
'না। বৈয়ামের মুখ কাপড় দিয়া বাইন্ধা রাখছি। ভিত্রে(ভিতরে)মাডিও আছে।' বললো রিনু।
পদ্মজা,লতিফা ও রিনু তিনজনে মিলে রান্নাবান্না শেষ করলো। আমিনা সদর ঘরে আলোকে নিয়ে খেলছেন। তার জীবন আলোতে সীমাবদ্ধ। আর কিছুতে পরোয়া করেন না। আগে ঘরের ব্যাপারে হলেও কথা বলতেন। এখন তাও করেন না। সারাদিন আলোর সাথে কথা বলেন। মনের ব্যথা

আলোকে শোনান। আলো কিছু বুঝে না। শুধু হাসে। আলোর হাসিটাই আমিনার সঙ্গী। রিনু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। মিনিট দুয়েকের মাঝে দৌড়ে ফিরে আসে। পদ্মজাকে জানায়,' রিদওয়ান ভাইজানে আইতাছে। লগে একটা ছেড়ি।'
পদ্মজার হাত থেমে যায়! তাহলে সেই নারী? যে পূর্ণাকে হত্যা করতে সাহায্য করেছে! রিনু এক হাত দিয়ে অন্য হাত চুলকাতে থাকলো। সে রিদওয়ানকে আগে ভয় পেত,এখন নাম শুনলেই কাঁপে। লতিফা রিনুর অস্বস্তি,ভয় খেয়াল করে বললো,' রিনু ঘরে যা। দরজাডা লাগায়া দিবি।'
লতিফার বলতে দেরি হয়,রিনুর ঘরে চলে যেতে দেরি হয় না।

রিদওয়ান সদর ঘরে প্রবেশ করে আসমানিকে বললো,' আমার লগে থাকবা না অন্য ঘর লইবা?'
রিদওয়ানকে দেখেই আমিনা আলোকে নিয়ে ঘরে চলে যান। আসমানি নিকাব তুলে চোখ বড় বড় করে বললো,' বাড়ির ভিত্রে(ভিতরে) তোমার লগে থাকুম? আইছি যে এইডাই বেশি। এমনিতে ডর লাগতাছে আমার।'
'তখন রানি,কাকি এরা ছিল। এখন তো নাই। যারা আছে এরা থাকা আর না থাকা সমান।'
আসমানি চারপাশ দেখে বললো,' পদ্মজা কই?'
আসমানির চোখমুখ দেখে দাত কেলিয়ে হাসলো রিদওয়ান। বললো,' বাবুর বউ পাগল হইছে। মাথা ঠিক নাই। ভয় পেও না।'
আসমানি চারপাশ দেখতে দেখতে বললো,' মাথা ঠিক নাই দেইখাই তো ডর বেশি।'
রিদওয়ান আসমানির সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো। বললো,' আজিদ ফিরবে কোনদিন?'
'মা রে লইয়া শহরে গেছে। আইতে চাইর-পাঁচদিন তো লাগবই।'
'তাহলে কয়দিন আমার সাথে থাকো।'
আসমানি রিদওয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। রান্নাঘর থেকে টুংটাং শব্দ আসছে।
আসমানি বললো,'পদ্মজা যদি জিগায়,আমি কার কী লাগি?'
'তোমাকে চিনে না? বাড়ির কাছে থাকো,আজিদের বউ হিসেবে দেখেনি কখনো?'
'না।'
'তাইলে কিছু বলার দরকার নাই। প্রশ্ন করলে উত্তর দিও না।'
'সন্দেহ করলে?'
'সন্দেহ করলেই কী? না করলেই কী? পদ্মজার দাম আছে আর?'
'আইচ্ছা ছাড়ো,আমি পদ্মজারে দেইখা আইতাছি।'
আসমানি রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়। সে চোখ বুলিয়ে চারপাশ দেখছে। এই বাড়িতে আসার অনেক ইচ্ছে ছিল তার। কখনো আসতে পারেনি। এই প্রথম আসতে পেরেছে। অন্যবার সোজা পাতালঘরে যেত। লুকোচুরি লুকোচুরি খেলাটা কমেছে বলে ভালো লাগছে। এখন হয়তো প্রতিনিয়ত অন্দরমহলে আসা হবে! লুকিয়ে ভাঙা ফটক দিয়ে পাতালঘরে যেতে হবে না।

আমির ধানের বস্তায় পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে। ঘরের অর্ধেক অংশ জুড়ে ধানের বস্তা রাখা হয়েছে। বস্তাগুলো বাঁশের মাচার উপর। মাটি স্যাঁতসেঁতে। এই ঘরটায় খুব দরকার ছাড়া কেউ আসে না। আবছা অন্ধকারে আমিরের মুখটা অস্পষ্ট। তার হাতে পদ্মজার বেনারসি। বুকটা ধড়ফড় ধড়ফড় করছে। আর মাত্র কয়টা ঘণ্টা! ইশ,যদি থেকে যাওয়া যেত! আফসোসে বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোনো পথ নেই। সব পথ বন্ধ। হয় আগুনে ঝলসে যেতে থাকো নয় মৃত্যু গ্রহণ করো। কী নিষ্ঠুর শর্ত! আমির পদ্মজার বেনারসির দিকে তাকালো। ধূলোর আস্তরণে বন্দী হয়ে গেছে সব স্বপ্ন-আশা! চোখে ছবির মতোন দৃশ্যমান হয়,পদ্মজার লাজুক মুখখানা। তার

দুধে আলতা ছিমছিমে গড়নে খয়েরী রঙটা কী ভীষণ মানাতো! বর্ষাকালের শুক্রবার মানেই ছিল, বৃষ্টিতে ভেজা। আমির ঘন্টার পর ঘন্টা পদ্মজাকে একধ্যানে দেখেছে। মুখস্থ করে নিয়েছে তার প্রতিটি পশমের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ। আমির কল্পনা থেকে বেরিয়ে বেনারসিতে চুমু দিল। সীমাহীন যন্ত্রণা থেকে বললো,'যখন তোমার কথা ভাবি, তখন আমার শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা বাজতে থাকে। আমাদের পথটা কি আরেকটু দীর্ঘ হতে পারতো না?'
আমির উত্তরের আশায় বেনারসির দিকে তাকিয়ে রইলো। তার ঠোঁট দুটো বাচ্চাদের মতো ভেঙে আসে। একটু কথা বলুক না...বেনারসিটি একটু কথা বলুক! আমির ভেজা গলায় আবার বললো,'তোমার জন্য বুকটা পুড়ে যাচ্ছে। তোমায় ছোঁয়ার সাধ্যি,দেখার সাধ্যি কেন নেই আমার?' বেনারসি নিশ্চুপ! সে বোবা,প্রাণহীন। আমির চোখ বুজে বস্তায় হেলান দিল। গত কয়দিনে পদ্মজার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ কানে বাজছে। যখন পদ্মজার বলা, ' একবার...একবার নিজের মা-বোনকে মেয়েগুলোর জায়গায় দাঁড় করিয়ে ভাবুন। একবার আমাকে মেয়েগুলোর জায়গায় ভেবে দেখুন।' কথাগুলো কানে বাজলো তখন চোখের পর্দায় ভেসে উঠে পদ্মজার নগ্ন শরীর। তার সারা শরীরে ছোপ ছোপ দাগ। একটা ছায়া পদ্মজার শরীরে চাবুক মারছে। পদ্মজা আর্তনাদ করার শক্তিটুকু পাচ্ছে না। শুধু গলা কাটা গরুর মতো কাতরাচ্ছে।
আমির ছায়াটির গলা চেপে ধরার জন্য হাত বাড়ায়। কিন্তু একি! ছায়াটিকে ছোঁয়া যাচ্ছে না! আমির দ্রুত চোখ খুলে ফেললো। তার মুখ থেকে অস্পষ্ট উচ্চারণ হয়,পদ্মজা! আমির চট করে উঠে দাঁড়ায়। বুকের ভেতর আগুন লেগে গেছে। ভেতরটা ভস্ম হয়ে যাচ্ছে। শরীর দিয়ে যেন ধোঁয়া বের হচ্ছে। সে শার্ট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দূরে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। শরীরের শিরা-উপশিরায় তাণ্ডব শুরু হয়ে গিয়েছে। এই যন্ত্রণা আমির নিতে পারে না। সেই দুই হাতে নিজের চুল টেনে ধরলো। বিগত দিনগুলো তাকে নরকীয় শাস্তি দিয়েই চলেছে। চোখগুলো আজেবাজে দেখছে। মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরন আজেবাজে ভাবছে। পদ্মজা,পদ্মজা,পদ্মজা...এই পদ্মজাতে কী শক্তি লুকিয়ে আছে? এই একটিমাত্র নাম তাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। বিষাক্ত করে তুলেছে প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস। আমির টিনের দেয়ালে এক হাত রেখে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে।
মজিদ ক্লান্ত হয়ে আলগ ঘরে বসলেন। এখানে প্রচুর আলো-বাতাস আসে। লতিফা মজিদকে আসতে দেখে,দ্রুত শরবত আর পান-সুপারি নিয়ে আসে। মজিদের সামনে এসে বসে রিদওয়ান ও খলিল। মজিদ শরবত পান করে লতিফাকে প্রশ্ন করলেন,'পদ্মজা কথাবার্তা বলছে?'
লতিফা নতজানু অবস্থায় উত্তর দিল,'হ,কইছে।'
রিদওয়ান লতিফাকে বললো,'যে মেয়েটা আসছে দেখে রাখবি। যত্ন নিবি।'
লতিফা বাধ্যের মতো বললো,'আইচ্ছা,ভাইজান।'
খলিল বললেন,' আসিদপুর থাইকা যে বড় পাটিডা আনছিলাম, পুশকুনিপাড়ে ওইডা বিছাবি।'
'বিছাইছি খালু। এশারের আযানডার পরে সব খাওনদাওন দিয়া আমু।'
'ভালা করছস।' খলিল পান মুখ পুরে বললেন।
লতিফা শরবতের খালি গ্লাস নিয়ে চলে গেল। মজিদ আরো দুই গ্লাস পানি পান করলেন। তিনি ভীষণ ক্লান্ত। সারাদিন দৌড়ের উপর ছিলেন। রিদওয়ানের ভুল আপাতত মগার উপর ঘুরে গিয়েছে। মগা গতকাল থেকে বাড়িতে নেই। আবার শেষবার মগার সাথে পূর্ণা ছিল। সবার জবানবন্দির ভিত্তিতে আপাতদৃষ্টিতে মগা খুনি! পুলিশ হাওলাদার বাড়ির দারোয়ানকে খুঁজেছে। মোড়ল বাড়িতে পুলিশ এসেছে শুনেই রিদওয়ান দারোয়ান মুত্তালিবকে হত্যা করেছিল। তাই পুলিশ মুত্তালিবকে পেল না। মজিদ হাওলাদার পুলিশকে বলেছেন,তিনি ধারণা করছেন দারোয়ান ও মগা পরিকল্পনা করে পূর্ণালে ধর্ষণ করার পর হত্যা করেছে। পুলিশ এখন দারোয়ান মুত্তালিব ও মগাকে খুঁজছে।

রিদওয়ান নিরাপদে আছে। খলিল মজিদকে বললেন,' ভাইজান, কিছু ভাবছেন?'
'কী নিয়ে?' মজিদের নির্বিকার স্বর।
রিদওয়ানের ভ্রুকুটি হয়ে গেল। সে চারপাশ দেখে বললো,' আপনি এতো নির্বিকার কেন চাচা? আজ আমিরকে খুন করার কথা ছিল।'
মজিদ এক হাত তুলে রিদওয়ানকে চুপ করতে ইশারা করলেন। তারপর বললেন,'বাবু যদি আমাদের কথা না শুনে তখন ব্যবস্থা নেব। তার আগে না।'
রিদওয়ানের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সে নাছোড়বান্দা স্বরে বললো,' আমির কখনোই পদ্মজাকে খুন করবে না,শেকল বন্দীও করবে না!'
মজিদ গম্ভীর স্বরে বললেন,'দেখা যাবে।'
রিদওয়ান খলিলের দিকে তাকালো। তারপর অধৈর্য্য হয়ে মজিদকে বললো,' আমিরের জন্য আমাদের ক্ষতি না হয়ে যায়!'
মজিদ খলিলকে বললেন,' দেখ তো আশেপাশে কেউ আছে নাকি। ঘরগুলোও দেখবি।'
আমির মাত্র বের হতে যাচ্ছিল। মজিদের শেষ কথাটা কানে আসতেই সে দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। খলিল আলগ ঘরের প্রথম দুটো ঘর দেখে এসে বললেন,'কেউ নাই।'
তারপর চেয়ারে বসলেন। রিদওয়ান খলিলের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে মজিদকে বুঝাতে। খলিল মজিদের আরেকটু কাছে এসে বসলেন। তারপর বললেন,'রিদু কিন্তু হাচা কইতাছে ভাইজান। বাবুরে দিয়া আর ভরসা নাই।'
মজিদ রিদওয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন,'তুই কী বোঝাতে চাচ্ছিস? বাবু আমাদের খুন করে পদ্মজাকে নিয়ে সংসার করতে চাইবে?'
রিদওয়ান তড়িৎ গতিতে বললো,'এটা কি সম্ভব না কাকা? আলমগীর ভাই কী করলো?'
মজিদ নির্লিপ্ত কণ্ঠে খলিলকে বললেন,' খলিল,তোর ছেলের বুদ্ধি এখনো হাঁটুতে আছে।'
রিদওয়ান উঠে দাঁড়ায়। তার মাথা চড়ে যাচ্ছে। মজিদ বললেন,'তুই আমার পাশে বস। তোর মাথায় কিছু কথা ঢোকাতে হবে।'
রিদওয়ান মনের বিরুদ্ধে আবার বসলো। মজিদ বললেন,'চুপ করে আমার কথা শোন। আলমগীর আর বাবুর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। পাতালঘরের রীতি পূর্বপুরুষ থেকে পেলেও, নারীপাচার চক্রটার সৃষ্টি বাবুর। এই চক্রে আলমগীর, তুই, আমি আর খলিল বাবুর দলের একটা অংশমাত্র। আমরা সরে গেলে আমাদের উপর রাগ একমাত্র বাবুই ঝাড়তে পারবে। কিন্তু এই চক্রের শুরুটা যে করেছে সে হচ্ছে নেতা। গত সপ্তাহে বাবু ঢাকা থেকে একটা খাম নিয়ে আসছে। খামের চিঠিতে স্পষ্ট লেখা আছে,ছয় মাস পর বাবু নিজ দায়িত্বে ষোলটা মেয়ে সিঙ্গাপুরে পাঠাবে। সার্নার জনের সাথে তিন মাস আগে থেকে চুক্তিবদ্ধ বাবু। বাবুর সাক্ষর আছে চিঠিতে। বাবু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'
রিদওয়ান বললো,'পড়ছি আমি। কিন্তু টাকা কী করছে? আমাদের তো দেয়নি।'
মজিদ বিরক্তিতে কপাল কুঁচকালেন। তিনি কথার মাঝে কথা বলা একদম পছন্দ করেন না। বললেন 'হয়তো কাজশেষে দিত। আমার পুরো কথা শোন। কথার মাঝে কথা বলবি না।'
রিদওয়ান মাথা নাড়াল। মজিদ বললেন,'এখন বাবু যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করে এর পরিণতি কেমন হবে ধারণা আছে? বিদেশের কত মানুষের সাথে ও কাজ করছে হিসাব আছে? সবার বিরুদ্ধে ছোটখাটো প্রমাণ হলেও বাবুর কাছে আছে। আর এই দেশে কি একমাত্র বাবু মেয়ে পাচার করে? আরো আছে। কম হলেও আট-নয় জন দলনেতার সাথে বাবুর ভালো পরিচয় আছে। যেখানে এই দেশ পরিচালনা করা একজন নেতা এই চক্রের সাথে জড়িত আর বাবুর তার সাথে যোগসূত্র আছে, সেখানে বাবু পালিয়েছে যদি জানতে পারেন তিনি বাবুকে ছেড়ে দিবেন না। সব রকম ব্যবস্থা নিবেন। সম্মানহানির ভয় পাবেন,সব প্রকাশ হওয়ার ভয় পাবেন। বাবুর সাথে পদ্মজার

ক্ষতি করবেন। পদ্মজা সুন্দর। বাবুর সামনে পদ্মজার বেইজ্জতি হওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ আছে। আরো কত ক্ষমতাশীল লোক বাবুর সাথে এই কাজে জড়িত আছে। যতদিন বাবু এই কাজে নিজেকে রাখবে ততদিন ভালো থাকবে। ছাড়তে চাইলেই সর্বনাশ। বাবুর বুদ্ধি তোর মতো না রিদু। ও আর যাই করুক পালিয়ে যাওয়ার মতো বোকামি করবে না। এতোটা বোকা বাবু না। যদি সত্যি বাবু পদ্মজাকে ভালোবেসে থাকে ও ভুলেও পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিবে না। এই চক্রের সাথে জড়িত সবাই একজোট! বাবু পালানোর চেষ্টা করলে ও একা হয়ে যাবে। সবাই ঠিক ধরে ফেলবে বাবুকে। আর বাবু ধরা পড়লে পদ্মজাও ধরা পড়বে। পদ্মজা একবার ধরা পড়লে চোখের পলকে ভোগের বস্তু হয়ে যাবে।'

'পালিয়ে কোথাও না গিয়ে পুলিশকে সব খুলে বললেই তো ও নিরাপত্তা পেয়ে যাবে! আর ফেঁসে যাবো আমরা আর অন্যরা!'

মজিদ বোকা রিদওয়ানের পিঠ চাপড়ে বললেন,' পুলিশ কয়জনকে ধরবে? আমির নিজেও পুলিশের হাতে ধরা পড়বে। ফাঁসিও হবে। নিজের মৃত্যু নিজে টেনে আনবে। তো কী হলো? কিছু কিছু কাজ আছে,যেগুলোতে একবার প্রবেশ করে ঘাঁটি সৃষ্টি করে ফেললে আর সেখান থেকে বের হওয়া যায় না। বাবু তেমনই চিপায় আছে। যদি পালাতে চায় নিজের সাথে পদ্মজার ইজ্জত আর জীবন হারাবে। এই ঝুঁকি নেয়ার সাহস বাবুর হবে না। আমি নিজের চোখে ঢাকায় দেখেছি, পদ্মজা অসুস্থ হয়ে ঘরে ঘুমাচ্ছে আর আমির বাড়ির সব কাজ করছে। পদ্মজার জন্য হলেও বাবু পাতালঘর আর আমাদের আঁকড়ে ধরে রাখবে।'
'দেশে কি জায়গার অভাব আছে? কোথাও না কোথাও ঠিক লুকিয়ে থাকতে পারবে।'
'ওর কাজ করতে হবে না? ঘরে বসে খাবে? তুই নিজ চোখে দেখেছিস, আমির কীভাবে মাত্র দশ দিনে আলীকে রাজশাহী থেকে ধরেছে। আলীর পালিয়ে যাওয়া আমিরের জন্য হুমকি ছিল। তাই চিরুনি অভিযান চালিয়ে ঠিক খুঁজে বের করছে। আমিরের অভিজ্ঞতা আছে। আমির পদ্মজাকে নিয়ে এতো বড় ঝুঁকি নিবে না। আমির চিনে তার পেশার রক্ত কেমন! এতদিন অন্য মেয়েদের পিটিয়েছে। তখন নিজের বউকে পিটাতে দেখবে।'
মজিদ থামলেন,দাঁত বের করে হাসলেন। এতো কথাতেও রিদওয়ানের মনে শান্তি এলো না। সে দুইহাত তুলে বললো,' আচ্ছা ধরলাম,আমির পালাবে না। কিন্তু পদ্মজাকে বেইজ্জতি করার জন্য আমাদের খুন করবে না তার নিশ্চয়তা আছে?'
মজিদ হাওলাদার এবার রেগে গেলেন। বললেন,'বাবুর যখন এই কাজের সাথে থাকতেই হবে তখন আমাদের খুন করে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারবে না। খলিল তোর ছেলেরে নিয়ে যা। তারপর গোয়ালঘর থেকে কতোটা গোবর খাইয়ে দে।'
অপমানে রিদওয়ানের মুখটা থমথমে হয়ে যায়। সে ঘনঘন নিঃশ্বাস নিতে থাকলো। আমিরের জায়গাটা সে কিছুতেই দখল করতে পারছে না!ব্যর্থ হচ্ছে বার বার। রিদওয়ান চেয়ারে লাথি দিয়ে, চলে গেল। খলিল বললেন,' ভাইজান,আসমানিরে আনা কি ঠিক কাম হইলো?'
'একদম না। রিদওয়ান আবার আরেকটা ভুল করলো। বাড়িতে কেউ নাই বলে,ঝুঁকি নিয়ে যা ইচ্ছে করছে। আবার বিপদে পড়লে আমার পা যেন না চাটে বলে দিস।'
খলিল মুখ থেকে পানের পিচকিরি ফেলে বাইরে চোখ নিবদ্ধ করলেন।

ক্রোধে-আক্রোশে আমিরের কপালের রগ ভেসে উঠে। চোখ দুটি রক্তবর্ণ ধারণ করে। সে রাগে এক হাতে দরজা চেপে ধরলো। তার দূর্বলতা ধরতে পেরে মজিদের আনন্দ হচ্ছে! মজিদের হাসি দেখে আমিরের গা জ্বলে যাচ্ছে। সে একবার ভাবলো এক্ষুনি গিয়ে মজিদের গলা চেপে ধরবে।

কিন্তু পরক্ষণে কী ভেবে থেমে গেল। চলে এলো ধান রাখার ঘরে। ধানের মাচার ভেতর উঁকি দিয়ে দেখলো,চাপাতি আর রাম দা ঠিকঠাক আছে নাকি। হ্যাঁ,ঠিকঠাক আছে! আমির স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। জানালা খুলে বাইরে তাকাতেই বিকেলের রঙহীন ধূসর কুয়াশা চোখে পড়ে।

পদ্মজা পালঙ্কের উপর গাঁট হয়ে বসে আছে। এশারের নামায আদায় করে মাত্রই উঠেছে। তার পরনে সাদা শাড়ি। লতিফা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে পদ্মজাকে জানালো,সে পুকুরপাড়ে খাবার রেখে এসেছে। বেশ সুন্দর করে সাজানো হয়েছে চারপাশ। মজিদ,খলিল,আমির,রিদওয়ান ও আসমানি এখুনি যাবে। পদ্মজা নিস্তেজ গলায় বললো,'ওরা ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে ডেকো।'
তার শান্ত স্বর ! কথা শুনে মনে হচ্ছে,পদ্মজা লতিফাকে ঘর ঝাড়ুর জন্য অথবা রান্না করার জন্য ডাকতে বলেছে! লতিফা দৌড়ে বেরিয়ে গেল। তার বুকের ভেতর দামামা বাজছে। মনে হচ্ছে, যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে। এ তো সত্যিই যুদ্ধ! লতিফার ঘাম হচ্ছে।চাপা একটা আনন্দও কাজ করছে! কী অদ্ভুত!
রান্নাঘরে আসমানি গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু পদ্মজাকে কথা বলাতে পারেনি। পদ্মজা একটাও জবাব দেয়নি। সে আসমানিকে পুরোদমে এড়িয়ে গিয়েছে। আসমানি নিরাশ হয়ে বেরিয়ে যায়। তারপর আর তাদের দেখা হয়নি। পদ্মজা বিছানা থেকে নেমে শক্ত করে হাত খোঁপা করলো। জানালা গলে চাঁদের আলো পদ্মজার পায়ের উপর পড়ে। নিখুঁত কালো রাতকে চাঁদ তার নরম আলোয় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পদ্মজা চাঁদের আলোকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। ছোঁয়া গেল ঠিকই অনুভব করা গেল না। পদ্মজার কানের পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে বাতাস উড়ে যায়। সে বাতাসের শীতলতাকে আগুনের আঁচের মতো অনুভব করছে!

তারা পাঁচ জন গোল হয়ে বসেছে। খাবারের সুন্দর ঘ্রাণে চারপাশ মৌ মৌ করছে। রান্নার ঘ্রাণ শুনেই আমির বুঝে গেল,সব পদ্মজা রান্না করেছে! সে নিজেকে সামলাতে পারলো না। সবার আগে খাওয়া শুরু করলো। আগে তাদের হালকা-পাতলা আলোচনা করার কথা ছিল। তারপর খাওয়া দাওয়া করে ভবিষ্যত পরিকল্পনা করবে। কিন্তু আমির নিয়ম ভঙ্গ করে শুরুতেই খাওয়া শুরু করে। অগত্যা বাকিরাও খাওয়া শুরু করলো। তাদের চেয়ে কয়েক হাত দূরে টলটলে জলের বিশাল পুকুর। জলের রঙ কালো। আশেপাশে কোনো ফুলের গাছ আছে। একটা মিষ্টি ঘ্রাণ ভেসে আসছে। কালো জলের পুকুরটির পাঁচিশটি সিঁড়ি। এই পুকুর নিয়ে অনেক গুজব রয়েছে। যদিও সব মিথ্যে। বাড়ির মেয়েরা এদিকটায় কখনো আসেনি। মজিদ হাওলাদারের ভীষণ প্রিয় এই জায়গাটা। তার দাদা এই জায়গাটাতে সবসময় ভোজ আসর করতেন। মজিদের ইচ্ছে ছিল চাঁদের রাতে পুকুরের পাশে বসে ভোজ আসর উপভোগ করার। কিন্তু সম্ভব হয়নি! মজিদ হাওলাদারের দাদা নিজের বউকে ভূতে ধরা পাগল প্রমাণ করার জন্য গুজব রটিয়ে দেন। সেই গুজব ধরে রাখতে মজিদ হাওলাদারও এদিকটায় আসেননি কখনো। আজ বাড়ি খালি হওয়াতে সেই সুযোগ মিলেছে। তিনি গতকালই দুজন লোক দিয়ে জায়গাটা সুন্দর করে পরিষ্কার করেছেন। চোখ জুড়িয়ে দেয়ার মতো দৃশ্য হয়েছে!
একটু দূরেই ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি পোকা উড়ছে। মাথার উপর চাঁদের আলো। চারপাশে চারটি হারিকেন। চমৎকার পরিবেশ। খলিল মুরগির রানে কামড় দিয়ে বললেন,' বাবু,সারাদিন কই থাহছ?'
আমির ছোট করে উত্তর দিল,'এখানেই।'
মজিদ আমিরকে আগাগোড়া পরখ করে নিয়ে বললেন,'কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছিস?'
'না,আব্বা।' বললো আমির।

রিদওয়ান কিছু বলতে আগ্রহী নয়। সে চুপচাপ খাচ্ছে। তার চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ। আসমানি আমিরের পাশ ঘেঁষে বসলো। বললো,' পরের কামে কয়দিনের সময় দিছে?'
'অনেকদিন।'
'এইবার ভৈরবে নিশানা রাইখো। ওইহানে সুযোগ সুবিধা আছে অনেক।'
মজিদ আসমানির সাথে তাল মেলালেন,'আমিও ভৈরবের কথা বলতাম।'
আমির রিদওয়ানের দিকে তাকিয়ে বললো,'এই কাজ রিদওয়ান নিক। আজিদ আর হাবুরে নিয়ে কয়দিনের জন্য ট্রলার নিয়ে ভৈরবে চলে যাবে।'
রিদওয়ান না চাইতেও সম্মতি জানালো। আমির আড়চোখে পিছনে তাকালো। তার চেয়ে পাঁচ হাত দূরে একটা রেইনট্রি গাছ। গাছটির পিছনে সে চাপাতি আর রাম দা রেখেছে। আরেকটু রাত বাড়লে যখন সবাই ক্লান্ত হয়ে যাবে,নেশা করবে তখন সে আক্রমণ করবে। দুই হাতে দুই অস্ত্র নিয়ে রিদওয়ান ও মজিদকে আঘাত করা তার লক্ষ্য। তারপর খলিল ও আসমানি বাঁ হাতের খেল! আমির চুপচাপ প্রহর গুণতে থাকে।

খাওয়া শেষে প্লেটগুলো দূরে রাখা হয়। প্লেটগুলো সরানোর জন্য মজিদ চারপাশে চোখ বুলিয়ে লতিফাকে খুঁজলেন। লতিফা আশেপাশে নেই।
অন্যবার তো থাকে। আজ কোথায়? মজিদ বিরক্ত হলেন। তিনি মনে মনে লতিফাকে একটা নোংরা গালি দিলেন। তারপর পরবর্তী ডিল নিয়ে কথাবার্তা শুরু করলেন। কীভাবে এগোতে হবে কোন এলাকায় যেতে হবে,বর্তমান পরিস্থিতি কীভাবে স্বাভাবিক করা যায়। এসব নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। রিদওয়ান চোখমুখ কুঁচকে বসে আছে। মজিদ হাওলাদার আমিরকে কী প্রশ্ন করবেন বলেছিলেন। তাও করছে না। এই বুড়ো আবার গুটি পাল্টে দিয়েছে। আমির কথা কম বলছে। সে মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায়! কিন্তু তার সুযোগ আসার পূর্বেই সে এবং বাকিরা ঘুমের কাছে হেরে যায়। এতোই ঘুম পেয়েছিল যে,তাদের শরীর অন্দরমহলে যাওয়া অবধি ইচ্ছেশক্তি পায়নি।
লতিফা কিছুটা দূরে অন্ধকারে লেবু গাছের আড়ালে বসে ছিল। মশা কামড়ে তার হাত-পা বিষিয়ে দিয়েছে। যখনই দেখলো ভোজ আসরের পাঁচজনই ঘুমিয়ে পড়েছে,তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। সে ছুটে যায় অন্দরমহলে। পদ্মজা সদর ঘরে শান্ত হয়ে বসেছিল। লতিফা হাঁপাতে হাঁপাতে সব জানালো। তারপর তারা লুকিয়ে রাখা দঁড়ি আর ওড়না নিয়ে চলে আসে পুকুরপাড়ে। পদ্মজা, লতিফা ও রিনু মিলে ঠান্ডা মাথায় মজিদ,খলিল,আমির,রিদওয়ান এবং আসমানির হাত-পা ও মুখ বেঁধে ফেললো। তারপর এক এক করে টেনে নিয়ে গেল রেইনট্রি গাছের সামনে। পাঁচজনকে পাঁচটি গাছের সাথে বেঁধে তারা স্থির হয়ে দাঁড়ালো।
লতিফা,রিনু ঘেমে একাকার। রিনু তো ভয়ে তরতর করে কাঁপছে। এমন একটি দুঃসাহসিক কাজে অংশগ্রহণ করে সে হতভম্ব! পদ্মজা বললো,' এবার তোমরা বেরিয়ে যাও।'
লতফা ও রিনু দুজনের গায়েই বোরকা ছিল। তারা ব্যাগ নেয়ার জন্য অন্দরমহলে দৌড়ে যায়। পদ্মজা বিদায় জানাতে অন্দরমহলে আসে। বের হওয়ার পূর্বে রিনু ও লতিফা পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে দিল। লতিফা বিষণ্ন গলায় বললো,' আবার দেখা হইবো তো পদ্ম?'
'আল্লাহ চাইলে,আবার আমাদের দেখা হবে বুবু।'
'সামলাইতে পারবা সব?'
'পারবো। তুমি বেরিয়ে যাও। আর দেরি করো না।'
লতিফা এক হাতে ব্যাগ নিয়ে অন্য হাতে রিনুর হাত ধরলো। তারপর ছলছল চোখে পদ্মজাকে একবার দেখে বেরিয়ে পড়লো অচেনা গন্তব্যে। আমিনা সদর ঘর থেকে সবকিছু দেখেছেন।

এতদিনের পুরনো কাজের মেয়ে চলে যাচ্ছে কেন? তিনি প্রবল আগ্রহ থেকে পদ্মজাকে প্রশ্ন করলেন,' লুতু কই যাইতাছে?'
পদ্মজা শান্ত স্বরে বললো,' শহরে যাচ্ছে।'
'ওমা! কার কাছে?'
'আপনি ঘরে যান। সকাল হওয়া অবধি বের হবেন না।'
আমিনা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন,'কেরে?'
পদ্মজা তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো,বললো,' এতদিন যেরকম নির্জীব ছিলেন আজও থাকুন।'
পদ্মজা রান্নাঘর থেকে হাতে রাম দা তুলে নিল। তারপর আমিনাকে জোর করে ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। দরজা বন্ধ করার আগে আমিনার উদ্দেশ্যে বললো,'যদি কোনো শব্দ করেন আপনার মাথা শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাবে।'
তারপর পদ্মজা রাম দা নিয়ে গোয়ালঘরে গেল। সেখান থেকে তিনটে নেড়ি কুকুর নিয়ে পুকুরপাড়ের পথ ধরলো।

_____
নিশীথে পাঁচজন মানুষ বাঁধা অবস্থায় মাথা ঝুঁকে ঘুমাচ্ছে। আর সামনে রাম দা নিয়ে এক রূপসী বসে আছে। পাশে তিনটে কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটি ভয়ংকর। সুনসান নীরবতায় কেটে যায় ক্ষণ মুহূর্ত। আর সময় নষ্ট করা যাবে না। তারা বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। মৃত্যু উপভোগ না করে অমানুষগুলো মরে যাক পদ্মজা চায় না। সে দুই জগ পানি পাঁচ জনের মাথার উপর ঢেলে দিল। তাতেও তাদের ঘুম ভাঙলো না। পদ্মজা রাম দার শেষ প্রান্ত দিয়ে পর পর পাঁচজনের পায়ের তালুতে আঘাত করলো। এতে কাজ হয়। তারা সক্রিয় হয়। পাঁচ জনই আধবোজা চোখে তাকায়। তাদের ঘুমের ঘোর এখনো কাটেনি। মাথা ভারী হয়ে আছে। ভনভন করছে। পদ্মজা চৌকিখাটের উপর গিয়ে বসলো। রিদওয়ান পদ্মজাকে ঝাপসা ঝাপসা দেখছে। সে চোখ বুজে আবার তাকালো। পদ্মজার হাসি হাসি মুখটা ভেসে উঠে। তার হাতে রাম দা। জ্বলজ্বল করছে পদ্মজার পাশের তিনটে কুকুরের চোখ! রিদওয়ান চমকে গেল। মজিদ,খলিল এবং আসমানি যখন পরিস্থিতি বুঝতে পারলো তারাও চমকে যায়। তারা কথা বলতে গেলে 'উউউ' আওয়াজ বের হয়। উঠতে গেলে টের পায় তাদের হাত-পা বাঁধা।

(দুঃখিত পর্ব টা অনেক বড় হওয়ার জন্য একসাথে সবটুকু পোস্ট হচ্ছে না, এজন্য ৯০ (২) করতে হয়েছে)

(সতর্কতা - নিজ দায়িত্বে পর্বটি পড়বেন। এই পর্বে নৃশংস খুনের বর্ণনা রয়েছে।)

আমি পদ্মজা - ৯০(২)
_____
_____

নিশীথে পাঁচজন মানুষ বাঁধা অবস্থায় মাথা ঝুঁকে ঘুমাচ্ছে। আর সামনে রাম দা নিয়ে এক রূপসী বসে আছে। পাশে তিনটে কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটি ভয়ংকর। সুনসান নীরবতায় কেটে যায় ক্ষণ মুহূর্ত। আর সময় নষ্ট করা যাবে না। তারা বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। মৃত্যু উপভোগ না করে

অমানুষগুলো মরে যাক পদ্মজা চায় না। সে দুই জগ পানি পাঁচ জনের মাথার উপর ঢেলে দিল। তাতেও তাদের ঘুম ভাঙলো না। পদ্মজা রাম দার শেষ প্রান্ত দিয়ে পর পর পাঁচজনের পায়ের তালুতে আঘাত করলো। এতে কাজ হয়। তারা সক্রিয় হয়। পাঁচ জনই আধবোজা চোখে তাকায়। তাদের ঘুমের ঘোর এখনো কাটেনি। মাথা ভারী হয়ে আছে। ভনভন করছে। পদ্মজা চৌকিখাটের উপর গিয়ে বসলো। রিদওয়ান পদ্মজাকে ঝাপসা ঝাপসা দেখছে। সে চোখ বুজে আবার তাকালো। পদ্মজার হাসি হাসি মুখটা ভেসে উঠে। তার হাতে রাম দা। জ্বলজ্বল করছে পদ্মজার পাশের তিনটে কুকুরের চোখ! রিদওয়ান চমকে গেল। মজিদ,খলিল এবং আসমানি যখন পরিস্থিতি বুঝতে পারলো তারাও চমকে যায়। তারা কথা বলতে গেলে 'উউউ' আওয়াজ বের হয়। উঠতে গেলে টের পায় তাদের হাত-পা বাঁধা। ঘুম উবে যায়। মস্তিষ্ক সচল হয়ে উঠে। রিদওয়ান অবাক চোখে মজিদের দিকে তাকায়। মজিদও তাকালেন। তারা ছোটার জন্য ছটফট করলো। কিছু একটা বলার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনো চেষ্টাই সফল হচ্ছে না। আমির পদ্মজার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দুটি বার বার বুজে যাচ্ছে। তবে পরিস্থিতি ধরতে পেরেছে। সে সবসময় বলে,পদ্মজার নাকি নিজস্ব আলো আছে! এইযে এখন তার মনে হচ্ছে,অন্ধকারাচ্ছন্ন অতলে যখন সে তলিয়ে যাচ্ছিল তখন পদ্মজা এসে আলোর মিছিলে ভরিয়ে দিয়েছে তার মনের উঠান!

পদ্মজা পাঁচজনকে পরখ করে নিল। তাদের ছটফটানি আর ভয়ার্ত চোখ পদ্মজার দেখা সবচেয়ে সুন্দর ও তৃপ্তিকর দৃশ্য। আমিরের উপর চোখ পড়তেই আগে চোখে ভাসে আমিরের অযত্নে বেড়ে উঠা মাথার চুল। যা আমিরের কপাল ও চোখ ঢেকে রেখেছে। পদ্মজা উঠে দাঁড়ালো। রিদওয়ান ও মজিদের পাশে গিয়ে বসলো। দূরে সন্তানহারা পেঁচা ডাকছে চাপাস্বরে। আশেপাশে নাড়াচাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। পদ্মজা তাদের উপর ঝুঁকলো। তারপর মৃদু হেসে চাপাস্বরে বললো,' তবে হউক উৎসব। '
পদ্মজার কন্ঠ ও হাসি তাদের হৃৎপিণ্ডে জোরেশোরে আঘাত হানে। আসমানি 'উউ' শব্দ করই চলেছে। সে ভীতগ্রস্ত। ভয়ে তার শরীরে ঘাম হচ্ছে। ভয় পাচ্ছে উপস্থিত চারজনই। পদ্মজা আনাড়ি নয়। সে এর আগে তিনটে খুন করেছে। শেষ খুনটা নিখুঁত ছিল! পদ্মজাকে ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। রিদওয়ান শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। পদ্মজা হিজল গাছটির দিকে এগিয়ে যায়। লতিফা হিজল গাছের পিছনে কাপড়ের ব্যাগটি রেখেছে। পদ্মজা কাপড়ের ব্যাগখানা নিয়ে আসে। ব্যাগ উল্টো করতেই বেরিয়ে আসে তিনটে বৈয়াম, চাপাতি,ছুরি,রাম দা ও তলোয়ার। অস্ত্রগুলো দেখেই বন্দীদের আত্মা কেঁপে উঠে। খলিল হাওলাদার ভয়ে পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে গোঙানো শুরু করলেন। পদ্মজা তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। ছুরি নিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে আসে। পদ্মজার হাতে ছুরি দেখে কুকুরগুলো পালাতে উদ্যত হয়। কিন্তু তারা সুপারি গাছের সাথে বাঁধা! তাই পালাতে পারলো না। ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করে উঠলো।
পদ্মজা খলিলের উপর ঝুঁকে তার মাথার চুল শক্ত করে ধরে কিড়মিড় করে বললো,' যে হাত দিয়ে এতদিন হত্যা করে আসা হয়েছে আমি আজ সেই হাত কেটে ফেলবো।'
খলিল চোখ দুটি মারবেলের মতো বড় বড় হয়ে যায়। পদ্মজার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ে পূর্ণার মৃত দেহের সোঁদা গন্ধ। ভেসে উঠে আঁচড় কাটা মায়াবী মুখটা। সে মনের ক্রোধ প্রকাশ করতে,খলিলের চুলে ধরে রেইনট্রি গাছের সাথে বার কয়েক আঘাত করলো। খলিলের মাথা ফুলে টিলার মতো উঁচু হয়ে যায়। যে চোখে এতদিন হিংস্রতা ছিল সেই চোখে ভয়ের ছাপ।
পদ্মজা ছুরি দিয়ে খলিলের হাত-পায়ের চামড়া ছিঁড়ে দিল। তারপর বৈয়াম থেকে মরিচ নিয়ে সেখানে আহত স্থানে মাখিয়ে দিল। খলিলের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। তিনি কেঁদে কিছু

বলছেন,কিন্তু 'উউ' ছাড়া কিছু শোনা যাচ্ছে না। যন্ত্রণায় তার কলিজা ফেটে যাচ্ছে। জ্বলে যাচ্ছে হাত-পা।

খলিলকে ছেড়ে পদ্মজা সরু চোখে রিদওয়ানের দিকে তাকালো। কাছে কোথাও থেকে থেকে পেঁচা ডাকছে। জোনাকি পোকাদের দেখা যাচ্ছে না। কুকুর তিনটে পদ্মজার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।
খলিলকে আঘাত করার সময় পদ্মজার চোখেমুখে যে হিংস্রতা ফুটে উঠেছিল, সেই দৃশ্য দেখে তারা অবাক হয়েছে। পদ্মজাকে তাকাতে দেখে রিদওয়ান চট করে চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিল। খলিলের অবস্থা দেখার পর থেকে সে পদ্মজাকে ভয় পাচ্ছে। শরীরের সব শক্তি দিয়ে চেষ্টা করছে ছোটার। রিদওয়ানের চোরা চাহনি দেখে পদ্মজা হয়তো হাসলো। মধ্যরাতের বাতাস ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। পদ্মজা দ্বিতীয় বৈয়ামটি নিয়ে রিদওয়ানের দিকে এগিয়ে আসে। পদ্মজার একেকটা কদম রিদওয়ানের আত্মাকে কাঁপিয়ে তুলছে। পদ্মজা রিদওয়ানের পাশে বসলো। রিদওয়ান আড়চোখে পদ্মজার দিকে তাকায়। পদ্মজা রিদওয়ানের মুখের সামনে মুখ নিয়ে দাঁত বের করে হাসলো। বললো,' রাখে আল্লাহ মারে কে হা?'

রিদওয়ান একটু নড়াচড়া করে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে। পদ্মজা এক থাবায় রিদওয়ানের মুখ থেকে ওড়নার বাঁধন খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রিদওয়ান মজিদের উদ্দেশ্যে বললো,' আমি আগেই বলছিলাম এই মেয়ে আমাদের বিপদের কারণ হবে। শুনেননি।'

পদ্মজা খপ করে রিদওয়ানের তালুর চুল টেনে ধরলো। রিদওয়ান পদ্মজার মুখে থুথু ছুঁড়ে মারে। পদ্মজা তার মুখ দ্রুত সরিয়ে নেয়। রিদওয়ানের থুথু রিদওয়ানের মুখের উপরই পড়লো। রিদওয়ান কটমট করে তাকালো। বললো,' বে** মা* তোরে প্রথম দিনই মেরে ফেলা উচিত ছিল।'

পদ্মজা উঠে দাঁড়ায়। জোরে লাথি মারে রিদওয়ানের মুখে। লাথি খেয়ে রেইনট্রি গাছের সাথে আঘাত পায় রিদওয়ান। তার মাথা ভনভন করে উঠে। রিদওয়ান কিছু বুঝে উঠার আগে পদ্মজা তার প্যান্টের ভেতর বৈয়াম থেকে কিছু ঢেলে দিল। সেকেন্ড কয়েক পার হতেই বিশেষস্থানে জ্বালাপোড়া অনুভব করে। একসাথে অনেকগুলো জীবের কামড়ে তার মুখ নীল হয়ে যায়। সে চমকে তাকায় পদ্মজার দিকে। প্রশ্ন করে,'কী দিছস? খান** ঝি প্যান্টের ভেতর কী দিছস তুই?'

পদ্মজা উত্তর দিল না। রিদওয়ান চিৎকার করতে থাকে। পদ্মজা রয়ে সয়ে রিদওয়ানের চিৎকার করার দৃশ্য দেখতে দেখতে কুকুরগুলোকে মুক্ত করে দেয়। কুকুর তিনটে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করে পিছিয়ে যায়। পদ্মজা তৃতীয় বৈয়াম নিয়ে মজিদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। বৈয়াম থেকে দুই টুকরো কাঁচা মাংস বের করলো। ছাগল জবাই করেছিল আজ। সে দেখেশুনে হাড্ডিসহ কয়েক টুকরো মাংস রেখে দিয়েছিল। মাংস দেখে কুকুরগুলোর চোখ চকচক করে উঠলো। পদ্মজা এক টুকরো মাংস নিয়ে মজিদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর মজিদের মুখের উপর মাংসের টুকরোটি ধরলো। তিনটে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে মজিদের উপর। কুকুরগুলো লাফ দিতেই পদ্মজা মাংসের টুকরোটা মজিদের উরুর উপর ছেড়ে দেয়। কুকুরগুলোকে নিজের দিকে তেড়ে আসতে দেখে মজিদ নিঃশ্বাস নিতে ভুলে যান। চোখের পলকে মজিদের হাত-পা ও মুখের চামড়া ছিঁড়ে যায়। বেরিয়ে আসে রক্ত। এক টুকরো মাংস নিয়ে তিন কুকুরের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়। তাদের বিষদাঁতের কামড় পড়ে মজিদের গোপনাঙ্গে!

তিনি গোঙাতে গোঙাতে চোখের ইশারায় পদ্মজাকে আকুতি করেন এসব যেন থামানো হয়। অন্যদিকে রিদওয়ান ছোটার জন্য ছটফট করছে। পদ্মজাকে বিশ্রী গালিগালাজ করে হুমকিও দিয়েছে। যখন পিপড়ার কামড়ে সর্বাঙ্গ বিষিয়ে উঠে তখন সে পদ্মজাকে অনুরোধ করে তাকে বাঁচাতে। কখনো পদ্মজাকে দেবী বলে আবার কখনো মা বলে ডাকলো। ওয়াদা করলো,সে আর কখনো অন্যায় করবে না। পদ্মজা উত্তরে কিছুই বলেনি। সে নির্বিকার। রিদওয়ান ও কুকুরের চিৎকার শুনে মাথার উপর এক ঝাঁক পাখি ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল। আবার ডানা ঝাপটিয়ে ফিরে এলো। পাখিদের মধ্যে অস্থিরতা শুরু হয়েছে। তাদের অস্থিরতায় দানবের মতো দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর কচি ডালপালা ও পাতা বার বার নড়েচড়ে উঠছে। পদ্মজা এবার বৈয়াম নিয়ে খলিলের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। পূর্বের মাংসটি নিয়ে একটি কুকুর দৌড়ে দূরে চলে যায়। তার পিছনে পিছনে বাকি দুটি কুকুরও গেল।
পদ্মজা আরেক টুকরো মাংস খলিলের মুখের উপর ধরলো। তারপর কুকুর তিনটের আকর্ষণ পেতে মুখ দিয়ে শব্দ করলো,'হুশশ!'
খলিল হাওলাদার কুকুরগুলোর দিকে তাকিয়ে ভয়ে প্রস্রাব করে দিলেন। পদ্মজার ডাকে তিনটে নেড়ি কুকুর সাড়া দিল। তারা ঘেউ ঘেউ করে দৌড়ে আসে। খলিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পদ্মজা আগের মতোই হাতের মাংস খলিলের উরুর উপর ছেড়ে দিল।

তারপর আরেক টুকরো মাংস নিয়ে আসমানির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বৈয়াম রাখলো মাটিতে। একটা কুকুর পদ্মজার পিছনে এসে দাঁড়ায়। ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করে,তাকে মাংস দিতে। পদ্মজার এক হাতে ছুঁরি বলে ভয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাংস কেড়ে নেয়ার সাহস পাচ্ছে না। আসমানি পদ্মজাকে তার সামনে দাঁড়াতে দেখে গোপনে ঢোক গিলল। তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। সে কিছু একটা বলতে চাইছে। চোখের জলে যেন এক্ষুনি বন্যা বয়ে যাবে! মেয়েরা ভালো হউক,খারাপ হউক, বুড়ো হউক আর যুবতী হউক তারা ভীষণ কাঁদতে পারে! পদ্মজা আসমানির মুখ মুক্ত করে দিল। আসমানি কাঁদো কাঁদো স্বরে অনুরোধ করলো,' আল্লাহর দোহাই লাগে ভাবি,আমারে ছাইড়া দেন। আমি আপনার গোলামি করাম সারাজীবন।'
পদ্মজা আসমানির সামনে বসলো। আসমানির উপর ঝুঁকে তার গাল আলতো করে ছুঁয়ে দিয়ে আদুরে স্বরে বললো,' তুমি ভীষণ সুন্দর।'
পদ্মজার ঠান্ডা স্পর্শ আসমানির যকৃত ছুঁয়ে ফেললো। সে কেঁপে উঠে। চোখেমুখে অসহায়ত্ব ফুটিয়ে পদ্মজার চোখের দিকে তাকায়। পদ্মজা হাসলো। আসমানির চুলের মুঠি শক্ত করে ধরে বললো,' আমি পুরুষ না যে আমাকে আকৃষ্ট করবে। আমার বোনের মৃত্যুকষ্ট তোমাকেও অনুভব করতে হবে।'
পদ্মজা হাতের মাংসের টুকরোটি মজিদের উপর ছুঁড়ে মারলো। তাৎক্ষণিক কুকুর তিনটে মজিদের উপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পদ্মজা আসমানির পায়ের দঁড়ি খুলে সেই দঁড়ি দিয়ে আসমানির গলা পেঁচিয়ে ধরে৷ আসমানির চোখ উল্টে যায়। পদ্মজার চোখেমুখে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। সে শান্ত,স্বাভাবিক। যখন আসমানি নিস্তেজ হওয়ার পথে পদ্মজা দঁড়ি ছেড়ে দিল৷ আসমানি কাশতে কাশতে নতজানু হয়। পদ্মজা আবার পেঁচিয়ে ধরলো। আসমানি দুই পা দাপিয়ে দম নেয়ার চেষ্টা করে। তার শাড়ি হাঁটু অবধি চলে এসেছে। যতক্ষণ না আসমানির নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের হয় পদ্মজা শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে টেনে ধরে রাখে দঁড়ি। ক্ষণমুহূর্ত যুদ্ধে আসমানি নিস্তেজ হয়ে যায়। পদ্মজা দঁড়ি ছেড়ে দিল।

আসমানির জিহবা মুখের ভেতর নেই। বাইরে বেরিয়ে এসেছে। চোখ দুটি উল্টে রয়েছে। সারামুখ কালচে ভাব। পদ্মজা তার দুই হাত ঝেড়ে আসমানির মৃত লাশ থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়।

পিঁপড়ার কামড়ে রিদওয়ানের কোমর থেকে পায়ের তালু অবধি অবশ হয়ে গেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ! শরীর ব্যথায় টনটন করছে। তার স্পর্শকাতর স্থান গুরুতর আহত। পদ্মজা ছুরি নিয়ে রিদওয়ানের সামনে এসে দাঁড়ায়। রিদওয়ানের উরুতে ছুরি প্রবেশ করে আবার বের করে আনে। রিদওয়ান চিৎকার করে উঠলো। অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলো,' আর না। আর না...'
পদ্মজা শূন্যে ছুরি ছুঁড়ে মেরে কৌশল করে ধরলো। তারপর ছুরি দিয়ে
রিদওয়ানের শরীরে অগণিত আঘাত করতে থাকে। তারপর এক চোখ তুলে নিল। রিদওয়ান জোরে আর্তনাদ করে উঠে। আকুতি করে তাকে মৃত্যু দিতে নয়তো বাঁচতে দিতে। পদ্মজা দাঁতে দাঁত চেপে রিদওয়ানের দুই গাল চিপা দিয়ে ধরলো। ফিসফিস আওয়াজের মতো করে বললো,' এই...এই চোখগুলো আর কোনোদিন কোনো মেয়েকে দেখবে না।কোনোদিন না।'
রিদওয়ানের এক চোখ থেকে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। কুকুরগুলো আরো মাংসের জন্য বিরতিহীনভাবে চিৎকার করে যাচ্ছে। পদ্মজা তার কথা শেষ করে রিদওয়ানের আরেকটা চোখে ছুরি ঢুকিয়ে দিল। তারপরই মুখের উপর ছুরি দিয়ে তেরছাভাবে টান মারলো। রিদওয়ানের নাক ছিঁড়ে উপরের ঠোঁট দুই ভাগ হয়ে যায়। চিৎকার করার শক্তিটুকুও আর সে পেল না। তার পূর্বেই বেহুশ হয়ে যায়। পদ্মজা ক্রোধে মৃদু কাঁপছে। তার সাদা শাড়ি ইতিমধ্যে রাঙা হয়ে গেছে। সে রাম দা নিয়ে নিঃশ্বাসের গতিতে যেভাবে পারে রিদওয়ানকে কোপাতে থাকলো। তার মুখ দিয়ে ক্রোধ স্বর বের হচ্ছে। রিদওয়ান শরীরের মাংস ছিটকে পড়ে এদিকসেদিক। লুকিয়ে দেখা নিশাচরেরা একস্বরে ডেকে উঠে। তারা পদ্মজাকে তার কাজে সাহস যোগাতে কিছু বলছে? নাকি ভয় পেয়ে ডাকছে? কে জানে!

প্রায় মিনিট দশেক পর পদ্মজা স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তার মুখ রক্তে অস্পষ্ট। চোখ দুটি ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। শাড়ি তাজা রক্তে জবজবে! সামনের চুলগুলো রক্তে আঠালো হয়ে গেছে। তার বুক হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করছে। নিঃশ্বাস নিচ্ছে ঘন ঘন। বাতাস পদ্মজার সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে আলিঙ্গন করার জন্য ধেয়ে আসে। পদ্মজা রাম দা থেকে রক্ত পড়ছে চুইয়ে চুইয়ে। সে রাম দা রেখে সদ্য কেনা চাপাতি তুলে নেয় হাতে। ঘুরে এসে মজিদের সামনে দাঁড়ায়। কুকুরের আঁচড় আর কামড়ে মজিদের প্রাণ নেতিয়ে পড়েছে! পদ্মজা মজিদের মুখের বাঁধন খুলে দেয় মজিদের শেষ আর্তনাদ শোনার জন্য। মজিদ অস্পষ্ট স্বরে বললো,' মা,মা...আমায়...'
মজিদ কথা শেষ করতে পারলেন না। পদ্মজা চিৎকার করে হাত ঘুরিয়ে এক আঘাতে মজিদের মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ফেললো। রক্ত ফিনকি দিয়ে ছিটকে পড়ে। বুরবুর শব্দ তুলে পেটের নাড়িভুড়ি ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে। পদ্মজা এক মুহূর্তও থামলো না। হিংস্র তাণ্ডব চালিয়ে গেল। তার রক্তের তৃষ্ণা মিটেনি! সে খলিলের মুখের বাঁধন খুলে দিল। পদ্মজাকে রক্তমানবী মনে হচ্ছে। তার শরীরে প্রতিটি লোমকূপ রক্তে স্নান করেছে। খলিল হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো,'ও মা, ও মা আমারে ছাইড়া দেও। আমি তোমার বাপের মতো। ও মা আমারে ছাইড়া দেও....'

পদ্মজা দাঁত বের করে হাসলো। তার দাঁতেও রক্ত লেগে আছে! ভয়ানক দেখাচ্ছে! কোথায় গেল তার ভুবনমোহিনী রূপ? রক্তের সাগরে ডুব দিয়েছে সে। পদ্মজা চাপাতি দুই হাতে ধরে হাত ঘুরিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো খলিলকে আঘাত করতে থাকে। এক আঘাতেই খলিলের আত্মা দেহ ছেড়ে দেয়। কিন্তু পদ্মজা থামলো না। সে ক্রোধ স্বর মুখে রেখে খলিলকে ইচ্ছেমতো কোপাতে থাকলো। ক্যাচক্যাচ শব্দে চারপাশ কেঁপে কেঁপে উঠে। আঘাতে আঘাতে খলিলের এহ হাত,কান, নাক

শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়। পদ্মজা ক্লান্ত হয়ে চাপাতি খলিলের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। বাম হাতে কোমর থেকে আরেকটা ছুরি নিয়ে খলিলের পেটে ঢুকিয়ে দিল। রিদওয়ান, মজিদ আর খলিলের রক্ত মাটি বেয়ে পুকুরের কালো জলের দিকে যাচ্ছে। পদ্মজা মাটিতে বসে পড়ে। নেড়ি কুকুরগুলো ভয় পেয়ে দূরে চলে গিয়েছে। দূর থেকে তারা পদ্মজাকে দেখছে।

হিংস্র ঝড়ের তান্ডব থামতেই চারিদিকে নিস্তব্ধতা ভর করে। পদ্মজা ভীষণ ক্লান্ত। সে দুই চোখ বুজে লম্বা করে নিঃশ্বাস নিল। তারপর মাথা তুলে আমিরের দিকে তাকালো। আমির এতক্ষণ পদ্মজার দিকে তাকিয়ে ছিল। পদ্মজাকে তার দিকে তাকাতে দেখে সে চোখ সরিয়ে নিল। আমিরের চোখের উপর পড়ে থাকা চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। সে শান্ত হয়ে বসে আছে। কোনো ছটফটানি নেই,অস্থিরতা নেই,ভয় নেই। সে নির্লিপ্ত। পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে ডান পাশে তাকালো। আমিরের দেয়া নতুন তলোয়ারটি ঘাসের উপর পড়ে আছে। পদ্মজা মাটিতে হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তিন কদম এগিয়ে তলোয়ারটি হাতে তুলে নিল। তারপর ফিরে তাকালো আমিরের দিকে। সেদিনের কথা,যেদিন আমির নিজে এই তলোয়ার পদ্মজার হাতে তুলে দিয়েছিল,জীবন নেয়ার অনুমতি দিয়েছিল! এ কথা শুনে পদ্মজার সেকি কান্না! কিন্তু আজ পদ্মজা শুধুই পদ্মজা,প্রিয় স্বামীর পদ্মবতী নয়! পদ্মজা শক্ত করে তলোয়ার ধরে সামনে এগিয়ে যায়। সে যত এগুচ্ছে অনুভব করছে বুকের ভেতরের শক্ত আবরণটা সরে যাচ্ছে। একটা নরম কোমল অনুভূতি জেঁকে বসছে!
পদ্মজা আমিরের সামনে এসে দাঁড়াতেই আমির চোখ তুলে তাকালো। এইযে রাতের বাতাসে পদ্মজার এক দুটো চুল উড়ছে। তাতেও ভালো লাগছে। রক্তের মাখামাখিও পদ্মজার রূপের বাহার নষ্ট করতে পারেনি। অন্তত আমিরের কাছে!
নির্জন,নিরিবিলি পরিবেশে আমিরকে এমন অবস্থায় এতো কাছে দেখে পদ্মজার চোখগুলো শীতল হয়ে উঠে। তার মনে হচ্ছে, আমিরের চোখ,পা,হাত,বুক,বাহু সব কথা বলছে! সেদিনই তো তাদের বিয়ে হলো। আমির তার শক্তপোক্ত দুটি হাত দিয়ে পদ্মজাকে কোলে নিয়ে ঘরে তুলে। উপহার দেয় নতুন সংসার,নতুন পৃথিবী! সে আমিরের সংস্পর্শে এসে আবিষ্কার করে নতুন এক সত্ত্বা। পুরনো কথা ভেবে পদ্মজার কণ্ঠনালিতে একটা যন্ত্রণা ঠেকছে। তার কণ্ঠনালী ব্যথা করছে! সে মাটিতে তলোয়ার রেখে রেইনট্রি গাছের দঁড়ি থেকে আমিরকে মুক্ত করে দেয়। এখন শুধু আমিরের হাত-পা আর মুখ বাঁধা। পদ্মজা আমিরের সামনে বসলো। আমিরের নতজানু মুখটা নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করলো । তারপর আমিরের বুকে সাবধানে এক হাত রাখলো। পদ্মজার একটুখানি ছোঁয়া আমিরের সত্ত্বাকে কাঁপিয়ে তুলে। যেন সমুদ্রের ঢেউ গর্জে উঠে। আকাশ ভেঙে বজ্রপাত পড়ে!

কুকুরগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। পদ্মজার ছলছল চোখ দুটি স্পষ্ট! আমিরের মনে হচ্ছে, আকাশের চাঁদটা ঠিক পদ্মজার মাথার উপরেই। সে সকল অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু পদ্মজাকে কোমল চোখে তাকাতে দেখে তার বুকটা হুহু করে কেঁদে উঠলো। চোখের চাহনীতে মনের সবটুকু ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছে পদ্মজা। বুঝা যাচ্ছে সে আমিরের প্রেমে কতোটা মাতোয়ারা! আমির আশা করেনি,এই মুহূর্তে এতোকিছুর পর পদ্মজার চোখে পুরনো প্রেম দেখতে পাবে! বুকটা আর কত পুড়বে? যখন একসাথে থাকা সম্ভবই নয়।
আমিরের চুপ থাকা,আমিরের নির্লিপ্ততা বলে দিচ্ছে সে পদ্মজার কোনো আঘাতকেই পরোয়া করে না। আমিরের মায়া মায়া চোখ দুটি গ্রাস করে ফেলে পদ্মজাকে। কেনো জানি তার খুব কান্না

পাচ্ছে! বুকের ভিতরে কোথায় যেনো লুকানো জায়গা থেকে একদল অভিমান প্রচণ্ড কান্না হয়ে দু'চোখ ফেটে বেরুতে চাইছে। পদ্মজা ধীর কণ্ঠে বললো,'কেন আমায় ভালোবাসলেন না?'
তার কণ্ঠে কান্না! আমিরের এক চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে। সে কোন শাব্দিক উচ্চারণে বোঝাবে,পদ্মজাকে ঠিক কতোটা ভালোবাসে? কী করে বলবে? সে পদ্মজার জন্য বিষের দাঁনা! ভালোবাসা এক ভয়ংকর মহামারির নাম। যে মহামারির একমাত্র পথ,বিপরীত মানুষটিকে ছাড়া নিঃস্ব হয়ে যাওয়া। এই মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে কত মানুষ বৈরাগী হয়েছে! আর আমির বেছে নিয়েছে মৃত্যু! পদ্মজা হুট করে আমিরের কপালে চুমু খেল। আমিরের হৃৎপিণ্ড জ্বলে উঠে! তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। পদ্মজার দুই চোখের জল আটকাতে পারলো না। সে বললো,' আপনার দুটি সত্ত্বার একটি আমার স্বামী। আমি তাকে সম্মান করি। কিন্তু অন্য সত্ত্বার জন্য আপনাকে মরতে হবে।'
পদ্মজা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কান্না আটকাচ্ছে। আমির নিজেকে সামলে চোখের দৃষ্টি নত করলো। পদ্মজা নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে,বুকটা জ্বলে যাচ্ছে কেন? একটু আগের তেজটা কেন নেই বুকের ভেতর? আমিরের ভালোবাসার অভাব তাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। ছয়টা বছর মানুষটা এতো কেন ভালোবাসলো? এত নিখুঁত ভালোবাসার অভিনয় হতে পারে? কাঙাল সে,তার স্বামীর ভালোবাসার কাঙাল। কিন্তু সেই ভালোবাসাই প্রতারণা করলো। এই ভালোবাসা ভাগ হয়েছে আরো আগে। কষ্টগুলো বাতাসে উড়ে যায় না কেন?
পদ্মজা খাপ থেকে তলোয়ার বের করলো। তলোয়ারখানা দেখে পদ্মজার বুকের ভেতরে দ্রিমদ্রিম করে কিছু বাজতে থাকে। কেঁপে উঠে তার হাত। পদ্মজা ঢোক গিলে নিজেকে ধাতস্থ করলো। তারপর কাঁপা হাতে আমিরের মুখ থেকে ওড়নার বাঁধন খুলে দিল। আমিরের আর্তনাদ শোনার জন্য নয়! সে চায়,আমির তাকে কিছু বলুক। কিন্তু কী শুনতে চায় সে জানে না। আমিরের বেলা সে কঠোর হওয়া তো দূরে থাক,তলোয়ার চালানোর সাহস পাচ্ছে না। আমির মাথা নত করে অপেক্ষা করছে মৃত্যুর জন্য। মৃত্যু তার জন্য উপহার! পদ্মজা আঘাত করতে সময় নিচ্ছে। আমিরের নিশ্চুপতা তার মনের ব্যথা বাড়িয়ে দিচ্ছে। সে বেহায়া হয়ে কাঠ কাঠ কন্ঠে বললো,'কিছু বলার আছে?'
আমির তাকালো। এইতো...এই দৃষ্টি পদ্মজাকে খুন করে ফেলে! তীরের বেগে বুকের ভেতর ছিদ্র করে ফেলে! এই পৃথিবীতে নাকি শ্যামবর্ণ অবহেলিত! অথচ ভুবনমোহিনী রূপসী পদ্মজা শ্যামবর্ণ এক পুরুষকে ভালোবেসে থমকে গিয়েছে! আমির বললো,' গত চারদিনের যন্ত্রণার একাংশ যদি তুমি অনুভব করতে আমাকে খুন না করে বাঁচিয়ে রাখতে। আমার শাস্তি হতো আমার বেঁচে থাকা!'
আমির কথা শেষ করে চোখের পলক ফেলার পূর্বে পদ্মজা তার বুকের মধ্যিখানে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিল। তলোয়ার বুক ভেদ করে পিঠে গিয়ে ঠেকে!
আচমকা আক্রমণ করায় আমির অবাক হলো। তার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। বুকের যন্ত্রণারা শেষবারের মতো দুই চোখ ছাপিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আমিরের মুখ থেকে এতো রক্ত বের হতে দেখে পদ্মজার পায়ের তলা কেঁপে উঠে। সে সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার টেনে বের করলো। আমিরের দেহটা দপ করে শব্দ তুলে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। পদ্মজা বুক ছ্যাঁৎ করে উঠে। বুকের ভেতর পাহাড় ধ্বসে পড়ে। সে দ্রুত আমিরের দুই হাতের বাঁধন খুলে দেয়। বুকের ভেতর থেকে শব্দ তুলে কান্নারা বেরিয়ে আসে। সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো,' যাবেন না...যাবেন না।'

আমিরের শরীর দুই-তিনটে ঝাঁকি দিয়ে নিথর হয়ে যায়। পদ্মজা মাথায় এক হাত দিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো এদিকসেদিক তাকায়। তার শরীরটা কেমন যেন করছে। চোখের সামনে তিলে তিলে গড়ে তোলা প্রেমের রাজপ্রাসাদ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে! সে শব্দ শুনতে পাচ্ছে। শব্দের আঘাতে তার

মগজ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পদ্মজা আর্তনাদ করে উঠে। দুই হাতে মাটি চাপড়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো,'আল্লাহ...আল্লাহ।'

তার চিৎকার শুনে সন্তানহারা পেঁচাটির কান্না থেমে যায়। 'আল্লাহ' উচ্চারণটি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে যেন বার বার। এই একটি ডাকে পদ্মজার সর্বহারার বেদনা ফুটে উঠে। সে আপন মানুষদের মৃত্যু দেখতে দেখতে ক্লান্ত। তার যন্ত্রণার পাহাড় ভেঙে গেছে। পদ্মজা বাচ্চাদের মতো হাঁটুতে ভর দিয়ে একবার ডানে যায় আরেকবার বামে যায়। তারপর আমিরের মাথার কাছে এসে বসে। আমিরের চোখ দুটো খোলা। পদ্মজার দিকে তাকিয়ে আছে! চোখ জোড়ার কি পদ্মজাকে দেখার তৃষ্ণা মেটেনি?

"তোমাকে দেখার তৃষ্ণা আমার কখনোই মিটবে না,পদ্মবতী।" পদ্মজা চমকে পিছনে তাকায়। কেউ নেই। ডান পাশ থেকে আবার শুনতে পায় একই কথা। পদ্মজা ডান পাশে তাকায়। তারপর শুনতে পায় বাম পাশ থেকে। পদ্মজা চরকির মতো ঘুরতে থাকে। সে বাস্তব দুনিয়া থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেক আগে। আমিরের বলা পুরনো কথাগুলো সে শুনছে। প্রতিটি কথা তাকে সূচের মতো খোঁচাচ্ছে। পদ্মজা এতো ব্যথা সহ্য করতে না পেরে দুই হাতে খামচে ঘাস টেনে তুললো। তারপর এক হাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে করতে চিৎকার করে কাঁদলো।
কাঁদতে কাঁদতে তার গলার স্বর স্তব্ধ হয়ে যায়। সে শরীরের ভার ছেড়ে দেয়। সেজদার মতো উঁবু হয়। তারপর মাথা তুলে এক হাতে আমিরের চোখ দুটি বন্ধ করে দিল। চোখের জল মুছে চারপাশে চোখ বুলাল। তার চোখের দৃষ্টি অস্থির। নিঃশ্বাস এলোমেলো। এই বিশাল পৃথিবীতে এখন সে একা! আচমকা সে উঠে দাঁড়ায়। যেখানে ভোজ আসর হয়েছিল সেখানে ছুটে যায়। আমিরের প্লেট আলাদা। তার প্লেটে দুটো পদ্মফুল আঁকানো। পদ্মজা খুঁজে খুঁজে আমিরের প্লেটটা বের করলো। সেখানে কিছু খাবার অবশিষ্ট ছিল। পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার আমিরের মৃত দেহ দেখলো। তারপর দ্রুত অবশিষ্ট খাবারটুকু খেল। খাবার শেষ হতেই পানি না খেয়েই দৌড়ে আমিরের কাছে আসে। একটা তীক্ষ্ণ ঠান্ডা স্রোত বুকের এদিক থেকে ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। চাঁদটা অর্ধেক ডুবে গিয়েছে। তবে তার আলো এখনো রয়ে গেছে। পদ্মজা আমিরকে টেনে সোজা করলো।
আমিরের শার্টের বুক পকেট থেকে একটি বিষের শিশি বেরিয়ে আসে। পদ্মজা শিশিখানা হাতে নিয়ে অবাক চোখে আমিরের ফ্যাকাসে মুখটা দেখে। সে কিছু একটা বলে কিন্তু কথাটি ফুটল না। তার কথা হারিয়ে গেছে! তারপর ভাবলো, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে। কিন্তু পরক্ষণে মনে পড়লো, আত্মহত্যা মহাপাপ! পদ্মজা বিষের শিশি ছুঁড়ে ফেলে পুকুরে।

আমিরের মাথাটা কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ গুনগুন করে কাঁদলো পদ্মজা। বাতাসের বেগ বেড়েছে। রক্ত শুকোনোর পথে। ঠান্ডা কাঁটার মতো বিঁধছে শরীরে। পদ্মজার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। সে রক্তাক্ত আমিরকে টেনে মাঝে নিয়ে এসে সুন্দর করে শুইয়ে দিল। তারপর আমিরের নিথর দেহটিকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে তার বুকের উপর শুয়ে পড়লো। মিনিট দুয়েক পর ঘুম ঘুম চোখে মাথা উঁচু করে আমিরের দুই গালে সময় নিয়ে দুটো চুমু দিল পদ্মজা। একটা কুকুর পদ্মজাকে ঘিরে হাঁটছে। আর বাকি দুটো কুকুর মজিদ,খলিল,রিদওয়ান ও আসমানির লাশ শুঁকছে। ক্লান্ত পদ্মজা আমিরের বুকে শুয়ে শান্ত হলো। চোখ বুজলো। যে পৃথিবীর লীলাখেলায় সে বাধ্য হয়েছে স্বামীর বুকে অস্ত্র চালাতে সেই পৃথিবীর উদ্দেশ্যে মনের খাতায় চিঠি লিখলো-

"ক্ষমা করো পৃথিবী। তাকে আমি ঘৃণা করতে পারিনি। তাকে আমি নিষ্ঠুর মৃত্যু দিতে পারিনি। যার হাতের পাঁচটি আঙুল আমার নির্ভরতা,যার বুকের পাঁজরে লেগে থাকা ঘামের গন্ধ আমার

সবচেয়ে প্রিয়,যার উষ্ণ ঠোঁটের ছোঁয়া আমার প্রতিদিনের অভ্যাস, যার এলোমেলো চুলে আমি হারিয়ে যাই বারংবার, যার ভালোবাসার আহবানে সবকিছু তুচ্ছ করে ছুটে যাই,যার মিষ্টি সোহাগে অন্য জগতে হারিয়ে যাই, তার কষ্ট আমি কী করে সহ্য করি? লোকে বলে, স্বামীর বাঁ পাঁজরের হাড়ে স্ত্রী তৈরি। তাহলে যার পাঁজরে আমার সৃষ্টি তার আর্তনাদ কী করে শুনি? এই কঠিন কাজ আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ও পৃথিবী সবাইকে বলে দিও,আমার কবরটা যেন আমার স্বামীর কবরের ঠিক বাঁ পাশেই হয়! আমি তাকে ভালোবাসি। যেমন সত্য চন্দ্র-সূর্য তেমন সত্য আমি তাকে ভালোবাসি!

শেষ রাত্রি। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে রক্ত,একটি জিহবা বের করা নারী দেহ,তিনটি ক্ষত-বিক্ষত পুরুষ দেহ ও একটা মাথা। মাঝখানে শুয়ে আছে আমির হাওলাদার। তার বুকের উপর শুয়ে আছে তারই অর্ধাঙ্গিনী তারই খুনি উম্মে পদ্মজা! খাবারে ঘুমের ঔষধ ছিল বলে, পদ্মজা ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনটে নেড়ি কুকুর এলোমেলো হয়ে এদিক সেদিক হাঁটছে। সাঁইসাঁই করে বাতাস বইছে। অনেকগুলো তারার মাঝে একটা চাঁদ। স্বচ্ছ আকাশ। চাঁদটা তার নরম আলো নিয়ে ঠিক আমির-পদ্মজার উপর স্থির হয়ে আছে।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা
শেষ পর্ব (প্রথম অংশ)

_____

প্রচণ্ড গরম পড়েছে। প্রেমা ঘেমে একাকার। তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে চৌচির! ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে নদীর পানি দিয়ে গলা ভেজাতে পারে। কিন্তু তার ইচ্ছে করছে না। বুকের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে সাত মাস পূর্বেই। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া ভগ্নহৃদয় নিয়েই দিব্যি বেঁচে আছে! মাঝে মাঝে সে নিজেকে প্রশ্ন করে, কেন সে বেঁচে আছে?
তুষার তার হাতের সিগারেটটি নদীতে ফেললো। তারপর সামনে তাকালো। কালো বোরকা পরে বসে আছে প্রেমা। তার মাথার উপর বাঁশের ছাউনি। সে চোখ ছোট ছোট করে উদাসীন হয়ে তাকিয়ে আছে দূরে,বহুদূরে। তুষার চার মাস ধরে প্রেমাকে দেখছে। মেয়েটা সবসময় উদাসীন থাকে। তুষার তার কপালের ঘাম মুছলো। গরম ভালোই পড়েছে। সে তার ব্যাগপ্যাক থেকে পানির বোতল বের করে গলা ভেজালো। তারপর প্রেমাকে ডাকলো,' এই মেয়ে,পানি খাও। গরম পড়েছে খুব।'
প্রেমা তাকালো না। তুষার তার এক ভ্রু উঁচিয়ে ডাকলো,' এই যে খুকী? '
প্রেমা ঘাড় ঘুরিয়ে ছোঁ মেরে বোতল নিল। তারপর আবার আগের মতো ঘুরে বসলো। প্রেমার ব্যবহারে তুষার বেকুব বনে যায়। তার মাথা চড়ে যায়। এইটুকু মেয়ে বেয়াদবি করলো কীভাবে? তুষার দূরে গিয়ে বসলো। কিন্তু তার রাগ বেশিক্ষণ রইলো না। দোষটা তো তারই! বয়সের পার্থক্যটা বেশি হওয়াতে প্রেমাকে তার বউ মনে হয় না। তাই গত চার মাসের দাম্পত্য জীবনে একবারও সে প্রেমার হাত ধরেনি। কখনো ভাবেওনি তার একটা বউ আছে! শুধু দুজন এক বাড়িতে থেকেছে,এই যা! এই যুগে একরকম চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সের পার্থক্যে স্বামী-স্ত্রী অহরহ দেখা

যায়। তবুও কেন যেন তুষার প্রেমাকে ছোট স্কুলপড়ুয়া একটা মেয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না! সে প্রেমার সাথে সবসময় দূরত্ব রেখেছে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়া মেয়েটাকে সময় দেয়নি,এতোবার কাঁদতে দেখেও আদর করে কখনো কান্না থামায়নি! সবকিছু স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে। তুষার যে রসকষহীন কাঠখোট্টা একটা মানুষ প্রেমা বুঝে নিয়েছে! তুষারও বুঝতে পেরেছে। তাকে বুঝিয়েছে তার মা। গত শুক্রবার জুম্মার পর তুষারের মা আয়তুন বিবি তুষারের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন। বুঝান, বউকে বউয়ের মতো দেখতে। বিয়ে যখন হয়েছে প্রেমাই তুষারের জীবনের নিখুঁত স্ত্রী। প্রেমা নিঃসঙ্গতায় কামড়ে খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। এক বোন কবরে অন্য বোন জেলে। যে স্বামী হয়েছে সেও দূরত্ব বজায় রেখে চলে। এভাবে মেয়েটা কীভাবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে? মায়ের কথা শোনার পর তুষার কাজকর্ম রেখে অনেক ভেবেছে। উপলব্ধি করলো,পদ্মজার মুখে প্রেমার যে বর্ণনা সে শুনেছিল,যে প্রাণোচ্ছল, লজ্জাবতী মেয়েটার কথা সে শুনেছিল সে মেয়েটা আর আগের মতো নেই! তুষারের বিবেক জাগ্রত হয়। সিদ্ধান্ত নেয় প্রেমাকে সময় দিবে। সম্পর্কটাকে সুযোগ দিবে,সহজ করবে! তাৎক্ষণিক সে প্রেমাকে জানালো,তারা অলন্দপুরে ঘুরতে যাবে। তুষারের সিদ্ধান্ত শুনে প্রেমা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। গত দুইদিন তুষার ইনিয়েবিনিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছে। তাও সব কথা পড়া নিয়ে! এতো ছোট মেয়ের সাথে কী বন্ধুত্ব হয়! তুষার কথা বলে সম্পর্ক সহজ করতে গিয়ে আরো কঠিন করে তুলছে। সে কিছুতেই প্রেমার সাথে সহজ হতে পারছে না। তারপর আজই দুজন গ্রামের উদ্দেশ্যে বের হলো। পথে কেউ কোনো কথা বলেনি। অলন্দপুরে চলে এসেছে তারা। নৌকা ধীরগতিতে আটপাড়ার দিকে এগোচ্ছে। তুষার আড়চোখে প্রেমাকে দেখলো। প্রেমা ঝিম ধরে বসে আছে। তুষার খ্যাঁক করে গলা পরিষ্কার করে ডাকলো,' প্রেমা?'

প্রেমা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। সে অবাক হয়েছে। স্বামী নামক কঠিন পাথরটি তাকে সবসময় খুকী বলে অথবা এই মেয়ে ডাকে! হুট করে প্রেমা ডাকটা শুনে অবাক হয়েছে আবার ভালোও লাগলো! তুষার গাম্ভীর্যতা ভেঙে প্রেমার দিকে এগিয়ে আসে। প্রেমার সামনে এসে বসলো। মাঝি বাউল গান গাইছে। গাইতে গাইতে বৈঠা বাইছে। তুষারকে এরকম মুখোমুখি বসতে দেখে প্রেমা উৎসুক হয়ে তাকায়।

তুষার বসেছে তো ঠিকই। কিন্তু কী বলবে খুঁজে পাচ্ছে না। আরো দুই-তিনবার খ্যাঁক করে কাশলো। তারপর বললো,' আমাদের সম্পর্কটা আসলে কী?'
এটা কেমন প্রশ্ন! প্রেমা ভ্রুকুটি করলো। তুষার নিজের প্রশ্নে নিজে হতভম্ব হয়ে যায়! হয় সে কঠিন,কঠিন কথা বলে। নয়তো কী বলে নিজেও বুঝে না। প্রেমাও বুঝে না। তুষার দুই দিনের চেষ্টায় বুঝে গিয়েছে মেয়ে মানুষ পটানোর চেয়ে আসামী ধরা সোজা! প্রেমার সাথে তার জমছেই না! আসলে কি পটাতে পারছে না? নাকি কীভাবে পটাতে হয় সেটাই তুষার জানে না? প্রেমা চোখ ফিরিয়ে নিল। তুষারের হাবভাব সে বুঝে না। বুঝার ইচ্ছেও নেই। মেট্রিক পরীক্ষাটা দেয়া হয়নি। আরো এক বছর পড়তে হবে! জীবনটা এলোমেলো হয়ে গেছে। তার পাশে আপন বলতে কেউ নেই। প্রেমার বুক চিঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তুষার সেই দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায়। সে প্রেমার দিকে তাকালো। এইটুকু মেয়ের দীর্ঘশ্বাস এতো ভারী! তুষার নরম কণ্ঠে বলার চেষ্টা করলো,' তুমি কি আমার উপর বিরক্ত?'
তুষার নরম কণ্ঠে কথা বলার চেষ্টা করলেও, কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্যতা থেকে যায়। প্রশ্ন করে দুই ভ্রু কুঁচকে প্রেমার দিকে তাকায়। তার চাহনি দেখে মনে হচ্ছে,প্রেমা চোর! চুরি করে ধরা পড়েছে।

আর তারই জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। প্রেমা জবাব দিল না। তুষারের ভ্রু দুটি আরো বেঁকে গেল। সে কাঠ কাঠ স্বরে বললো,'প্রশ্ন করেছি তো? উত্তর কোথায়?'
প্রেমা অন্যদিকে চোখ রেখে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো, 'না। বিরক্ত না।'
'তাহলে আমার সাথে কথা বলো না কেন?'
প্রেমা নির্বিকার চোখে তাকালো। বললো,' আপনিও তো বলেন না।'

তুষার থতমত খেয়ে যায়। প্রথম প্রথম প্রেমা তুষারের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছে৷ তখন তুষারই হু,হ্যাঁ এর বেশি কিছু বলেনি। তাই কখনো দীর্ঘ আলাপ হয়নি। প্রেমার কথায় তুষার বিব্রতবোধ করলেও নিজেকে গুটিয়ে নিল না। সে কখনো হারেনি। সবসময় জয়ী হয়েছে। এবারের চ্যালেঞ্জটা মেয়েলি ব্যাপার! যাই হোক,সে হারবে না। হ্যাঁ...কিছুতেই হারবে না। তুষার মাছি তাড়ানো মতো হাত নাড়িয়ে বললো,' পিছনের কথা বাদ। এখন থেকে দুজনই কথা বলবো। ঠিক আছে?'
প্রেমা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালো। তুষার বললো,' বেশি গরম লাগছে?'
'লাগছে।'
তুষারের দূরে চোখ রেখে বললো,'আর কিছুক্ষণ। এসেই পড়েছি।'

আচমকা কালো মেঘে ছেয়ে যায় আকাশ। দখিনা বাতাস ধেয়ে আসে। দস্যি বাতাসে প্রেমার ওড়নার একাংশ ছাউনির বাইরে চলে যায়। তুষার ধরলো। প্রেমা তার অবাধ্য ওড়নাকে সুন্দর করে গায়ে পেঁচিয়ে নিল। তিন-চারদিন ধরে হুটহাট বাতাস বইছে। সেই সাথে ভ্যাপসা গরম তো রয়েছেই। তুষার চোখ ছোট ছোট করে চারপাশ দেখছে। নদীর দুই পাড়ে দুই গ্রাম। বামে হিন্দু পাড়া ডানে আটপাড়া। আটপাড়ার সব মানুষ মুসলমান। তুষার বললো,' হিন্দু পাড়ায় কখনো গিয়েছো?'

'হু,অনেকবার।'

তুষার প্রেমার মুখের দিকে তাকালো। বললো,'আমাদের বিয়েটা কী করে হলো জানো?'

'জানি।'

,'কী জানো?'

প্রেমা নির্বিকার স্বরে বললো,'হানি খালামনির কাছে আপনার আম্মা প্রস্তাব নিয়ে যান। তারপর কিছু বুঝে উঠার আগে পরদিনই আমার বিয়ে হয়ে যায়।'
তুষার গুরুতর ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো,'অচেনা একজনকে এক কথায় বিয়ে করে নিলে কেন? তোমার অনুমতি নেয়া হয়নি?'
তুষার এসব কেন জিজ্ঞাসা করছে প্রেমা জানে না। জানতে ইচ্ছে হলেও সে প্রশ্ন করবে না। প্রেমা উদাস গলায় বললো,' তখন আমার অভিভাবক আমার নানু আর খালামনি ছিল। আমার ভাবার বা বলার কিছু ছিল না। খালামনি যা চেয়েছেন তাই হয়েছে।

'তুমি এই বিয়েতে সুখী হতে পারোনি তাই না?'

Kobitor.com

তুষারের সহজ/সরল প্রশ্ন! প্রেমা তুষারের চোখের দিকে সরাসরি তাকালো। মানুষটা হঠাৎ করে তার সুখ নিয়ে ভাবছে কেন? সে চোখ নামিয়ে ফেললো। কিছু বললো না। তুষার মিনিট দুয়েক সময় পার করে বললো,' আমাদের বিয়ে হউক তোমার বড় আপা চেয়েছিলেন।'
প্রেমা চকিতে তাকালো। তার চোখ দুটি হঠাৎ করেই জীবন্ত হয়ে উঠে। তুষার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে,প্রেমার মুখটা কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। প্রেমা বললো,'আপা চেয়েছিল?'
তুষার বললো,' তোমার আপা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকলেও তিনি তোমাকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তখন আমার আম্মা আমার বিয়ে নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। বার বার টেলিফোন করতেন। বিয়ের জন্য চাপাচাপি করতেন। আমি বিয়েতে আগ্রহী ছিলাম না। আমার বেড়ে উঠা অন্য দশজনের মতো ছিল না। বাবা ছাড়া শহরে বেড়ে উঠা ছেলেমেয়েগুলো জানে জীবন কতোটা নিষ্ঠুর হতে পারে! তোমার আপা কম কথা বলতেন। কথা বলতে বলতে হুট করে থেমে যেতেন। তার মাঝে আম্মাও কল করতেন অনবরত। তাই একবার আম্মার সাথে চেঁচামেচি করেছিলাম। কিছু কথা তোমার আপার কানে যায়। সেদিনই রাত্রিবেলা হাওলাদার বাড়ি সম্পর্কে বলতে বলতে তোমার আপা থেমে যান। বাকি কথা কিছুতেই বলছিলেন না।
যখন জোর করছিলাম বলার জন্য। আমাকে অনুরোধ করেন, আম্মাকে নিয়ে তোমাকে একবার যেন দেখতে যাই। আর আম্মার পছন্দ হলে যেন বিয়ে করি। ততক্ষণে তোমার সম্পর্কে অনেককিছুই শুনেছি। আমার বিয়ে করাও জরুরি নয়তো আম্মা খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিবেন। অন্যদিকে তোমার আপা নিজ ইচ্ছায় কিছু না বললে কিছু জানাও সম্ভব নয়। তাই কথা দেই,তোমাকে দেখতে যাব। তোমার আপা হাসিমুখে বাকিটুকু বলেন। তিনি যেন নিশ্চিত ছিলেন, আম্মা তোমাকে দেখলে পছন্দ করবে। ঠিক তাই হলো। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি তুমি আর তোমার পরিবার হানি খালামনির বাসায় আছো। আম্মাকেও জানাই,একটা মেয়ে আছে দেখে আসো পছন্দ হয় নাকি। আম্মা তো খুব খুশি। তোমাকে দেখার পর রাত্রে ঘুমাননি। সারারাত তোমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন। বাকিটুকু তো তুমি জানো।'
'আমাকে বিয়ে করাটা অনুগ্রহ ছিল?' প্রেমার কণ্ঠটা কেমন যেন শোনায়।
তুষার কৈফিয়ত দেয়ার মতো বললো,' মোটেও না। আম্মার পছন্দ না হলে বিয়েটা হতো না। তোমার আপাও কিন্তু আমার উপর চাপিয়ে দেননি। বলেছেন,একবার যেন দেখি। পছন্দ হওয়ার পর বিয়ে। আর আমার আম্মার তোমাকে পছন্দ হয়েছে। বরং তোমার সাথে আমাকে মানায় না।'
'কেন মানায় না?' প্রেমা নিজের অজান্তে প্রশ্ন করলো।
তুষার বললো,' আমার বয়স বেশি।'
প্রেমা আর কথা বাড়ালো না। তার ভালো লাগছে! হুট করেই ভীষণ ভালো লাগছে। এমনকি কাঠখোট্টা তুষারকেও এখন তার ভালো লাগছে। সে মৃদু হাসলো। তুষার প্রেমার হাসি খেয়াল করে বললো,' হাসছো যে?'
প্রেমা ঠোঁটে হাসি নিয়ে বললো,' আপনার গোঁফ জমিদারদের মতো বড় বড়।'
প্রেমার কথা শুনে তুষারও হাসলো। পদ্মজা নামটাতে জাদু আছে। তার কথা উঠতেই প্রেমা হেসেছে। জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তুষার বললো,' তোমার নানাবাড়িতে এখন কে কে আছে?'
'নানু আর হিমেল মামা।'
'নানুর কিডনিতে কী না হয়েছিল? অপারেশন হয়েছে শুনেছি। শহরেই মেয়ের কাছে থাকতেন। গ্রামে আসতে গেলেন কেন?'
প্রেমা অবাক হওয়ার ভান ধরে বললো,"আমি কী এখানে থাকি যে জানব?'

প্রেমা থামলো। তারপর আবার বললো,'গত বছর আপা যখন আসছিল গ্রামে। তখন নানু আর মামা খালামনির কাছে ছিল। নানুর অপারেশন তখন হয়েছে। অনেকদিন কেটে গেছে। এখন নানু সুস্থ।গ্রামে সমস্যা হবে না।'
'তোমার নানাকে দেখার ইচ্ছে ছিল। দেখতে পারিনি।' আক্ষেপের স্বরে বললো তুষার।
প্রেমা বললো,' নানা তো দুই বছর আগেই চলে গিয়েছেন। দেখবেন কী করে!'
তুষার ছাউনির বাইরে আঙুলে ইশারা করে বললো,'তোমাদের বাড়ির ঘাট না?'
প্রেমা বাইরে তাকালো। বললো,' হু,এতো জলদি চলে এসেছি!'
তুষার কাপড়ের ব্যাগ হাতে নিয়ে বললো,'কথা বলতে বলতে সময় কেটে গেছে।'
নৌকা মোড়ল বাড়ির ঘাটে এসে থামলো। তুষার মাঝিকে টাকা দিয়ে প্রেমাকে হাতে ধরে নামায়। প্রেমার হাত ধরার সময় তুষারের মনে হলো, এতো কোমল হাত সে কখনো ধরেনি! তাৎক্ষণিক তার বুকের ভেতর কী যেন হয়!

প্রেমা উঠানে পা রাখতেই বাসন্তীর সাথে দেখা হয়। বাসন্তী প্রেমাকে দেখে চমকে যান। হাউমাউ করে কেঁদে উঠেন। প্রেমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন। বাসন্তীর কান্না শুনে রুম্পা আর প্রান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। রুম্পা বারান্দার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। প্রান্ত বাইরে ছুটে আসে। বাসন্তী কাঁদতে কাঁদতে বললেন,'ও মা! মা আমার!'
প্রেমার আকস্মিক আগমন তিনি হজম করতে পারছেন না। মোড়ল বাড়ি মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। মরুভূমির মাঝে প্রেমা যেন জল হয়ে এসেছে! প্রেমা বাসন্তীর পিঠে হাত বুলিয়ে বললো,'শান্ত হও বড় আম্মা। শান্ত হও।'
বাসন্তী প্রেমার কপালে,গালে চুমু দিলেন। তুষার পাশ থেকে সালাম দিল৷ বাসন্তী চোখের জল মুছে তুষারকে বললেন,'ভালো আছো আব্বা?'
'জি আম্মা। আপনি তো অনেক শুকিয়ে গেছেন।'
'মেয়েগুলো কাছে নাই। তারা ভালো নাই। আমি কেমনে ভালো থাকি বাপ?'

প্রেমা প্রান্তর দিকে তাকাতেই প্রান্ত প্রেমার মাথায় থাপ্পড় দিল। বললো,' এতদিন পর আসলি!'
প্রেমা প্রান্তর চুল টেনে ধরে বললো,'একদম মাথায় থাপ্পড় দিবি না। আমার মাথা ব্যথা করে।'
প্রান্ত আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল তুষারকে দেখে থেমে যায়। তুষার হাসতে কার্পন্য করলো না। সে প্রান্তর সাথে হ্যান্ডশেক করে বললো,' দিনকাল কেমন যাচ্ছে?'

কুশল-বিনিময় শেষে বাসন্তী তুষার আর প্রেমাকে নিয়ে বারান্দায় পা রাখলেন। দেখা হয় রুম্পার সাথে। রুম্পার পেট উঁচু হয়েছে। তার গর্ভাবস্থার সাত মাস চলছে। সে এই বাড়িতেই থাকে। হাওলাদার বাড়িতে এখন আর কেউ থাকে না। সাত মাসে অনেক কিছু পাল্টে গেছে। আমিনা আলোকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছেন। বৃদ্ধা নূরজাহান মারা গিয়েছেন৷ বিদেশ থেকে লাবণ্য ও জাফর তাদের স্বামী-স্ত্রী নিয়ে দেশে এসেছিল। দুই সপ্তাহ থেকে আবার ফিরে গিয়েছে। গ্রামবাসী এখন হাওলাদার বাড়িতে যেতে ভয় পায়। সেখানে নাকি আত্মারা ঘুরঘুর করে! প্রেমা রুম্পাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো। কুশল-বিনিময় শেষ করে রুম্পা তুষারকে প্রশ্ন করলো,' উনি ভালা আছে? জেলে খাওনদাওন দেয়? মারে কেউ?'
রুম্পার কণ্ঠে ব্যাকুলতা। তুষার রুম্পাকে আশ্বস্ত করে বললো,'আলমগীর সাহেব ভালো আছেন,সুস্থ আছেন। খাবার দেয়া হয়৷ কেউ মারধোর করে না। আপনি চিন্তা করবেন না।'
রুম্পা হাসলো। আলমগীর সুস্থ আছে এই খবরটুকুই রুম্পার বেঁচে থাকার শক্তি!

সাত মাস পূর্বে, রবিবার দুপুরে মুমিন নামে একজন ব্যাক্তি মজিদের সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখে ফরিনার কবরের পাশে এক মেয়ে শুয়ে আছে। তার পরনের সাদা শাড়ি রক্তে রাঙা। আর কবরের উপর একটা মাথা! মজিদ হাওলাদার মুমিনকে নতুন দারোয়ান হিসেবে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই ডেকে পাঠিয়েছেন। মুমিন এই দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে যায়। জান নিয়ে দৌড়ে পালায়। তারপর ঘন্টাখানেকের মধ্যে হাওলাদার বাড়ির গণহত্যার ঘটনা পুরো অলন্দপুরে ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে লোক জড়ো হয়। পদ্মজা এতো মানুষকে দেখেও নীরব থাকে। তার রূপ হয় রূপকথার অতৃপ্ত অশরীরীর মতো। কেউ কেউ পাথর ছুঁড়ে মারলো,ডাকলো,কুহকিনী, ডাইনি,রাক্ষসী ! থানা থেকে পুলিশ আসে। পদ্মজাকে শহরে নিয়ে যায়। নৃশংস এই খুনের কথা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। টেলিভিশন, রেডিও সব জায়গায় এক কথা,

"অলন্দপুরের ছোট গ্রাম আটপাড়ার হাওলাদার বাড়ির বধূ উম্মে পদ্মজা চলচ্চিত্র অভিনেতা লিখন শাহর সাথে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে খুন করেছে স্বামী,শ্বশুর,ভাসুর ও চাচা শ্বশুরকে। সাথে আরেকটি মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে। তাকে খুন করার কারণ এখনও শনাক্ত করা যায়নি।'

এক দিনের ব্যবধানে পুরো দেশে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। নৃশংস খুনের বর্ণনা শুনে কেউ কেউ রাতে ঘুমাতে পারেনি। গ্রামবাসী তাদের প্রিয় ও মহান মাতব্বরের মৃত্যুতে ভেঙে পড়ে। তারা সমস্বরে চিৎকার করে জানায়,তারা পদ্মজার ফাঁসি চায়। মুহূর্তে পুরো দেশের কাছে কলঙ্কিত হয়ে যায় পদ্মজা। আলমগীর গ্রামে এসে শুনে পুলিশ পদ্মজাকে ধরে নিয়ে গেছে! খুন হয়েছে বাড়ির প্রতিটি পুরুষ। সব শুনে ঘাবড়ে যায় আলমগীর। ফিরে যায় রুম্পার কাছে।
মগা গ্রামে প্রবেশ করতেই পুলিশ তাকে পূর্ণার খুনের দায়ে আটক করে। আলমগীর ঘরে ফিরে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। রুম্পা আলমগীর কে অনেক প্রশ্ন করলো,আলমগীর জবাব দিল না। আমিরের দেয়া নীল খামটির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। এই খামে একটা চিঠি আর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দলিল রয়েছে। চিঠিতে লেখা এক পরিকল্পনা। আর ঘটেছে অন্য ঘটনা! সবাই যেভাবে পদ্মজার উপর ক্ষিপ্ত হয়েছে,ফাঁসি নিশ্চিত! সে চাইলে পদ্মজার ফাঁসি আটকাতে পারে। তার হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু তার জন্য নিজের জীবন ও সংসার ত্যাগ করতে হবে। এতো সাধনার পর পাওয়া নতুন জীবন ভালো করে উপভোগ করার পূর্বে কিছুতেই সে বন্দী হতে চায় না! আলমগীর খাম থেকে চিঠিটি বের করে আরো একবার পড়লো;-

প্রিয় বড় ভাই,
বড় বিপদে পড়ে তোমার সাহায্য চাইছি। এখানে ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। পদ্মজা জেনে গিয়েছে সব সত্য। তোমার চিঠি পাওয়ার পূর্বেই সব জেনেছে। আমি বিস্তারিত কিছু লেখব না। তুমি পরে পদ্মজার কাছে জেনে নিও। আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব। তার আগে আমি চারজনকে হত্যা করতে চাই। তার মাঝে তিন জন পদ্মজার নামে কুৎসা রটিয়েছে। আমি তখন গ্রামে ছিলাম না। ঢাকা গিয়েছিলাম। সেই সুযোগে তারা সুন্দর চাঁদে দাগ ছিটিয়েছে। রবিবারের সকাল আমার দেখা হবে না। আমার বেঁচে থাকা পদ্মজার জন্য হুমকি! সেই সাথে আমার জন্য ভীষণ কষ্টের। আমি তোমাকে কিছু দলিল দিয়েছি। যা প্রমাণ করে আমি একজন নারী পাচারকারী। সেই সাথে এটাও প্রমাণ করে,আমার সাথে কারা কারা ছিল। একটু খুঁজে দেখো দলিলগুলোর মাঝে আরেকটি চিরকুট আছে। সেখানে আমি স্পষ্ট করে আমার সাথে কাজ করা সবার নাম লিখে দিয়েছি। যাদের বর্তমান ঠিকানা জানা আছে সেই ঠিকানাও লিখে দিয়েছি। আমি প্রমাণ সহ স্বীকার করেছি,আমার সব অপরাধ। তোমার নাম সেখানে কোথাও নেই। কোথায় মেয়ে পাচার হয়? কীভাবে হয়? কারা এই কাজের সাথে যুক্ত? আমার জানা সব বিস্তারিত লেখা আছে। আমার দেয়া ঠিকানা অনুসারে

খোঁজ চালালে উদ্ধার হবে,আড়াইশোরও বেশি মেয়ে! তুমি এই চিরকুট নিজের কাছে রেখে আমার স্বীকারোক্তি চিরকুটটি ও সকল দলিল প্রমাণ হিসেবে সকলের সামনে উন্মোচন করবে। রুম্পা ভাবিকে বাঁচিয়ে রাখার অবদান পুরোটাই আমার ছিল। সেই কৃতজ্ঞতা থেকে হলেও তুমি পদ্মজাকে কলঙ্কমুক্ত করো ভাই। পদ্মজাকে নিজের সাথে নিয়ে যেও। দেখে রেখো। তোমার কাছে আমানত রেখে গেলাম।

ইতি,
আমির হাওলাদার

আলমগীর চিঠি মেঝেতে রেখে দুই হাতে মাথা চেপে ধরে। সে মগার থেকে চিঠি পাওয়ার পর পরই আমিরকে বাঁচানোর জন্য বেরিয়ে পড়ে। আমিরকে সে ভীষণ ভালোবাসে। আমিরের আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত আলমগীরকে বসে থাকতে দেয়নি। কিন্তু গ্রামে পৌঁছে শুনলো সব শেষ! পদ্মজা খুন করেছে সবাইকে। আর এখন পদ্মজা মিথ্যা অপবাদে জেলে বাস করছে। এই মুহূর্তে সে যদি এই প্রমাণসমূহ নিয়ে সে পুলিশের কাছে যায়। পুলিশ তাকেও আটক করবে। সে পুলিশকে মিথ্যে বলতে পারবে না। সেই সাহস হবে না। সব সত্য জানার পর তার ফাঁসিও হতে পারে। সে নিজেকে উৎসর্গ করার সাহস পায় না।

পদ্মজার মামলার তর্কবিতর্কে যখন পঁচিশ দিন পার হয় তখন রুম্পা নিজ ইচ্ছায় আলমগীরকে অনুরোধ করলো,আলমগীর যেন পদ্মজাকে বাঁচায়। মিথ্যা অপবাদে পদ্মজার ফাঁসি হতে দেখে সে সুখের সংসার করতে পারবে না। পদ্মজা পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে কাউকে খুন করেনি,এই টুকু সত্য যেন আলমগীর সবাইকে জানায়। আলমগীর রাতেই রুম্পাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে। পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পদ্মজাও তখন সব স্বীকার করেছে। সব প্রমাণ পাওয়ার পর দেশের পরিবেশ পাল্টে যায়। জনগণের মাথায় পড়ে হাত। আমিরের দেয়া তথ্যানুসারে ধরা পড়ে কয়েকটি চক্রের নেতা! তদন্ত চালিয়ে জানা যায়, স্বয়ং বাণিজ্য মন্ত্রী এই চক্রের সাথে জড়িত। উদ্ধার হয় তিনশোরও বেশি অসহায় মেয়ে। কেউ কেউ পলাতক। এই খবর দেশের বাইরেও বেরিয়ে পড়ে। কুয়েত,সৌদি সহ আরো কয়েকটি দেশে তদন্ত শুরু হয়। তারা চিরুনি অভিযান চালিয়ে আমিরের দেয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে মেয়ে সংগ্রহকারীদের খুঁজে চলে। দুজন ধরা পড়ে। বাকিরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। উদ্ধারকৃত মেয়েগুলি নতুন জীবন পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। আমিরের চিঠিতে নতুন গোপন তথ্য ছিল, অন্দরমহলের পিছনে বড় নারিকেল গাছটির নিচে একটি বিশাল গর্ত আছে যেখানে ছুরি,রাম দা,চাপাতি,কুড়াল,চাবুক সহ অনেক অস্ত্র রয়েছে। তুষার অস্ত্রসমূহ উদ্ধার করে,সেই সাথে উদ্ধার হয় পদ্মজার জন্য রেখে যাওয়া আমিরের লাল খামটি! পদ্মজা তখন অস্বাভাবিক ছিল। সে নিজের মধ্যে ছিল না। তাকে হাসপাতালে রাখার আদেশ দেয় আদালত। দেড় মাসের চিকিৎসার পর পদ্মজার শারীরিক ও মানসিক ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা সেড়ে উঠে। আদালত থেকে দশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। আলমগীর রাজ স্বাক্ষী হওয়াতে ফাঁসির বদলে আমৃত্যু কারাদণ্ড হয়। শেষ নিঃশ্বাস অবধি সে কারাগারে কাটাবে। তারপর রুম্পা চলে আসে গ্রামে। গ্রামে আসার এক মাস পর জানতে পারে সে গর্ভবতী। তার শূন্য জীবনে আশার আলো হয়ে আসে সন্তান আগমনের সংবাদ! দেশবাসীর মুখের কথা পাল্টে যায়। তারা পদ্মজার মুক্তি চেয়ে আজও আন্দোলন করে চলেছে!

_____

পরদিন সকাল সাতটা। তুষার খাওয়াদাওয়া করে মাত্র উঠেছে। তখন দুই-তিনটে কুকুরের চিৎকার ভেসে আসে। তুষার দ্রুত বারান্দা থেকে নেমে লাহাড়ি ঘরের দিকে তাকালো। সকালের মিষ্টি

বাতাসে বিষণ্ন এক দৃশ্য চোখে পড়ে। অপরিচ্ছন্ন মৃদুল কুকুরগুলোর সাথে কী নিয়ে যেন তর্ক করছে! মাঝেমধ্যে মাটি ছুঁড়ে মারছে। তুষার
দ্রুতপায়ে মৃদুলের দিকে এগিয়ে যায়। তুষারের পিছন পিছন বাসন্তী ও প্রেমাও গেল। গতকাল রাতে তুষার মৃদুলকে দেখতে এসেছিল।তখন মৃদুল পূর্ণার কবরের পাশে ঘুমাচ্ছিল। জুলেখা বানু ডাকতে নিষেধ করেন৷ তাই তুষার ডাকেনি।

গোঁফ-দাড়ির জন্য মৃদুলকে চেনা যাচ্ছে না। গায়ে মাটি লেগে আছে।
প্যান্টের এক পা হাঁটু অবধি ছেঁড়া। তুষারকে দেখে মৃদুল দুই কদম পিছিয়ে গেল। লাহাড়ি ঘর থেকে জুলেখা বানু বেরিয়ে আসেন। তিনি ভীষণ শুকিয়েছেন। চোখেমুখে আগের সৌন্দর্যটুকু নেই। একমাত্র ছেলেকে রেখে তিনি নিজের বাড়িতে ঘুমাতে পারেন না। মৃদুল মোড়ল বাড়ি ছেড়ে এক পাও নড়ে না। সে তার সুস্থ জীবন পূর্ণার সাথে কবর দিয়েছে। মাস তিনেক আগে মৃদুলকে জোর করে বেঁধে শহরের ডাক্তারের কাছে নেয়া হয়েছিল। ডাক্তারের পরামর্শে তাকে পাগলা গারদে রেখে আসা হয়৷ তিন-চার দিন পার হতেই খবর আসে,দারোয়ান ও দুজন নার্সকে আহত করে মৃদুল পালিয়েছে। জুলেখা বানু এই খবর শুনে অজ্ঞান হয়ে যান। মৃদুলের জ্ঞান সুস্থ নয়৷ সে কী করে গ্রামে ফিরবে? দীর্ঘ পনেরো দিন পর মৃদুলকে এক গ্রামে পাওয়া যায়। জুলেখা বানু কেঁদেকেটে অস্থির হয়ে পড়েন। মৃদুল পাগল থাকুক তাও চোখের সামনে থাকুক সেটাই তিনি চান। তাই মৃদুলকে বাড়ি নিয়ে যান। কিন্তু মৃদুল পূর্ণাকে ছাড়া কিছুতেই খাবে না। তাই বাধ্য হয়ে মৃদুলকে আবার মোড়ল বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। মৃদুল সর্বক্ষণ পূর্ণার কবরের পাশে বসে থাকে। বিড়বিড় করে কিছু বলে। পূর্ণার কবরের চারপাশে গর্ত করে বাঁশ পুঁতেছে তারপর টিনের ছাদ দিয়েছে,যেন পূর্ণা বৃষ্টিতে না ভিজে৷ রাতে পূর্ণার জন্য কিনে আনা লাল বেনারসিটি আঁকড়ে ধরে ঘুমায়। জুলেখা বানু জোর করে দুইবেলা খাইয়ে দেন৷ মাঝেমধ্যে নিজের বাড়িতে যান।
নিজের বিলাসবহুল বাড়ি নিয়ে জুলেখা বানুর অহংকার ছিল। আর আজ ছেলের জন্য তাকে অন্যের বাড়ির লাহাড়ি ঘরে থাকতে হচ্ছে। সন্তানের উপরে যে কিছু নেই! গ্রামের বাচ্চারা মৃদুলকে লাল পাগল ডাকে। লাল পাগল ডাকার কারণ,মৃদুল ফর্সা,সুন্দর! যদিও তার সৌন্দর্য টিকে নেই। গোলাপি ঠোঁট দুটি কালচে হয়েছে। তুষার মৃদুলকে আদুরে স্বরে ডাকলো,' মৃদুল।'
মৃদুল এক নজর তুষারকে দেখলো। তারপর দূরে সরে গেল। তুষার জুলেখা বানুকে প্রশ্ন করলো,'মৃদুল খেয়েছে?'
জুলেখা ভেজা কণ্ঠে বললেন,' না। খায় নাই। কাইল থাইকা খাইতাছে না।'
তুষার কপাল ইষৎ কুঁচকে মৃদুলের দিকে তাকালো। জুলেখাকে আবার প্রশ্ন করলো,'শুনেছিলাম ডাক্তারের কাছে নিয়েছিলেন। ওর অবস্থা কেমন? মাথা কতটুকু কাজ করে?'
জুলেখা বানুর চোখের কার্ণিশে জল জমে। তিনি বললেন,' বাচ্চারাও ওর থাইকা বেশি বুঝে। যত দিন যাইতাছে পাগলামি বাড়তাছে। আমি আর ওর বাপে ছাড়া যে যেইডা কয় ওইডাই বিশ্বাস করে।'
'চাচা কোথায়?'
'বাড়িত। বাড়িঘর জমিজমা দেহন লাগে না? আর কেলা দেখবো? কেউ আছে?' জুলেখার কণ্ঠে অসহায়ত্ব স্পষ্ট।
তুষার মৃদুলের পাশে গিয়ে বসলো। বললো,' আমাকে ভয় পাচ্ছো?'
মৃদুল আড়চোখে তুষারকে দেখলো। মাথা ঝাঁকিয়ে জানালো,সে ভয় পাচ্ছে। হাওলাদার বাড়ির খুঁটিনাটি তদন্ত করতে তুষার যখন অলন্দপুরে এসেছিল তখন মৃদুলের সাথে তার দেখা হয়। তখন

মৃদুলের এতো খারাপ অবস্থা ছিল না। তুষার বললো,'আজ রাজহাঁস জবাই করবো। তুমি আমাকে সাহায্য করবে?'
মৃদুল কিছু বললো না। তুষার বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে বললো,'আম্মা,রাজহাঁস আছে না?'
'আছে আব্বা।' বললেন বাসন্তী।
তারপর তুষার মৃদুলকে বললো,'রাজহাঁস আছে। অর্ধেক আমরা খাব আর অর্ধেক পূর্ণাকে দেব। পূর্ণা রাজহাঁস খেতে পছন্দ করতো। তাই না প্রেমা?'
কোনাকালেই পূর্ণা রাজহাঁস পছন্দ করতো না। তাও প্রেমা তুষারের সাথে তাল মিলালো। তুষার সাবধানে মৃদুলকে বললো,' তুমি যদি আমাকে সাহায্য না করো আর আমার সাথে খেতে না বসো আমি কিন্তু পূর্ণাকে কিছু দেব না। দেখিয়ে দেখিয়ে খাব। তখন পূর্ণা কষ্ট পাবে।'
মৃদুল পূর্ণার কবরে হাত বুলিয়ে দিল। সে চিন্তা করছে কী করবে। অনেকক্ষণ চিন্তা করে সে রাজি হলো। সারাদিন তুষারের সাথে ভালো সময় কাটে। তুষার এমনভাবে কথা বলে,যেন পূর্ণা সত্যি বেঁচে আছে। মৃদুল তুষারের সঙ্গ উপভোগ করে। এক ফাঁকে জুলেখাকে তুষার জানালো,মৃদুলকে ঢাকা নিয়ে গেলে ভালো হয়। আরেকটু চেষ্টা করে দেখা যেত। জুলেখা তুষারের দুই হাত ধরে অনুরোধ করেন,মৃদুলের সুস্থতার জন্য তিনি সবরকম খরচ করতে প্রস্তুত। শুধু মৃদুলকে যেন তুষার সামলায়। তুষার জুলেখাকে আশ্বস্ত করলো। তারপর আটপাড়ায় ঘুরাঘুরি করে জানতে পারলো,মগা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ইয়াকুব আলীর বাড়িতে কাজ নিয়েছে। আর ইয়াকুব আলী অলন্দপুরের মাতব্বর হয়েছেন।

দিনের আলো কেটে রাত নামতেই মৃদুল পূর্ণার কবরের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লো। আর তুষার রাতের খাবার খেয়ে ঘরে আসে। প্রেমা মশারি টানাচ্ছে। বাইরে বিরতিহীনভাবে ঝিঁঝিঁ পোকা ডেকে চলেছে। তাদের ডাকাডাকিতে তুষারের কানে তালা লেগে যাচ্ছে। সে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক পছন্দ করে না। অন্যদিকে প্রেমার ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ভীষণ পছন্দ। সে মুগ্ধ হয়ে শুনে। তুষার দুই কানে আঙুল ঢুকিয়ে বিরক্তি নিয়ে বললো,'পোকাগুলো কি সারারাত ডাকাডাকি করবে?'
প্রেমা বললো,'মাঝরাত অবধি ডাকবে।'
তুষার অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো,'মাঝরাত অবধি জেগে থাকবো?'

'কানে তুলা দিয়ে রাখুন।'

'আছে তুলা?' বললো তুষার।

প্রেমা আলমারি খুলে তুলা বের করে দিল। তুষার প্রেমার কাণ্ডে বিস্মিত! সত্যি সত্যি তুলা দিয়ে দিল! এই মেয়ে নাকি বাকি দুই বোনের চেয়ে লজ্জাবতী আর ভীতু ছিল! অথচ,পদ্মজা আমিরকে লজ্জা পেত। পূর্ণা মৃদুলকে লজ্জা পেত। আর প্রেমা লজ্জা তো দূরের কথা তার চেয়ে এতো বড় মানুষটিকে পরোয়াও করে না। নির্বিকার ভঙ্গিতে থাকে। সময় ও পরিস্থিতি মানুষকে কতোটা পাল্টে দেয়! তুষার তুলা হাতে বসে রইলো। প্রেমা খেয়াল করেও কিছু বললো না।
শোবার সময় প্রেমা প্রশ্ন করলো,'আপার কারাদণ্ডর সময় কি কমানো যায় না?'
'কমতে পারে। মনে হয় না এতদিন জেলে রাখবে। অনেক সময় যতদিন জেল হওয়ার কথা ততদিন হয় না।"
'এমনও হয়?'
'হয়। মেয়াদের আগে মুক্তি পেয়ে যায় অনেকে। তাছাড়া লিখন শাহ দৌড়াদৌড়ি করছেন,জনগণও চাইছে সাজা কমানো হউক। কমবে নিশ্চয়ই।'

'আপা কি জেল থেকে বের হয়ে লিখন ভাইয়াকে বিয়ে করতে রাজি হবে?'
'আমার যতটুকু ধারণা, রাজি হবে না। লিখন শাহ আশা নিয়ে বসে আছেন। পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। পদ্মজা লিখন শাহকে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন ।'
প্রেমা উৎসুক হয়ে জানতে চাইলো,'কী লেখা সেখানে?'
তুষার চেয়ার ছেড়ে বিছানায় এসে বসলো। বললো,' আমি পড়িনি। পিন্টুকে দিয়ে পাঠিয়েছি।'
প্রেমা ছোট করে বললো,'ওহ।'
তারপর প্রশ্ন করলো,'গত কয়েকদিনের মধ্যে আপার সাথে দেখা হয়েছে?'
'হ্যাঁ,গতকাল বিকেলেই দেখা হয়েছে। তিনি আমাকে দেখলেই গুটিয়ে যান। পর পুরুষের উপস্থিতি পছন্দ করেন না। তাই না?'
প্রেমা হেসে মাথা ঝাঁকালো। আবার পদ্মজার কথা শুনে প্রেমা হেসেছে! তুষার প্রেমাকে ভালো করে খেয়াল করলো। পদ্মজার মুখের ছাপ প্রেমার মুখে আছে। প্রেমা সবসময় সোজা সিঁথি করে বেণি করে। শাড়ি পরে বলে বয়সের তুলনায় একটু বেশি বড় লাগে। এই যা...হুট করে প্রেমাকে বড় মনে হচ্ছে কেন? এতদিন তো শাড়ি পরাই দেখেছে। বড় তো লাগেনি! এ কোন কেরামতি! তুষার মুচকি হাসলো। প্রেমা তুষারকে তার দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখে বললো,' হাসছেন কেন?'
তুষার টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো। প্রসঙ্গ পাল্টে বললো,' আমির হাওলাদার তিনটে বিয়ে করেছেন। আমি হলে চারটে বিয়ে করতাম। চার বিয়ে করা সুন্নত!'
প্রেমা বাঁকা চোখে তুষারের দিকে তাকালো। বললো,' করুন গিয়ে। তবে ভাইয়ার প্রথম দুটো বিয়ের কোনো মূল্য নেই। ভাইয়ার বউ একমাত্র আমার আপা।'
তুষার এক হাতে মাথার ভর দিয়ে প্রেমার দিকে ফিরে বললো,'কেন মূল্য নেই?'
'ইসলামে পালিয়ে বিয়ে করার মূল্য নেই। মেয়ের অভিভাবক লাগে। ভাইয়ার দুটো বউ বাসায় কিছু না বলে বিয়ে করেছে। তাই হাশরের ময়দানে আমির ভাইয়ার বউ শুধু আমার আপা!' কথাটা প্রেমা ভাব নিয়ে বললো।

তুষার আবার হাসলো। সোজা হয়ে শুয়ে চোখ বুজলো। মাঝে দূরত্ব রেখে প্রেমাও শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর তুষার বললো,'প্রেমা? '

প্রেমা জেগেই ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে বললো,'সাত দিনের কথা তো আজ একদিনে বলে ফেলছেন!'

প্রেমার কণ্ঠে ঝাঁঝ। তার মনে তুষারের জন্য কতো রাগ জমে আছে টের পাওয়া যাচ্ছে। কেন এতো রাগ? সে কি গত চার মাসে তুষারের সঙ্গ পাওয়ার আশা করে বার বার নিরাশ হয়েছে? সত্যি এমন কিছু হয়েছে? তুষার ভাবলো। অদ্ভুত বিষয় প্রেমার মুখের ঝাঁঝালো কথাগুলো তুষারের ভালো লাগছে। সর্বনাশ! তবে কি সেও মরণ প্রেমে পড়তে যাচ্ছে! পরিণতি আমিরের মতো হবে নাকি মৃদুলের মতো? নাকি আরো ভয়ানক?
হঠাৎ নীরবতা ভেঙে তুষার বলে উঠলো, 'জানো প্রেমা,ভালোবাসার ব্যাখা ও রূপের বাহার পর্যবেক্ষণ করতে গেলে মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে যায়।'
তুষারের গলার স্বরটা পরিবর্তন হয়েছে। কোমল হয়েছে! সে এতো পাল্টে গেল কী করে? প্রেমা বললো,'কেন এমন হয়?'

তুষার শূন্যে চোখ রেখে বললো,'ভালোবেসে মানুষ পাগল হয়,ভালো হয়,খারাপ হয়, নিঃস্ব হয় এমনকি নিজের জীবনকেও হত্যা করতে দুইবার ভাবে না! কী অদ্ভুত!'

তুষারের কথাগুলো প্রেমার ভালো লাগছে। সে তুষারের দিকে ফিরলো। তুষারও প্রেমার দিকে তাকালো। প্রেমা বললো,'যে ফাঁসে সে জানে,ভালোবাসা বড়ই অদ্ভুত!'

কী সুন্দর কথা! কত মোহনীয় তার কণ্ঠ! তুষার ধীর স্বরে বললো,' কাউকে ভালোবেসেছো?'

প্রশ্নটি শুনে প্রেমার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠে। সে দ্রুত অন্যদিকে ফিরে চোখ বুজলো। কী করে সে বুঝাবে, তুষারের প্রেমে পড়ে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে তার হৃদয়! তার ব্যথিত হৃদয় তারই অজান্তে তুষারের প্রেমে কবেই পড়েছে! তুষার প্রেমার পিঠের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার কেন যেন মনে হলো,প্রেমা তার চোখের দৃষ্টি আড়াল করেছে!

_____

লিখনের মা ফাতিমা ঘরের জিনিসপত্র ভাংচুর করছেন। তিনি তৃধার সাথে লিখনের বিয়ে ঠিক করেছেন। কিন্তু লিখন বিয়ে করবে না। সে পদ্মজার জন্য অপেক্ষা করছে। পদ্মজা জেল থেকে বের হলে তাকেই বিয়ে করবে। ফাতিমা একজন খুনি,বিবাহিত,এক বাচ্চার মাকে কিছুতেই ছেলের বউ হিসেবে মেনে নিতে রাজি নন। লিখন যেরকম নাছোড়বান্দা তার মা তেমন নাছোড়বান্দা। ফাতিমা কঠোরভাবে জানিয়েছেন,যদি লিখন পদ্মজাকে বিয়ে করে তিনি আত্মহত্যা করবেন। সম্মান নষ্ট হওয়ার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়! এতেও লিখন ভ্রুক্ষেপ করলো না। সে পাগল হয়ে আছে। আমির নেই। এবার সে পদ্মজাকে পাওয়ার স্বপ্ন দেখতেই পারে। জীবন তাকে একটা সুযোগ দিয়েছে। সে সেই সুযোগ এড়াতে পারবে না। এতদিন দূরে থেকেছে পদ্মজার স্বামী ছিল বলে। এখন পদ্মজা একা। তার স্বামী মৃত। পদ্মজাকে বিয়ে করে তাকে একটা নতুন জীবন উপহার দিবে,সেই সাথে নিজের ক্ষত হৃদয় সাড়িয়ে তুলবে। লিখন বৈঠকখানাতে গিয়ে বসলো। যেদিন জানলো পদ্মজা জেলে। সেদিন থেকে সে দৌড়ের উপর আছে। অসুস্থ শরীর নিয়ে খাওয়াদাওয়া বাদ দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করেছে। একদিকে পদ্মজার ফাঁসি হওয়ার আশঙ্কা অন্যদিকে মিথ্যা বদনামে তার ক্যারিয়ার নষ্ট হওয়ার পথে! ভাগ্য সহায় ছিল,তাই দুটোর কোনোটিরই ক্ষতি হয়নি। এজন্য খোদার দরবারে হাজার হাজার শুকরিয়া! দ্বিতীয় তলা থেকে ফাতিমার চিৎকার ভেসে আসে,'এই মেয়ের জন্য আমার ছেলে জীবনে প্রথমবার আহত হয়ে হাসপাতালে ছিল। এমন অশুভ মেয়েকে আমি আমার ছেলের জীবনে মেনে নেব না। তুমি তোমার ছেলেকে সামলাও।' ফাতিমাকে তার স্বামী সামলানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু পারছেন না।
দরজায় কলিং বেল বেজে উঠে। আশেপাশে কেউ নেই। লিখন কয়েকবার তাদের বাসার কাজের মেয়েটিকে ডাকলো। তারও খোঁজ নেই। লিখন বিরক্তি নিয়ে দরজা খুলতে গেল। দরজার সামনে তার বাড়ির দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা খাম। লিখন প্রশ্ন করলো,'কে দিয়েছে?' দারোয়ান বললো,'তুষার সাহেব পাঠিয়েছেন।'
লিখন খামটি হাতে নিয়ে বললো,'আচ্ছা,যাও।'
লিখন দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে চলে আসে। খামটি বিছানায় উপর রেখে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। নিজেকে দেখার সময় সে তার পাশে পদ্মজাকেও দেখতে পায়। তার জীবনে কিছুর অভাব নেই। শুধু একটাই অভাব, পদ্মজার অভাব! সে তার পরনের শার্ট খুলে গোসলখানায় গেল। গোসল করে কোমরে তোয়ালে পেঁচিয়ে তারপর খামটি হাতে নিল। খামের ভেতর চিঠি! লিখন আগ্রহ নিয়ে চিঠির ভাঁজ খুললো:-

সম্মানিত লিখন শাহ,

আমার সালাম নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। সর্বপ্রথম বলতে চাই,আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আমি আপনাকে এবং আপনার অনুভূতিকে সম্মান করি। বাধ্য হয়ে কারাগারে থাকা অবস্থায় আপনাকে চিঠি লিখতে হলো। শুনেছি,আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আপনি আমাকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু কিছু স্বপ্ন নিষিদ্ধ! আপনি এমন এক আশায় নিষ্পাপ একটি মনকে আঘাত করছেন যে আশা পূরণ হওয়ার নয়। আপনার সাথে আমার বিয়ে হলে আগেই হতো। আমার মনপ্রাণ একজনের প্রেমে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সেই ছাই কী করে আবার আপনি পুড়াবেন? মানুষ এক জীবনে সবকিছু পায় না। প্রতিটি মানুষের জীবনে কিছু না কিছুর অভাব থাকে। এক-দুটো অভাব নিয়ে বেঁচে থাকা খুব বেশি কঠিন নয়। যে আপনাকে ভালোবাসে তাকে আপনি ভালোবাসুন। যে আপনার জন্য মরতে প্রস্তুত তার জন্য বুকের এক টুকরো জায়গা দলিল করে দিন। তৃধা মেয়েটি ভীষণ ভালো। আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। সে আপনাকে খুব ভালোবাসে। তার ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হওয়ার। অথচ,সে মেডিকেলের পড়া ছেড়ে মিডিয়ায় যোগ দিয়েছে! কতোটা ভালোবাসা থাকলে মানুষ এরকম করে? আপনি নিজেও স্বীকার করতে বাধ্য তৃধা আপনাকে ভালোবাসে! সে আপনার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। তৃধাই আপনাকে উজাড় করে ভালোবাসতে পারবে। আমাদের জুটি হওয়া সম্ভব নয়। এ স্বপ্নকে আর দূরে যেতে দিয়েন না। আমার সর্বত্র জুড়ে একটি নাম। আমি একটি মানুষের জন্যই আকুল। আমি হাজার চেষ্টা করেও আপনাকে এক টুকরো ভালোবাসা দিতে পারবো না। তখন ভালোবাসা অভিশাপে পরিণত হবে। চিন্তা করে দেখুন, আমাদের সত্যি বিয়ে হলে কেউ সুখী হবে না। না আপনি হবেন, না আমি হবো। আর না আপনার পরিবার আর তৃধা সুখী হবে। আমি বলছি না আমার কথায় তৃধাকে বিয়ে করতে,ভালোবাসতে। ভালোবাসা জোর করে হয় না। তবে বিয়েতে আল্লাহ তায়ালা নিজে রহমত ঢেলে দেন। ভালোবাসা ঢেলে দেন। জীবনকে একটা সুযোগ দিয়ে দেখুন। আমার আম্মা বলতেন,পৃথিবীতে মানুষ দায়িত্ব নিয়ে আসে। সেই দায়িত্ব শেষ হয়ে গেলে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। হয়তো আমার কোনো দায়িত্ব বাকি! তাই এখনো বেঁচে আছি। যদি সত্যি দশ বছর পর পৃথিবীর বুকে মুক্ত হয়ে হাঁটার সুযোগ পাই,আমি আপনাকে আমার পাশে দেখতে চাই না। আমি আমার স্বামীর স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই। এই বাঁচায় সুখ না থাকুক,স্বস্তি আছে। আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে সেই স্বস্তিটুকু কেড়ে নিবেন না। আপনি আমার জীবনের গল্পটির একটা পৃষ্ঠা মাত্র! আমি আমার শেষ জীবনটুকু নিজের মতো কাটাতে চাই। পাষাণের মতো কথা বলার জন্য আমি দুঃখিত! আপনার জীবন ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে উঠুক। পরিবারকে সময় দিন।

ইতি,
পদ্মজা

লিখনের চোখ থেকে দুই ফোঁটা জল চিঠির উপর পড়ে! কী নিষ্ঠুর প্রতিটি শব্দ! লিখন চিঠিটি রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালো। ধূলো উড়িয়ে বাতাস ছুটছে। আজ রাতে ঝড় হতে পারে! তার বুকেও ঝড় বইছে। নিজেকে পৃথিবীর উচ্ছিষ্ট মনে হচ্ছে! পদ্মজা তার জন্য চাঁদই রয়ে গেল আর সে গরীব ব্রাহ্মণ!

_____

শেষ পর্বের দ্বিতীয় অংশ রাত নয়টার পর আসবে। পদ্মজা হাওলাদার বাড়ির যে খুনটা করেছিল বা যে অবস্থায় খুন করেছিল তাকে কাল্পেবল হোমিসাইড বলা হয়। এর সাজা সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন অথবা দশ বছরের জেল। কোর্ট চাইলে আরো কম সাজাও দিতে পারে।

আমি পদ্মজা
শেষ পর্ব (দ্বিতীয় ও শেষ অংশ)

_____

২০০৯ সাল। দেখতে দেখতে কেটে গেল তেরোটি বছর। পদ্মজা দরজা খুলে বারান্দায় দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ি কুয়াশা হাড় কাঁপানো শীত নিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে। পদ্মজা দুই হাতে চাদর টেনে ধরলো। যত দূর চোখ যায় কেবল সবুজের হাতছানি। চা বাগানের সারি সারি টিলা, আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ আর ঘন সবুজ অরণ্য! আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি কত সুন্দর! রঙহীন ধূসর কুয়াশাও চা বাগানের সৌন্দর্য আড়াল করতে পারলো না। কুয়াশার জন্য যেন অন্যরকম সুন্দর লাগছে। এই অপরূপ সৌন্দর্য যে কাউকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম । তবে বৃষ্টিস্নাত পাহাড়ি সৌন্দর্য সবচেয়ে বেশি সুন্দর। পদ্মজা দুই পা তুলে বেতের চেয়ারে বসলো। তার মুখ শুষ্ক। আজ তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় প্রিয়তমর মৃত্যুবার্ষিকী! প্রিয়তম মারা গিয়েও যেন সর্বত্র বিছিয়ে রেখে গেছে ভালোবাসার ডালপালা। পদ্মজা সময়-অসময়ে,কারণে-অকারণে বার বার সেসব ডালপালার বেড়াজালে আটকে পড়ে। নিজেকে বড় নিঃস্ব মনে হয়।

পদ্মজা তার হাতের লাল খামটি থেকে দুটো চিঠি বের করলো। সে প্রতিদিন এই চিঠি দুটো পড়ে দিন শুরু করে। যতক্ষণ পড়ে,মনে হয় যেন আমিরের সাথে কথা বলছে! তার একদম পাশ ঘেঁষে ফিসফিসিয়ে আমির বলছে,',পদ্মবতী,ভালোবাসি।'
পদ্মজা চিঠি দুটিতে প্রথমে চুমু দিল। তারপর একটি চিঠির ভাঁজ খুললো। শুরুতে কোনো সম্বোধন নেই। অদ্ভুত একখানা চিঠি। চিঠিও বলা যায় না,এক পৃষ্ঠায় লেখা এক রাজা ও রানির গল্প। পদ্মজা পড়া শুরু করলো-

"এক ছিল দুষ্টু রাজা! নারী আর টাকার প্রতি ছিল তার চরম আসক্তি। যে নারী একবার তার বিছানায় যেত তার পরের দিন সে লাশ হয়ে নদীতে ভেসে যেত। রাজা এক নারীকে দ্বিতীয়বার ছুঁতে পছন্দ করতো না। কিন্তু সমাজে ছিল রাজার বেশ নামডাক! সবার চোখের মণি। খুন করা ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী। তার কালো হাতের ছোঁয়ায় বিসর্জন হয়েছে শত শত নারী। প্রতিটি বিসর্জন রাজার জন্য ছিল তৃপ্তিকর। নারী ব্যবসায় লাভবান হয়ে গড়ে তুলে প্রাসাদের পর প্রাসাদ! একদিন চাচাতো ভাইয়ের সাথে বাজি ধরে হেরে গেল রাজা। শর্তমতে,ভাইয়ের জন্য এক রাজকন্যাকে অপহরণ করতে যায়। সেদিন ছিল বৃষ্টি। সন্ধ্যার আগ মুহূর্ত। রাজকন্যার প্রাসাদে সেদিন কেউ ছিল না। রাজা এক কামরায় ওৎ পেতে থাকে। রাজকন্যা আসলেই তাকে তার কালো হাতে অপবিত্র করে দিবে। কামরায় ছিল ইষৎ আলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর সেই কাঙ্খিত মুহূর্ত আসে। রাজকন্যার পা পড়ে কামরায়। রাজকন্যা রাজাকে দেখে চমকে যায়। ভয় পেয়ে যায়। কাঁপা স্বরে প্রশ্ন করে "'কে আপনি? খালি বাড়িতে কেন ঢুকেছেন?" সেই কণ্ঠ যেন কোনো কণ্ঠ ছিল না। ধনুকের ছোঁড়া তীর ছিল। রাজার বুক ছিঁড়ে সেই তীর ঢুকে পড়ে। রিনঝিনে গলার রাজকন্যাকে দেখতে রাজা আগুন জ্বালায়। আগুনের হলুদ আলোয় রাজকন্যার অপরূপ মায়াবী সুন্দর মুখশ্রী দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে যায়। তার পা দুটো থমকে যায়। রাজকন্যা যেন এক

গোলাপের বাগান। যার সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে রাজার কালো অন্তরে। রাজা নেশাগ্রস্তের মতো উচ্চারণ করলো নিজের নাম। নাম শুনেও রাজকন্যার ভয় কমলো না। পালিয়ে গেল অন্য কামরায়। রাজা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না রাজকন্যার মুখ। তার চেনা পৃথিবী চুরমার হয়ে যায়। রাজকন্যার কামরার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে মুহূর্তের পর মুহূর্ত। সেদিনই ঘটে গেল দূর্ঘটনা। রাজ্যবাসী শূন্য প্রাসাদে দুষ্টু রাজা ও মিষ্টি রাজকন্যাকে এক সঙ্গে দেখে ফেললো। রাজকন্যার গায়ে লেগে গেল কলঙ্ক। কয়েকজন অমানুষ রাজকন্যাকে নোংরা ভাষায় হেনস্তা করলো। সেই দৃশ্য দেখে রাজার বুকে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। সে নিজ প্রাসাদে ফিরে এক দণ্ডও শান্তি পেল না। তার চাচাতো ভাইকে তাৎক্ষণিক আদেশ করলো যারা রাজকন্যাকে তাদের মুখ দিয়ে অপমান করেছে তাদের যেন জিহবা ছিঁড়ে ফেলা হয়,যে হাত দিয়ে রাজকন্যাকে ছুঁয়েছে সে হাত যেন কেটে দেয়া হয়, যে চোখ দিয়ে রাজকন্যাকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখেছে সে চোখ যেন উপড়ে ফেলা হয়। ভোররাতে দুষ্টু রাজা খবর পেল, রাজকন্যার মাতা সেই অমানুষ দের হত্যা করেছে। এতে রাজা খুশি হলেও রাজকন্যার মাতাকে নিয়ে একটা চাপা ভয় কাজ করে। কিন্তু বেশিক্ষণ রাজকন্যার মাতাকে নিয়ে ভাবলো না। রাজকন্যাকে যে ভোলা যাচ্ছে না। তাকে যে করেই হউক পেতে হবে। নয়তো জীবন বৃথা। রাজা তার পিতাকে আদেশ করলো, মায়াবতী রাজকন্যাকে তার চাই ই চাই। নয়তো সে বাঁচবে না। এই পৃথিবী তোলপাড় করে দিবে। রাজার পাগলামি দেখে অবাক তার পরিবার। সালিশ বসে। সালিশে সেই দুষ্টু রাজা রাজকন্যার মাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে রেহাই পেয়ে,জিতে নিল রাজকন্যাকে। তিনি এক কথায় রাজকন্যাকে দিতে রাজি হলেন। আনন্দে রাজার বুকে উথাল ঢেউ শুরু হয়। কী অসহ্য সুখময় যন্ত্রণা! রাজা এর আগে এতো খুশি হয়েছে নাকি জানা নেই! যথাসময়ে তাদের বিয়ে হলো। রাজকন্যা রাজার রানী হলো। নাম তার পদ্মবতী। ফুলের মতো পবিত্র সে,সদ্যজাত শিশুর মতোই নিষ্পাপ। রাজা ভুলে গেল নারী সঙ্গের কথা,ভুলে গেল তার রাজত্বের কথা। তার ধ্যানজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়ে গেল পদ্মবতীতে। পদ্মবতীর একেকটা কদম রাজার বুকে ঢেউ তুলে,পদ্মবতীর প্রতিটি নিঃশ্বাস থেকে যেন ফুল ঝরে পড়ে। পদ্মবতীর পায়ে চুমু দেয়ার সময় রাজার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়,'পদ্মবতী...আমার রানী,আমি কাঁটা বিছানো বাগানে শুয়ে থাকি তুমি আমার বুকে হেঁটে বেড়াও।'

ধীরে ধীরে রাজা উপলব্ধি করতে পারলো, তার পদ্মবতী পবিত্র। এতোই পবিত্র যে সে কখনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করবে না।
এই পবিত্রতা রাজাকে আরো আকৃষ্ট করে ফেললো। সেই সাথে রাজা ভয় পেল,তার কালো অন্তরের খবর যদি পদ্মবতী জেনে যায়
তখন কী হবে? কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। ধরে বেঁধে রাখা গেলেও পদ্মবতীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এই বিচ্ছেদ সহ্য করার ক্ষমতা তার হবে না। নির্ঘাত মরে যাবে। যে ভালোবাসা নিজ ইচ্ছায় তাকে বিমুগ্ধ করে তুলে,সে ভালোবাসা জোর করে সে কখনো নিতে পারবে না। রাজা তার পাপ লুকিয়ে রাখতে মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা অভিনয় করা শুরু করলো। পদ্মবতীর থেকে সহানুভূতি আর বিশ্বাস অর্জন করতে গল্প বানালো। তার পাপের মহলে নিরাপত্তা বাড়িয়ে দিল। প্রয়োজনে সে পৃথিবীর প্রতিটি মানব সন্তানকে খুন করতে প্রস্তুত,তাও তার পাপের জন্য পদ্মবতীকে হারাতে চায় না।
যথাসম্ভব পদ্মবতীকে নিয়ে দুষ্টু রাজা অন্য রাজপ্রাসাদে চলে আসে। সেই প্রাসাদে রাজা আর তার পদ্মবতী ছাড়া কেউ নেই! ভালোবাসার সোহাগ ও খুনসুটিতে ভরে উঠে তাদের ঘর। রাজার দৃষ্টি ডুবে যায় একজনেতে! কোনো নারী আর তাকে টানতে পারলো না। প্রতিটি প্রহর পদ্মবতীকেই নতুন করে অনুভব করে। নারী আসক্তি চিরতরে তাকে ছেড়ে গেল। কিন্তু নারী ব্যবসা রয়েই

গেল। সৎ পেশার অজুহাতে অসৎ পেশা জ্বলজ্বল করে তখনো জ্বলছিল। মাঝেমধ্যে রাজার ভয় হতো,পদ্মবতী সব জেনে যাবে না তো? রাজা সব রকম পট্টি বেঁধে দিল পদ্মবতীর চোখে। পদ্মবতী সেই পট্টিসমূহ ভেদ করে পৌঁছাতে পারলো না গভীরে! ভালোবাসার বেড়াজালেই আটকে রইলো।

বছর দেড়েক পর তাদের ঘর আলো করে এলো এক রাজকন্যা। রাজকন্যা ছিল মায়ের মতোই সুন্দর। আকাশে একটা চাঁদ উঠে,কিন্তু রাজার আকাশে উঠেছিল দুটো চাঁদ! ছোট্ট রাজকন্যাকে দেখে রাজার বুক কেঁপে উঠে। তৃতীয়বারের মতো কোনো মেয়ের প্রতি সে ভালোবাসা অনুভব করে। তার প্রথম ভালোবাসা তার মা,দ্বিতীয় ভালোবাসা স্ত্রী, আর তৃতীয় ভালোবাসা তার কন্যা! রাজা যতবার রাজকন্যাকে কোলে নিত, বুকে একটা ব্যথা অনুভব করতো। বার বার মনে হতো, আমার জগৎ-সংসার একটু সাধারণ হতে পারতো না? এই চিন্তা তার অসৎ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তার দলবল চিন্তিত হয়ে পড়ে। কাজের প্রতি রাজার উদাসীনতা তাদের ক্ষিপ্ত করে। পূর্ব ক্ষোভের জেদ ধরে তারা রাজার দূর্বলতা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে মারে। সেই তীরে ছোট্ট রাজকন্যার প্রাণের আলো নিভে যায়। রাজার বুক থেকে একটা চাঁদ খসে পড়ে! পদ্মবতী ভেঙে গুড়িয়ে যায়। পদ্মবতীর ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা রাজার নেই। শক্ত দুই হাতে আঁকড়ে ধরে পদ্মবতীকে। তার কন্যার খুনিকে সে নিজ হাতে কোপাতে পারলেও,খুনের আদেশ দাতাদের হত্যা করতে পারলো না। জানতে পারলো তার পিতা,চাচা ও চাচাতো ভাইয়ের আদেশে তার রাজকন্যার চোখ দুটি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে! ততদিনে রাজা এটাও বুঝে গেল, যে জগতে সে প্রবেশ করেছে সেই জগতের শেষ পরিণতি মৃত্যু। সে যদি খুনের আদেশ দাতাদের ক্ষতি করে তার ব্যবসা ডুবে যাবে। ব্যবসার খুঁটি সে হলেও, আদেশ দাতারা সেই খুঁটি ধরে রেখেছে। আর ব্যবসার পতন মানে পদ্মবতীর সব জেনে যাওয়া। সেই সাথে অন্য রাজাদের ক্ষোভের শিকার হওয়া। যে রাজাদের সাথে মিলে দুষ্টু রাজা পাপ জমায় তারা হিংস্র হয়ে উঠবে। আর তারা দুষ্টু রাজার উপর ক্ষিপ্ত হলে ক্ষতি হবে পদ্মবতীরও। এতোজনকে রুখতে যাওয়ার ক্ষমতা দুষ্টু রাজার নেই। আবার মাথার উপর আছে শাসকের আদালত! একমাত্র রাজার মৃত্যু পারে তার কন্যার খুনীদের ধ্বংস করতে। কিন্তু রাজা নিজেকে উৎসর্গ করতে চায় না। পদ্মবতীর সাথে সারাজীবন বাঁচতে চায়। তাই রাজা ধামাচাপা দিল রাজকন্যার ব্যথা! বাবা হিসেবে হেরে গেল,চুপসে গেল। অভিশাপ সেই রাজাকে। অভিশাপ!
"

পদ্মজা চিঠির উপর হাত বুলিয়ে দিল। যখন সে প্রথম এই বাস্তব রূপকথা পড়েছিল,সাদা অংশে শুকনো রক্ত লেগে ছিল। তার প্রিয় স্বামীর রক্ত! আমিরের শরীরে পাওয়া গেছে অগণিত কামড়ের দাগ,চাবুক মারার দাগ,ছুরির আঘাতের দাগ। সে নিজেকে শেষ দিনগুলোতে অনেক আঘাত করেছে। নিজেকে রক্তাক্ত করে পাতালঘরে আর্তনাদ করেছে। পদ্মজা হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছে দ্বিতীয় চিঠিটি হাতে নিল। ভাঁজ খুললো,

"
প্রিয়র চেয়েও প্রিয় পদ্মবতী,
আমার পাপের রাজত্বে তোমার আগমন ভূমিকম্পের মতো ছিল। যখনই দেখি তুমি দাঁড়িয়ে আছো,আমার হৃৎপিণ্ড থমকে যায়। চোখের সামনে ছয় বছরে গড়ে তোলা ভারী দেয়াল ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

আমার চোখের মণি পদ্মজা,তোমার ওই দুচোখের অবিশ্বাস্য চাহনি আমাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। আমার কথা হারিয়ে যায়। আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। খারাপের মাঝেও ভালো থাকার মন্ত্র ছিল তোমার দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে যখন ঘৃণা দেখতে পাই,আমার বুক পুড়ে যায়। আমার মস্তিষ্ক ফেটে যায়!

তোমার আহত মুখশ্রী দেখে আমার শরীরের চামড়া ঝলসে যায়। তোমার চোখের জল দেখে সমুদ্র আছড়ে পড়ে মাথার উপর। আমার মিথ্যাচার, আমার প্রতারণা তোমাকে কষ্টের ভুবনে ছুঁড়ে ফেলে। বিষাদের ছায়া ঢেকে যায় তোমার চোখ। সেই বিষাদটুকু মুছে দেয়ার অধিকার আমি হারিয়ে ফেলি। যদি পারতাম আকাশের মেঘ হয়ে তোমার কাজলকালো আঁখি ছুঁয়ে সবটুকু বিষাদ ধুয়েমুছে সাফ করে দিতাম।

আমার প্রথম ও শেষ ভালোবাসা, তুমি একটু দূরে সরলেই যে আমি মনে মনে পুরো পৃথিবী ভস্ম করে দেয়ার ইচ্ছে পুষি, সেই আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম,তোমার-আমার পথচলা এখানেই শেষ! আমি শান্ত পাথরের মতো স্থির হয়ে যাই। গন্তব্য হারিয়ে ফেলি। এই ভুবনে তুমি আমার শেষ আশ্রয়স্থল ছিলে। আম্মার সাথে তখন যোজন যোজন দূরত্ব। তোমার ঘৃণাভরা চাহনি আমাকে চোখের পলকে পুড়িয়ে দেয়। তোমার আমার বিচ্ছেদ আমাকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয়, প্রেমানলে জ্বলতে জ্বলতে আমি অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছি।

সোনালি রোদ্দুরের মতো সুন্দর পদ্মবতী, আমি তোমাকে আঘাত করে নিজে মরে গিয়েছি। যে হাতে আঘাত করেছি সেই হাত পুড়ে যাক,পোকামাকড় খাক! তোমাকে ব্যথা দিয়ে আমি ভালো নেই। ছুরির আঘাতও আমার মনের ব্যথার চেয়ে বেশি হতে পারছে না। যদি পারতাম হয় তোমাকে ভালোবাসতাম ,নয় শুধু হাওলাদার বংশে জন্ম নিতাম। দুটো একসাথে গ্রহণ করতাম না। দুই সত্ত্বা মস্তিষ্কের দ্বন্দ্বে আমাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

আমি নিষ্ঠুর,তুমি মায়াবতী
আমি ধ্বংস,তুমি সৃষ্টি
আমি পাপ,তুমি পবিত্র

এতো অমিলে কেন হলো মিলন? কেন কালো অন্তরে ছড়িয়েছিল ফুলের সুবাস? আমাকে ধ্বংস করার কি অন্য কোনো অস্ত্র ছিল না? এমন কঠিন কষ্ট কেন দেয়া হচ্ছে আমাকে? তোমার ব্যথায় আমি দগ্ধ হচ্ছি। তোমার কান্না,তোমার আর্তনাদ আমার মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরনকে কাঁপিয়ে তুলে। মনে হয়,মাথার ভেতর পোকারা কিলবিল করছে৷ বিচ্ছেদের বিষাক্ত ছোবলে নীল হয়ে যাচ্ছি আমি। আমাকে বাঁচাও!

শূন্য আকাশে গাঙচিল যেমন একা আমিও তেমন একা। প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে অনুশোচনায় দগ্ধ করে। একাকী নীরবে সহ্য করি। এটাই তো আমার প্রাপ্য। মেয়েগুলোকে বাঁচাতে চেয়েও বাঁচাতে পারিনি। বুকের উপর পাথর চেপে পাঠিয়ে দিয়েছি বহুদূরে। যখন তাদের জাহাজে তুলে দিয়েছি আমার দিকে করুন চোখে তাকিয়ে ছিল। ব্যথিত হৃদয় প্রথমবারের মতো অনুভব করে, তারাও তো আমার মতো কষ্ট পাচ্ছে! কিন্তু তখন আমার আর সামর্থ্য ছিল না।

আমার জীবনের বসন্তকাল তুমি। তোমার অসহ্য আলিঙ্গন আমার সহ্যের বাইরে ছিল। তোমার আর্তনাদ করে পালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করা আমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেয়। সত্যি যদি পারতাম,পালিয়ে যেতে! কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। আমার আকাশ সমান পাপ আমার পিছু ছাড়বে না। আজীবন দৌড়াতে হবে। এক দন্ডও শান্তি মিলবে না।

মেঘলা বরণ অঙ্গের সাম্রাজ্ঞী, তোমার ভালোবাসার সাম্রাজ্যে কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলাম শত জনম। হলো না। তোমার চোখের খাদে পড়ে থাকতে চেয়েছিলাম আজীবন। তাও হলো না। সময় এসেছে আমার বিদায়ের! আমাদের পথচলা এতটুকুই। আমি ছিলাম দূর্গের মতো কঠিন। সেই দূর্গ তুমি ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছো। ভালোবাসা আমার হাঁটু ভেঙে দিয়েছে। আমার আর উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ নেই। শেষ বারের মতো তোমাকে ছুঁয়ে যেতে চাই। আমার প্রেম তুমি,আমার ভালোবাসা তুমি। সত্যি বলছি,আমার জীবনে আসা প্রতিটি নারী আমাকে নয় আমার হারাম টাকার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাদের আমি কিনে নিয়েছি। শারমিন আর মেহুল দুজনকে বাড়ি উপহার দিয়ে তারপর আমাকে বিয়ে করতে হয়েছে। তাও আমি অপরাধী। আমি তাদের ঠকিয়েছি, প্রতারণা করেছি,খুন করেছি। আমি অনুতপ্ত। বড্ড আফসোস হচ্ছে,বড্ড আক্ষেপ থেকে গেল। ওপারেও আমি তোমাকে পাবো না! আমার মতো ঘৃণিত ব্যাক্তি তোমার পাশে দাঁড়াতে পারবে না। আমার জায়গা হবে,জাহান্নামের কোনো এক দুর্গন্ধময় জগতে! তোমাকে দেখার তৃষ্ণা , তোমাকে ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার মিটলো না। হয়তো সহস্র বছরেও মিটবে না।

আমার হৃদয়ের রঙহীন বাগানের রঙিন প্রজাপতি, সাদা শাড়িকে তোমার সঙ্গী করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দুঃখিত। তুমি মুক্ত হবে। পাখির মতো উড়বে। শুধু আমি থাকবো না পাশে। আফসোস!

চিঠির শেষ প্রহরে এসে হাত কাঁপছে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। এই পৃথিবীতে আমি আরেকটু থাকতে চাই। এই পৃথিবীর সবুজ বুকে তোমাকে নিয়ে প্রতিটি ভোর হাঁটতে চাই। আমাদের ভালোবাসার জ্যোৎস্না রাতগুলো আরেকটু দীর্ঘ হলে কী এমন হতো? আমাদের প্রেমের পরিণতি এতো নিষ্ঠুর কেন হলো?
তোমার ওই ঘোলা চোখের মায়াজাল ছেড়ে চলে যেতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু যেতে হবেই। আর থাকা যাবে না। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। তোমার কোনো ক্ষতি হওয়ার আগে,আমাকে সব কীটদের নিয়ে এই পৃথিবী ছাড়তে হবে।

আমার আঁধার জীবনের জোনাকি, সৃষ্টিকর্তাকে বলো আমাকে যেন আরেকটা সুযোগ দেয়া হয়। এই পৃথিবীতে আবার যেন পাঠানো হয়।
পৃথিবীর বুকে তো জায়গা, সম্পদের অভাব নেই। আরেকটা জীবন কি পেতে পারি না? তখন আমি কঠিন পরীক্ষা দেব। তোমাকে পেতে আগুনের উপর দিয়ে হাঁটবো, ভাঙা কাচের ধারে পা ছিন্নভিন্ন করে হলেও তোমাকে জিতে নেব। থাকবে না কোনো অন্ধকার জগতের হাতছানি,তৈরি হবে তোমার আমার প্রেমের উপাখ্যান। আমাদের ভালোবাসা দেখে জ্যোৎস্না ও তারকারাজি ঝলমলিয়ে ওঠবে।

আমাদের আবার দেখা হবে। কোনো না কোনো ভাবে আবার দেখা হবে। দেখা হতেই হবে। নিজের খেয়াল রেখো। ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করো। পূর্ণা,মা হেমলতার কাছে নিশ্চয়ই ভালো

আছে৷ চিন্তা করো না। পারলাম না আরো কয়টা দিন তোমাকে আগলে রাখতে। ক্ষমা করো আমায়। অতৃপ্ত আমি মৃত্যুকে তৃপ্তি হিসেবে গ্রহণ করছি।

ইতি,
আমির হাওলাদার "

চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠে,আমিরের শেষ চাহনি। রক্ত বমি করে মাটিতে লুটিয়ে পড়া! ভেসে উঠে সেই শিশি। যে শিশির উপরে বড় বড় করে লেখা ছিল Poison (বিষ)। পদ্মজা দুটো চিঠি বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলো। তারপর শূন্য আকাশে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। এই চিঠি যেদিন প্রথম পড়লো সে,চিৎকার করে কেঁদেছে। সে আমিরকে খুন করে অনুতপ্ত নয়। সে কাঁদে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে!
দরজায় ঠকঠক শব্দ হচ্ছে৷ পদ্মজা দ্রুত চিঠি দুটো ভাঁজ করে খামের ভেতর রেখে দিল। গলার স্বর উঁচু করে বললো,'বলো বুবু।'
দরজার ওপাশ থেকে লতিফার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে,'মাহবুব মাস্টার আইছে?'
পদ্মজা বললো,'নাস্তা তৈরি করো। আমি আসছি।'

পদ্মজা চোখের পানি মুছে ঘরে আসলো। আয়নায় দেখলো,সে যে কেঁদেছে বুঝা যাচ্ছে নাকি। না বুঝা যাচ্ছে না। গায়ের শালটি রেখে আলনা থেকে আরেকটি কালো শাল নিয়ে ভালো করে মাথা ঢেকে নিল। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। বৈঠকখানার সামনে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। মাহবুব মাস্টার বসে আছেন। তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তিনি অংকের মাস্টার। পদ্মজা আর তিনি এক স্কুলের শিক্ষক। ভালো পড়ান। তার সামনে বসে আছে তিনটি ছেলেমেয়ে। এই তিনজনকে পড়ানোর জন্যই পদ্মজা মাহবুব মাস্টারকে ডেকেছে। মাহবুব মাস্টার বারো বছরের ছেলেটিকে আগে প্রশ্ন করলেন,'তোমার নাম কী?'
ছেলেটি প্রবল উৎসাহ নিয়ে বললো,'আমার নাম নুহাশ হাওলাদার। আর ওর নাম...'
মাহবুব নুহাশকে থামিয়ে দিলেন। বললেন,'তুমি শুধু তোমার নাম বলো। অন্যজনেরটা বলতে বলিনি। কাঁটা থুতুনি তোমার নাম কী?'
'আমীরাতুন নিসা নুড়ি।' নুড়ি অবাক হওয়ার ভান করে নিজের নাম বললো। তার থুতনিতে গর্ত আছে বলে কি তাকে কাঁটা থুতুনি ডাকতে হবে! সে মনে মনে ব্যথা পেয়েছে। নুড়ির পাশে বসে থাকা দশ বছরের মেয়েটি বললো,'আমার নাম জিজ্ঞাসা করছেন না কেন? আমি সবার ছোট। আমার নাম খাদিজাতুল আলিয়া।'
মাহবুব মাস্টার চোখের চশমা ঠিক করে বললেন,'ভীষণ বেয়াদব তো! এতো অধৈর্য্য কেন তুমি?'
নুহাশ আলিয়ার মাথায় থাপ্পড় দিয়ে বললো,' মা কী বলছে মনে নেই? বেশি কথা বলতে নিষেধ করেনি?'
আলিয়া কটমট করে নুহাশের দিকে তাকালো। নুহাশ বললো,' খেয়ে ফেলবি আমাকে?'
আলিয়া খামচে ধরলো নুহাশের মাথার চুল। নুহাশও আলিয়ার চুল খামচে ধরে। দুজন ধস্তাধস্তি করে মেঝেতে শুয়ে পড়ে। তারা দুজন কথায় কথায় ঝগড়া বাঁধিয়ে ফেলে। মাহবুব মাস্টার আঁতকে উঠলেন,হইহই করে চিৎকার করে উঠলেন। পদ্মজা পর্দা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে নুহাশ ও আলিয়া থেমে গেল৷ সোজা হয়ে দাঁড়ালো। নুড়ি দুই চোখ খিঁচে চাপাস্বরে নুহাশকে বললো,'দিলি তো মা কে রাগিয়ে!'

মাহবুব মাস্টার হতবাক! পদ্মজার মতো নম্রভদ্র শিক্ষিকার এমন উশৃংখল ছেলেমেয়ে! তিনি চশমা ঠিক করতে করতে বললেন,' এত অসভ্য এরা!'
পদ্মজা শীতল চোখে নুহাশ ও আলিয়ার দিকে তাকালো। তারা নতজানু হয়ে আছে। পদ্মজা বললো,' সবাই ভেতরে যাও।'
পদ্মজার কণ্ঠে রাগের আঁচ। তা টের পেয়ে আলিয়ার চোখে জল জমে। প্রায় প্রতিদিন নুহাশ আর তার ঝগড়া হয়। ঝগড়ার জন্য শাস্তি পায় তবুও ভুলে ভুলে আবার ঝগড়া করে ফেলে। তারা চুপচাপ ঘরের ভেতর চলে গেল। পদ্মজা মৃদু হেসে মাহবুব মাস্টারকে বললো,' ওরা একটু ক্ষেপা ধরণের। ভাইবোন একসাথে থাকলে যা হয়!'
'শয়তানদের মেরুদণ্ড সোজা করতে করতে চুল পেকেছে আমার। এদেরও কয়দিনে সোজা করে ফেলবো।'
'আগামীকাল থেকে আর দুষ্টুমি করবে না। আপনি একটু ভালো করে পড়াবেন। আমার তিনটা ছেলেমেয়েই অংকে কাঁচা।'
'আপনি আমাকে বলেছেন, এতেই যথেষ্ট। অংক ওদের প্রিয় সাবজেক্ট না বানাতে পারলে আমি মাহবুব মাস্টার না।'
পদ্মজা জোরপূর্বক হাসলো। মাহবুব মাস্টার একটু বেশি কথা বলেন। যাওয়ার পূর্বে মাহবুব মাস্টার বলে গেলেন, আগামীকাল থেকে প্রতিদিন সকাল সাতটায় অংক পড়াতে আসবেন।

পড়ন্ত বিকেল! আলিয়া ছবি আঁকছে। সে খুব ভালো ছবি আঁকে। বর্ণনা শুনে হুবহু ছবি আঁকতে পারে! গায়ের রং শ্যামলা। তার নাম আমিরের নামের সাথে মিল রেখে আলিয়া রাখা হয়েছে। পদ্মজা পাঁচ বছর জেলে ছিল। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তার নিঃস্ব জীবনে রুম্পার ছেলে নুহাশের আগমন হয়। রুম্পা নুহাশকে জন্ম দিয়েই মারা যায়। চার-পাঁচ বছর লতিফা আর বাসন্তী নুহাশকে দেখেছে। তারপর পদ্মজা দায়িত্ব নিলো। নুহাশ আর লতিফাকে নিয়ে চলে আসে চা বাগানের দেশ সিলেটে। তার নামে যত সম্পত্তি আমির লিখে দিয়েছিল সেসব পদ্মজা সরকারের দায়িত্বে দিয়েছে।এবং অন্দরমহল ও অলন্দপুরের জমিজমা বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে এতিমখানা,মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ করেছে। গরীবদের খাবার,জামা-কাপড় দান করেছে। একটি পয়সাও নিজের জন্য রাখেনি। খালি হাতে সিলেট এসেছে। সিলেটে পদ্মজার রেনু নামে এক বান্ধবী ছিল । তারা একসাথে ঢাকা পড়েছে। রেনুর সহযোগিতায় পদ্মজা একটা বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক হয়। মাস তিনেক পার হতেই পদ্মজা অনুভব করলো,তার বেঁচে থাকা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছে। তাই নুহাশকে নিয়ে ঢাকা ঘুরতে যায়। কথায় কথায় পদ্মজা তুষারকে জানালো,সে একটা মেয়ে বাচ্চা দত্তক নিতে চায়। তুষার এ কথা শুনে বললো,পদ্মজা চাইলে তাদের এলাকার এতিমখানা থেকে বাচ্চা নিতে পারে। তুষারের ভালো পরিচিতি আছে। প্রতি মাসে সে তার বেতনের একাংশ এতিমখানায় দেয়। পদ্মজা কথাটি শুনে খুব খুশি হলো। তুষারের সাহায্যে এতিমখানা থেকে আড়াই বছরের এক শ্যামবর্ণের মেয়েকে দত্তক নিয়ে নিজের মেয়ে মনে করে বুকে জড়িয়ে নেয়। নাম দেয়,খাদিজাতুল আলিয়া। যেদিন আলিয়াকে নিয়ে বাসায় আসে সেদিন রাতে টের পেল,আলিয়ার শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে। পদ্মজা এরপর দিন সকালে আবার এতিমখানায় গেল। আলিয়ার শ্বাসকষ্ট নিয়ে কথা বলতে। তারা চিকিৎসা করেছে নাকি? ঔষধের নামগুলো কী?

সব জেনে যখন সে এতিমখানা থেকে বের হতে উদ্যত হলো তখন তার পিঠের উপর একটা নুড়ি পাথর এসে পড়ে। পদ্মজা পিছনে ফিরে নুহাশের বয়সী একটা মেয়েকে দেখতে পেল। মেয়েটির

থুতনির গর্তটি তার পায়ের তলার মাটি কাঁপিয়ে তুলে। হুবহু আমিরের কাঁটা দাগটির মতো! এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়,তার আর আমিরের সন্তান দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজার বুকের ভেতরটা হাহাকার
করে উঠে। মেয়েটি দৌড়ে পালায়। পদ্মজা মেয়েটিকে খুঁজে বের করে। তারপর এতিমখানার দায়িত্বে থাকা কতৃপক্ষকে অনুরোধ করলো, এই মেয়েটিকেও সে দত্তক নিতে চায়। পদ্মজার দূর্বলতা টের পেয়ে লোকটি,বিরাট অংকের টাকা চেয়ে বসে। পদ্মজা বাধ্য হয়ে আশা ছেড়ে দেয়। তবে যে কয়টাদিন ঢাকা ছিল,নিজের অজান্তে বোরকা পরে বার বার এতিমখানার সামনে গিয়ে ঘুরঘুর করেছে। তারপর ফিরে আসে সিলেট। মাস তিনেক অনেক চেষ্টা করেও বাচ্চা মেয়েটির মুখ ভুলতে পারলো না। তার বুকের ভেতর ছোট মেয়েটি যেন আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছে। পদ্মজা আবার ঢাকা গেল। নিজ থেকে তুষারকে বললো মেয়েটিকে আনার ব্যবস্থা করে দিতে। তুষার ও প্রেমা দুজনই পদ্মজার অস্থিরতা গভীর ভাবে টের পেল। তুষার দ্রুত সম্ভব মেয়েটিকে নিয়ে আসে। মেয়েটিকে হাতের কাছে পেয়ে পদ্মজা কেঁদে দেয়। খুশিতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। নুড়ি পাথরের জন্য মেয়েটিকে পাওয়া বলে,তার নাম দিল আমীরাতুন নিসা নুড়ি।
এই হলো পদ্মজার তিন সন্তানের মা হওয়ার গল্প। সিলেটে তাকে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সব সমস্যা পেরিয়ে আজ সে এক বেসরকারি স্কুলের সহকারী শিক্ষিক। বিশাল চা বাগানের মধ্যিস্থলে এক কোয়ার্টারে তারা থাকে। তাদের বাড়িটি এক তলা।

পদ্মজা রাতের রান্না করছে। আলিয়া ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে পদ্মজাকে দেখছে। নুহাশ ভয়ে তাকাচ্ছেই না। পদ্মজা যখন রেগে যায়। কথা বলা বন্ধ করে দেয়। আর পদ্মজা দূরত্বের রেখা টেনে দিলে তার তিন ছেলেমেয়েদের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। নুড়ি আড়চোখে পদ্মজাকে দেখে আলিয়াকে ফিসফিসিয়ে বললো,'মা কষ্ট পেয়েছে।'
আলিয়ার চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে। সে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো,' আমি মা কে কষ্ট দিতে চাইনি।'
নুহাশ ব্যথিত স্বরে তাল মিলালো, 'আমিও চাইনি।'
আলিয়া চিৎকার করে উঠলো,'তোমার জন্য হয়েছে ভাইয়া৷ তুমি আমাকে রাগিয়েছো।'
নুড়ি ঠোঁটে এক আঙুল রেখে ইশারা করে চুপ হতে৷ আলিয়া দ্রুত এক হাতে নিজের মুখ চেপে ধরে। সে ভুলে ভুলে আবার চিৎকার করে উঠেছে! নুহাশ ঠোঁট টিপে হাসলো। আলিয়া ভুল করলে তার ভালো লাগে। নুড়ি রান্নাঘরে গিয়ে পদ্মজাকে বললো,' মা,আমি সাহায্য করবো?'
পদ্মজা বললো,' না মা,আমি আর তোমার লুতু খালামনি আছি। বই পড়তে বলেছিলাম পড়া হয়েছে?'
নুড়ি জিহবা কামড়ে বললো,' আল্লাহ! ভুলে গেছি মা।'
'কতদিন বলেছি,ছুটির দিন পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্য বই পড়তে? ভুলে গেলে চলবে? আমাদের ভালো অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।'
নুড়ি মিইয়ে যাওয়া গলায় বললো,'আর ভুল হবে না।'

পদ্মজা নুড়ির দিকে তাকালো। সবেমাত্র বয়সসন্ধিকালে পা দিয়েছে মেয়েটা। তার ফর্সা সাধারণ মুখশ্রী থুতুনিতে থাকা খাঁচ কাঁটা দাগটির জন্য অসাধারণ হয়ে উঠেছে। মাথায় চুল কোঁকড়া। হাত-পা চিকন চিকন। নুড়ি পদ্মজাকে এভাবে তাকাতে দেখে বিব্রতবোধ করলো। পদ্মজা চোখের দৃষ্টি সরিয়ে বললো,' বাঁদর দুটোকে গিয়ে বল,যদি আমার হাতে মার খেতে না চায় অযু করে জায়নামাযে যেন বসে। এক্ষুনি মাগরিবের আযান পড়বে।'

নুড়ি মাথা নাড়িয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। পদ্মজা চোখ ছোট করে বললো,' কী হলো?'
'মা,আমি নামায আদায় করতে পারবো না।'
পদ্মজা রেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল,তখনই বুঝতে পারলো নুড়ি কেন নামায আদায় করতে পারবে না। সে আমুদে স্বরে বললো,' ও তাহলে আপনি এজন্যই আজ এতো চুপচাপ?'
নুড়ি দাঁত বের করে হাসলো। নুহাশ,আলিয়ার চেয়েও নুড়ি বেশি দুষ্ট। রাগ,জেদ খুব বেশি। তবে পদ্মজার সামনে ভেজা বিড়াল। সে আর যাই করুক,পদ্মজাকে কখনো কষ্ট দিতে চায় না। নিজের অজান্তেও না।
রাতের খাবার পরিবেশন করার সময় লতিফা বললো,' প্রান্ত কোনদিন আইবো কইছে?'
'আগামী মাসে আসবে। ভাবছি,এইবার গ্রামে গিয়ে প্রান্তর বিয়ে দেব। জমিজমা নিয়েই সারাক্ষণ পড়ে থাকে। ধরেবেঁধে বিয়ে দিতে হবে।'
'বউ কোন এলাকার আনবা?'
পদ্মজা হাসলো। বললো,'প্রান্ত যা চায়।'
ধপাস করে কিছু একটা পড়ে! নুহাশ আর আলিয়া আবার দুষ্টুমি শুরু করেছে। লতিফা বিরক্তি নিয়ে বললো,' ওরা দিন দিন খালি শয়তান অইতাছে।'
'শয়তান বলতে মানা করেছি। আল্লাহর রহমতে আমার ছেলেমেয়েরা আমার গর্ব হবে। আমি টের পাই।'
পদ্মজা এই তিন বাঁদর ছেলেমেয়ের মুখে অলৌকিক কী দেখেছে লতিফার জানা নেই। শুধু এইটুকু জানে,এরা তিনজন যেখানে যায় সে জায়গায় তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। লতিফা জোর গলায় বললো,' দেহো পদ্মজা,আমি কিন্তু হুদাই কইতাছি না। দিন দিন আরো বিগড়ে যাইবো।'
পদ্মজা লতিফার কথা পাত্তা দিল না। সে খাবার পরিবেশন শেষে ঘরে চলে যায়। একদিন নুহাশ ও আলিয়াকে রাগ দেখিয়ে চলতে হবে। নুহাশ খাবার খেতে এসে বললো,' লুতু খালামনি,মা খাবে না?'
লতিফা বললো,'না,খাইবো না। তোমরা দুইডায় যেমনে মাস্টারের সামনে পদ্মর মুখ কালা করছো। পদ্ম খাইবো কেন? হে গুসা করছে।'
আলিয়া পদ্মজার ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে বললো,' তাহলে আমরাও খাব না।'
নুড়ি বললো,' তাহলে আরো বেশি রাগ করবে। আরো বেশি কষ্ট পাবে।'
মনে ব্যথা নিয়ে মুখ গুমট করে তারা দুজন খেল। খাওয়াদাওয়া শেষ করে তিনজন ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। পদ্মজা প্রতিদিন ঘুমাবার পূর্বে তাদের গল্প বলে। গত এক মাস ধরে পদ্মজা একটা গল্প বলছে। গল্পটা এক দুষ্টু রাজা ও এক মিষ্টি রানির। ভালোবাসা সত্ত্বেও রানি রাজাকে খুন করে। তারপর রানির কারাদণ্ড হয়। কারাদণ্ড হওয়ার পর কখন মুক্তি পেল? পরের জীবনটা কীভাবে কাটলো? বললো না পদ্মজা। সেটা জানার জন্য তিনটি ছেলেমেয়ে উদগ্রীব হয়ে আছে। পদ্মজা বলেছিল আজ বলবে, কিন্তু বলার সুযোগই পেল না। নুহাশ ও আলিয়া রাগিয়ে দিল। নুড়ি দরজা লাগিয়ে নুহাশ ও আলিয়াকে ডাকলো। একত্রে বসার পর নুড়ি বললো,'আজ বাবার মৃত্যুবার্ষিকী। তাই কিছু বলার দরকার নেই। কাল সকালে তোরা দুজন মার পায়ে ধরে ফেলবি।'
নুড়ি কথা শেষ করে হাত তালি দিল। যেন সব সমস্যা শেষ! নুহাশ ভ্রু কুঁচকে বললো,'মা,পা ধরে ক্ষমা চাওয়া পছন্দ করে না।'
নুড়ির হাসি মিলিয়ে গেল। আলিয়া বললো,'পেয়েছি,আমরা সব বই পড়ে শেষ করে ফেলবো। মা খুশি হবে।'
'বছর পার হয়ে যাবে। মা এক বছর রেগে থাকবে?' বললো নুড়ি।

তারা ঘন্টাখানেক আলোচনা করলো। কোনো পরিকল্পনাই চূড়ান্ত হলো না। একজনের পছন্দ হয় তো অন্যজনের হয় না। হুট করে তারা পদ্মজার গলার স্বর শুনতে পেল। পদ্মজা লতিফাকে বলছে,' লুতু বুবু,বাড়ির বড় বিড়ালদের বলে দাও তাদের ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে।'
নুহাশ,নুড়ি ও আলিয়া দ্রুত লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। পদ্মজা মাঝ রাতে নিজ ঘর থেকে বের হয়। লতিফা জেগে ছিল। তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করছে। পদ্মজার সংস্পর্শে এসে তার মুখের আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া সব পাল্টে গেছে। রিনুকে বিয়ে দিয়েই সে পদ্মজার সঙ্গী হয়েছে। লতিফা জায়নামাজ ছেড়ে উঠতেই পদ্মজা বললো,' আমি বের হচ্ছি। আমাকে না পেয়ে ওরা যেন বের না হয়। আশেপাশের অবস্থা ভালো না। পাশের এলাকায় পর পর দুটো লাশ পাওয়া গেছে। এখানে আবার কোন চক্রান্ত চলছে কে জানে! দরজা বন্ধ করে রেখ।'
'তুমিও যাইয়ো না পদ্ম।'

পদ্মজা শুনলো না। প্রথমে ছেলেমেয়েদের ঘরে গেল। নুড়ি ও আলিয়া এক বিছানায় ঘুমাচ্ছে। আর নুহাশ পাশের বিছানায়। পদ্মজা ঘুমন্ত তিন ছেলেমেয়ের কপালে চুমু দিয়ে আলতো করে মুখ ছুঁয়ে দিল। এই তিনটে ফুটফুটে ছেলেমেয়েকে সে ভীষণ ভালোবাসে। তাদের জন্য পদ্মজা নিজের জীবন কোরবান দিতেও প্রস্তুত। জীবনে যতটুকু আনন্দ আছে তার পুরোটা অবদান নুড়ি,নুহাশ আর আলিয়ার। পদ্মজা অনেকক্ষণ বসে রইলো। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো বাইরে। কোয়ার্টার ছেড়ে বের হতেই নিঃসঙ্গতা কামড়ে ধরে তাকে। আমিরের প্রতিটি মৃত্যুবার্ষিকীর রাত সে খোলা আকাশের নিচে কাটায়। চোখ বন্ধ করে অনুভব করে ফেলে আসা স্মৃতিগুলো। এই সময়টুকু একান্ত তার আর আমিরের।
ঘন্টাখানেক হেঁটে এসে এক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ালো পদ্মজা। এই পাহাড়টি এখানকার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। একটা মই হলেই যেন আকাশ ছোঁয়া যাবে। আকাশের গায়ে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলজ্বল করছে। এর মাঝে কোন তারাগুলো পদ্মজার প্রিয়জন? পদ্মজা এক হাত আকাশের দিকে বাড়িয়ে ভেজা কণ্ঠে উচ্চারণ করলো,'আমার প্রিয়জনেরা!'

তার এই দুটি শব্দে প্রকাশ পায় ভেতরের সব দুঃখ,যন্ত্রণা, অভাববোধ। মা-বাবা,বোন,স্বামী,শ্বাশুড়ি সবাই আকাশটাতে থাকে। শুধু সে জমিনে রয়ে গেছে। পদ্মজা চোখ বুজলো। সাঁইসাঁই করে বাতাস বইছে। বাতাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঠান্ডায় শরীরে কাঁটা দিচ্ছে। চোখের পাতায় দৃশ্যমান হয়,হেমলতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,রুক্ষমূর্তি, পূর্ণার আহ্লাদ, হাসি,আমিরের ছোঁয়ার বাহানা,বুকে নিয়ে কান্না থামানো। কত সুন্দর অতীত! কতোটা সুন্দর! পদ্মজা চোখ খুললো। তার ঘোলা দুটি চোখ জলে ভরে উঠেছে। সে শিশির ভেজা ঘাসের উপর বসলো। দিনটা কেটে যায়, রাতটা তার কাটে না। আমির শয়নেস্বপনে রাজত্ব করে। পদ্মজা অসহায় চোখ দুটি মেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ করে যদি তার স্বামীর মুখটা ভেসে উঠতো! কেমন আছে সে? পদ্মজার দুই চোখ বেয়ে জলের ধারা নামে। নীরবে কাঁদতে থাকে। কী ভীষণ অসহায় দেখাচ্ছে তাকে! দিনের আলোয় দেখা কঠিন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, রাগী পদ্মজা রাতের বেলায় এমন অসহায় হয়ে কাঁদে কেউ বিশ্বাস করবে? করবে না।
পদ্মজা হাঁটুতে মুখ গুঁজে স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ সে কারো উপস্থিতি টের পেল। তার দিকে কেউ হেঁটে আসছে। গত দুই সপ্তাহে দুটো খুন হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে পাশের এলাকায়। এলাকাটি খুব কাছে। লাশের ছবি দেখে বুঝা গেছে,কেউ বা কারা দেশে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে। সেই সাথে লাশের শরীরের ক্ষতস্থান দেখে মনে হয়েছে,হত্যাকারী বা হত্যাকারীরা শয়তানের উপাসনা করে। পদ্মজার মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়। সে তার কোমরের খাঁজে থাকা খাপ থেকে

ছুরি বের করলো। তারপর দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো। দেখলো নুড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে কালো বোরকা। নুড়িকে দেখে পদ্মজা অবাক হয়। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে অবাকের ছাপটা মুখ থেকে সরেও গেল। নুড়ি প্রায় সময় তাকে অনুসরণ করে। সে পদ্মজাকে একা ছাড়তে নারাজ। পদ্মজা ঘাসের উপর বসতে বসতে বললো,' পিছু নিতে না করেছিলাম।'
নুড়ি কিছু বললো না। পদ্মজাও চুপ রইলো। নুড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকালো। নুহাশ ও আলিয়া দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চেয়েও দূরে দাঁড়িয়ে আছে লতিফা। লতিফা নুড়িদের আটকানোর চেষ্টা করেছে৷ কিন্তু বাঁদরদের সে আটকে রাখতে পারলো না। পারে তো তারা লতিফার হা-পা বেঁধে ফেলে। নুড়ি সাবধানে ডাকলো,'মা?'
পদ্মজা দূরে চোখ রেখে নির্বিকার কণ্ঠে বললো,' বল।'
'বাবার জন্য কাঁদছিলে?'
পদ্মজা নিরুত্তর। নুড়ি সময় নিয়ে দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করলো,' দুষ্টু রাজাটা বাবা আর মিষ্টি রানীটা তুমি তাই না আম্মা?'
পদ্মজা চমকে তাকালো। অপলকভাবে তাকিয়েই রইলো। নুড়ি কী করে জানলো,তাদেরকে বলা গল্পটি তাদেরই মায়ের গল্প! নুড়িকে দেখলে মনে হয় না,সে যে পদ্মজা ও আমির হাওলাদারের নিজের মেয়ে নয়। নুড়ির চোখের দৃষ্টি ঈগলের মতো। যেমন চঞ্চল তেমন সাহস। সে ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আশেপাশে যা কিছুই ঘটুক সর্বপ্রথম তার চোখে ধরা পড়ে। পদ্মজা নুড়ির প্রশ্ন এড়িয়ে চুপচাপ বসে রইলো। নুড়ি সংকোচ নিয়ে বললো,' মা,তুমি সোয়েটার পরোনি। ঠান্ডা লাগবে।'
পদ্মজা খাপে ছুরি রেখে বললো,' নুহাশ আর আলিয়াও এসেছে?'
নুড়ি মাথা ঝাঁকালো। পদ্মজা নুড়িকে নিয়ে নিচে নেমে আসে। নুহাশ ও আলিয়ার সামনে এসে তিনজনের উদ্দেশ্যে বললো,'সাহসী সঠিক সময়ে হতে বলেছি। এই রাতের বেলা ঝুঁকি নিয়ে মায়ের পিছু নিতে নয়।'
লতিফা এগিয়ে এসে বললো,' তোমারে লইয়া হেরা চিন্তাত আছিলো। খুনটুন যে হইলো গত সপ্তাত এর লাইগগা।"
পদ্মজা ভ্রু উঁচিয়ে বললো,' তাহলে ওরা আমাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে এসেছে?'
নুড়ি,নুহাশ ও আলিয়া ভয়ে একজন আরেকজন চাওয়াচাওয়ি করলো। পদ্মজা হেসে তিনজনকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বললো,' আমার সাহসী বাচ্চারা! কিন্তু এতো রাতে আসা একদম ঠিক হয়নি। হ্যাঁ আমারও ঠিক হয়নি। আমরা কেউই আর ভুল করবো না। ঠিক আছে?'
তিনজন সমস্বরে বললো,'ঠিক আছে মা।'

পদ্মজা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাহাড় ছেড়ে সমতলে নামে। পথে আলিয়া বললো,'মা,একটা কথা বলবো।'
পদ্মজা আদুরে স্বরে বললো,'বলো বাবা।'
'মজনু স্যার রূপকথা দিদিকে কিছু বলেছে মনে হয়।'

পদ্মজার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। মজনু তার স্কুলেরই একজন শিক্ষক। নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রীদের বাংলা পড়ায়। তার নামে অনেক অভিযোগ আছে। ছাত্রীদের হ্যারাস করে। শরীরে বিভিন্ন অজুহাতে হাত দেয়। বিয়ে করেছে দুটি। অনেক মেয়ে মজনুর জন্য স্কুলে আসা ছেড়ে দিয়েছে। তারা কিছু বলতেও পারে না,সইতেও পারে না। মাস ছয়েক আগে স্কুলের এক মেয়ে দাবি করেছে,সে গর্ভবতী। মজনু তাকে ভয় দেখিয়ে অনেকবার শারিরীক সম্পর্ক করেছে। মজনু

অস্বীকার করে। উল্টো সমাজে মেয়েটির বদনাম হয়। তাকে আর স্কুলে দেখা যায়নি। পদ্মজা সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য মেয়েটিকে খুঁজেছে। কিন্তু পেল না। তার পরিবারকেও পেল না। মজনু পদ্মজার সাথে ঘেঁষার চেষ্টাও করেছে অনেকবার। চরিত্রহীন,লম্পট পুরুষ সে। পদ্মজা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ পাঠিয়েছিল,লাভ হয়নি। মজনু সিলেটের এমপি সুহিন আলমের শালা। এজন্যই পদ্মজার অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হয়নি। এমনকি সেই মেয়েটির পরিবার নাকি মামলা করেছিল,সেই মামলাও ধামাচাপা পড়ে যায় সুহিন আলমের ক্ষমতার কাছে। তাই মজনুর নাম উঠতেই পদ্মজা বিচলিত হয়ে উঠে। বললো,'কেন এমন মনে হলো?'
নুড়ি মাথা নিচু করে বললো,'রূপকথা দিদিকে ডেকেছিল মনে হয়। অনেকক্ষণ পর দিদি দ্বিতীয় ভবন থেকে বের হয়। তখন দিদি কাঁদছিল। দিদির চুল ঢোকার সময় খোঁপা ছিল বের হওয়ার সময় এলোমেলো ছিল।'
আলিয়া বললো,'আমি আর নুড়ি আপা রূপকথা দিদিকে টিফিন টাইমে জাম গাছের পিছনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখেছি মা।'
পদ্মজা তাদের মেয়েদের আশ্বস্ত করলো। বললো,সব ঠিক হয়ে যাবে। সারা রাত পদ্মজা এ নিয়ে ভেবেছে। মজনুকে আর সহ্য করা যায় না। মেয়েগুলোর জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলোকে দূষিত করে ফেলছে! আবর্জনা বেশিদিন রাখা ঠিক হচ্ছে না। চারপাশে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে! পরদিনই স্কুলে গিয়ে পদ্মজা রূপকথাকে ডেকে পাঠালো। রূপকথা হিন্দু ধর্মালম্বী। খুব সুন্দর মেয়ে। রূপকথার ধর্মের ভাষায় বলা যায়, সে দেবীর মতো সুন্দর! নবম শ্রেণিতে পড়ে। রূপকথা পদ্মজার সামনে এসে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়ালো। পদ্মজা রূপকথাকে পরখ করে বললো,'তোমাকে ভীষণ হতাশাগ্রস্ত আর ভীতগ্রস্ত দেখাচ্ছে। আমাকে তোমার সমস্যা খুলে বলতে পারো।'
রূপকথা পদ্মজার কথায় অপ্রতিভ হয়ে উঠলো। পদ্মজা চেয়ার ছেড়ে রূপকথার পাশে এসে দাঁড়ায়। রূপকথার মাথায় হাত রেখে বললো,' মনের মাঝে চেপে রেখো না। কষ্ট লুকিয়ে রাখতে নেই। হাতের মুঠোয় এনে চেপে ধরে ধ্বংস করে দিতে হয়।'
রূপকথা পদ্মজার সংস্পর্শে আজ প্রথম এসেছে। পদ্মজাকে প্রতিটি ছাত্রছাত্রী সম্মান করে,ভালোবাসে। তার ব্যবহার এবং সৌন্দর্য দুটোই সবাইকে অভিভূত করে ফেলে। অনেকে বলে পদ্মজার শরীরে তারা নাকি মা মা গন্ধ খুঁজে পায়। রূপকথাও পাচ্ছে। সে কেঁদে ফেললো। পদ্মজা রূপকথার মুখটা উঁচু করে ধরলো। বড়,বড় আঁখি তার। লাল টুকটুকে গাল,জোড়া ভ্রু। এমন সুন্দর মেয়ে কাঁদতে পারে! পদ্মজা বললো,' মজনু স্যার কী বলেছে তোমাকে? আমাকে বলো। '

রূপকথা অনেক কষ্টে কান্না আটকে বললো,' আমার মা-বাবা নেই। জ্যাঠা জ্যাঠামির কাছে থাকি। ঠাম্মার কথায় জ্যাঠা আমাকে পড়াচ্ছে। দিঘীপাড়ার সতেন্দ্র বাবু আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছেন। জ্যাঠা বলেছে,পরীক্ষায় যদি ফেইল করি আমাকে বিয়ে দিয়ে দিবে।'
পদ্মজা জানতে চাইলো,'সতেন্দ্র বাবু মানে দিঘীপাড়ার মোড়ের মধু ব্যবসায়ী ?'
'হু।'
'উনি তো তোমার দাদার বয়সী। আর যেহেতু তোমার জ্যাঠা বলেছে, ফেইল করলে বিয়ে দিয়ে দিবে। তাহলে পাস করার চেষ্টা করো।'
রূপকথার কান্না বাড়লো। পদ্মজা বুঝতে পারলো,এখানে আরো ঘটনা আছে। সে কোমল কণ্ঠে বললো,'লক্ষী মেয়ে,সবটা বলো আমাকে।'
রূপকথা বললো,' মজনু স্যার বলেছেন,উনার সাথে প্রেম না করলে আমাকে ফেইল করিয়ে দিবেন। উনার সাথে যেন প্রেম করি। আমি ভয় পেয়ে যাই। আমি জানি না প্রেম কীভাবে করে। উনি যখন আমাকে ডাকেন,আমি যাই। আমাকে অনেক কষ্ট দেয়। শরীরে হাত দেয়। আমার

ভালো লাগে না। রাতে ঘুমাতে পারি না। ঠাম্মাকে বলছি,ঠাম্মা বলছে স্যার যা বলে শুনতে। তাহলে বেশি মার্ক পাবো। স্যার গত পরশু আমাকে বলছে,আমি আজ যেন স্যারের সাথে ঘুরতে যাই।' রূপকথা কাঁপছে। হেঁচকি তুলে কাঁদছে। অনাথ মেয়েটা! মা-বাবার আদর ছাড়া বড় হয়েছে। আপন দাদি সমস্যা শুনে বলেছে,স্যার যা বলে শুনতে। এতে নাকি বেশি মার্ক পাবে! কেমন মানসিকতা! আজ ঘুরতে গিয়ে জানোয়ারটা মেয়েটার কতবড় ক্ষতি করে ফেলবে কে জানে! মজনু সেই অভাগী মেয়েটিকেও কি এভাবে ভয় দেখিয়ে কাছে টেনেছিল? পদ্মজা রূপকথাকে বুকের সাথে চেপে ধরে। পদ্মজার গায়ের মিষ্টি ঘ্রাণে রূপকথা ডুবে যায়। মনে হচ্ছে,সে তার মাকে জড়িয়ে ধরেছে। তার কান্নার বেগ বাড়ে। পদ্মজা রূপকথার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো,' এই ব্যাপারে আর কাউকে কিছু বলো না। আজ বাড়ি চলে যাও।'

স্কুল ছুটির পর পদ্মজা মজনুর পিছু নেয়। মজনু তার বাসায় না গিয়ে সিলেট বোরহান উদ্দিন মাজারের পাশের এলাকায় গেল। পদ্মজাও সেখানে গেল। মজনু বার বার হাতের ঘড়ি দেখছে। বুঝা যাচ্ছে, সে কারোর জন্য অপেক্ষা করছে। পদ্মজা একটা সাদা বিল্ডিংয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর তাদের স্কুলের জামা পরা একটা মেয়ে মজনুর সাথে দেখা করতে আসে। পদ্মজা ঘৃণায় কপাল কুঞ্চিত করলো। মজনু পড়ানোর জন্য নয় সুযোগ ব্যবহার করে মেয়েদের ভোগ করার জন্য শিক্ষক হয়েছে। শিক্ষক কখনো লম্পট হয় না,লম্পটরা শিক্ষকের মুখোশ পরে। পদ্মজা পর পর তিনদিন সাবধানে মজনুকে অনুসরণ করে নিশ্চিত হয়েছে,মজনু রাতে ঘুমাবার পূর্বে বাইরে টং দোকানে চা খেতে যায়। তারপর সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বাড়ি ফিরে। রাস্তার দুই পাশে ঝোপজঙ্গল।এটা মজনুর প্রিয় অভ্যাস হতে পারে। রূপকথা তিনদিন পদ্মজার কথায় স্কুলে আসেনি। চতুর্থ দিন শেষে রাত আটটায় পদ্মজা একখানা বড় লাগেজে একটি বড় ধানের বস্তা ও রাম দা নিল। খুলে নিল নিজের কানের দুল। শরীরে এমন কিছু রাখলো না,যা প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগতে পারে। কাঁধের ব্যাগে নিল বোরকা ও রুমাল । তারপর নতুন শাল দিয়ে মাথা ঢেকে বেরিয়ে পড়লো।

রাত ঠিক দশটা বাজে তখন। চারিদিকে সুনসান নীরবতা। ঠান্ডা বাতাস বইছে। মাঝেমধ্যে শেয়ালের ডাকও শোনা যাচ্ছে। মজনু সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গুনগুন করে গান গেয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। হাঁটছে হেলেদুলে। আশেপাশে গাছপালা বেশি। রাস্তার দুই ধারের ঝোপজঙ্গল গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। দূরে ল্যাম্পপোস্টের আলো নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে। এদিকটায় মানুষজন তেমন আসে না।
পদ্মজা রাম দা নিয়ে একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তার লাগেজ ও কাঁধ ব্যাগটি কিছুটা দূরে রাখা। সে তীক্ষ্ণ চোখ দুটি মেলে অপেক্ষা করছে মজনুর জন্য। চোখ দুটি যেন জ্বলজ্বল করছে। তার নিঃশ্বাসেও যেন ছন্দ রয়েছে। শরীর ঠান্ডা করা ছন্দ! আর সেই ছন্দে আছে প্রলয়ঙ্কারী ঝড়ের পূর্বাভাস! মজনুর দেখা মিলতেই পদ্মজা চাপাস্বরে ডাকলো,' স্যার...স্যার।'

যেন অশরীরী ডাকছে। মজনুর একটু ভয় করলেও উৎসুক হয়ে ডানে তাকালো। জঙ্গল থেকে কে ডাকছে! মজনু উঁচু স্বরে প্রশ্ন করলো,'কে?'

'আমি স্যার...'

কণ্ঠস্বরটা চেনা মনে হচ্ছে। তবে কেমন যেন ভূতুড়ে এবং ভারী! মজনু হাতের সিগারেট ফেলে দুই পা এগিয়ে গেল। বললো,'আমিটা কে?'

"আমি পদ্মজা।"

সমাপ্ত।
®ইলমা বেহরোজ

_____
বিঃদ্রঃ এতদিন যারা সাথে ছিলেন পুরো গল্পটা নিয়ে অনুভূতি বলে যাবেন। আর গল্প শেষ হওয়ার পর অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী বিভিন্ন গ্রুপে রিভিউ দেয়। তাদের কাছে আমার রিকুয়েষ্ট,রিভিউ দেয়ার সময় স্পয়লার দিবেন না। এমনভাবে রিভিউ লিখবেন যেন গল্পের ভেতরের গোপনীয়তা থাকে।

উপন্যাসের ভেতর অনেক কুসংস্কার রয়েছে। পুরনো সময়কারের গ্রামের চরিত্রগুলো ফুটিয়ে তুলতে কুসংস্কার আনা প্রয়োজন ছিল। দয়া করে কেউ বিব্রত হবেন না।

Kobitor.com